মুসাফির

(ভ্রমণ কাহিনীমূলক বই)

চৌধুরী শামসুর রহমান

মুসাফির

চৌধুরী শামসুর রহমান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম, ঢাকা।

www.pathagar.com

মুসাফির

চৌধুরী শামসুর রহমান

প্রকাশক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকালঃ ১৯৩১ - ৩২ খৃঃ
প্রথম সংস্করণঃ ডিসেম্বর-১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারী ২০০১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণেঃ
আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

MUSHAFIR (WRITTEN) By : Chowdury Samsur Rahaman, Published by:, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Price : Tk. 80.00 US $ 3.00

ISB NO. 984-493-065-0

www.pathagar.com

ভবঘুরে হয়ে যাঁদের মনে
আমি সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছি
এবং
যাঁরা আমারি জন্য কাঁদতে কাঁদতে
এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন,
স্নেহ-মমতায় গড়া
আমার সেই পরম প্রিয়

জনক-জননীর
স্মৃতি
এ বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাক
- শামসু

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

১৯১৮ সালের জুলাই থেকে ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল হচ্ছে আমার ভ্রাম্যমান জীবনের পরিধি। "মুসাফির" লিখা হয় ১৯৩১-৩২ সালে, অর্থাৎ ঘটনার প্রায় বারো বছর পরে। সুতরাং প্রধানতঃ স্মৃতির উপর নির্ভর করেই আমায় কাহিনীর ঘটনা বিন্যাস করতে হয়েছে। অবশ্য বোম্বাইয়ে চাকুরী হওয়ার পর প্রধান প্রধান ঘটনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি নোট আমি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও ব্যক্তি বা স্থান-বিশেষের নাম সম্পর্কে যেখানে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, সেখানে নাম হয়ত আমি আদৌ উল্লেখ করিনি, কিম্বা করলেও সন্দেহের অবকাশ রেখেই তা করা হয়েছে। এই বইয়ে যে-সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি ঘটনা ইতিহাসের মতোই বাস্তব সত্য; কোনখানেই আমি তিলমাত্র অতিরঞ্জন কিম্বা সত্য গোপনের প্রয়াস পাইনি। অবশ্য কতকগুলি সত্য ঘটনা পর পর সাজিয়ে গেলেই তা "সাহিত্য" হয়না; ঘটনাকে সাহিত্যের রূপ দিতে গেলে তার বর্ণনার মাঝে কতকটা অলঙ্কারের সমাবেশ ও রঙের কিছুটা আমেজ লাগাতেই হয়। এই সাহিত্যিক প্রয়োজন মিটাতে গিয়েও যাতে ঘটনার কোনরূপ বিকৃতি না ঘটে, আমি সে বিষয়ে বিশেষ নজর রেখেছি।

বই লিখা হওয়ারও প্রায় দুই যুগ পর আজ তা পাঠক-সাধারণের সামনে পেশ করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিদেশী শাসনের জোয়াল দেশবাসীর গর্দ্দান থেকে আজ অপসারিত হয়েছে; এক দেশের স্থলে এখন দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য বইয়ের স্থানে স্থানে বর্ণনার মাঝে সামান্য কিছু রদবদল করতে হয়েছে; কিন্তু এ পরিবর্তনেও মূলতঃ কাহিনীর কোনরূপ বিকৃতিই ঘটেনি।

ভবঘুরের এই কাহিনীই আজ আমি পাঠকদের সামনে পেশ করছি। তাঁরা যদি এ কাহিনী পাঠ করে আনন্দ পান, যদি ক্ষণকালের জন্যও ভবঘুরের দুঃখ বেদনা তাঁদের অন্তরে সহানুভূতি জাগাতে পারে, তা হলেই আমি ধন্য হব।

চৌধুরী শামসুর রহমান
"মঈন মহল"
কাকরাইল রোড, রমনা, ঢাকা,

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির রাহিম

আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন বলো, পৃথিবীতে সফর করে দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর আল্লাহ্‌ আবার সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্‌ তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২৯ সুরা, আনকাবুতঃ ২৯)।

আর আমাদের রাসুল (সাঃ) জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাবারও তাগিদ দিয়েছেন। যদিও এটা আক্ষরিক অর্থে আমরা শিক্ষা লাভকে বুঝে থাকি কিন্তু তিনি ব্যাপক অর্থে এই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ভ্রমণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞানার্জন অন্যতম। জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিদের জন্য সমস্ত পৃথিবীটাই একটি পাঠশালা। দার্শনিক কালো গোলডানি এই পৃথিবীকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন- পৃথিবী হচ্ছে একটি চমৎকার গ্রন্থ কিন্তু যে পাঠ করতে জানেনা তার কাছে এর কোন মূল্য নেই। আর শেখ সাদী (রঃ) বলেছেন- ভাবুক আর ভ্রমণকারী দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ দরবেশ। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে ও আধুনিক বিশ্বে দেশ ভ্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের মাধ্যম।

কিন্তু আমাদের মধ্যে দেশভ্রমণের অভ্যেস খুব একটা লক্ষ্য করা যায়না। এর জন্য অর্থনৈতিক দীনতাও দায়ী বটে। আর যাদের যথেষ্ট অর্থ-বিত্ত রয়েছে তারা দেশের চেয়ে বিদেশ ভ্রমণে গুরুত্ব দেয়। এইসব ভ্রমণ বিলাসীরা জ্ঞানার্জনের চেয়ে বিনোদনকে প্রাধান্য দেয়। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের উদ্দেশ্যেই হয়তো আক্ষেপ করে বলেছেন-

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বত মালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

www.pathagar.com

আর ভ্রমণ পিপাসুরা বিনোদনের চেয়ে জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এঁদের কাছে ভ্রমণের জন্য অর্থ কোন সমস্যা নয়। মনের প্রবল ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সমাজে এধরণের লোকের দারুণ অভাব রয়েছে।

আমাদের প্রধান কার্যালয়ে পুরানো পান্ডুলিপি তালাশ করতে গিয়ে এধরণের এক ভ্রমণ পিয়াসী ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি। সোসাইটি কর্তৃক পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত সুলেখক চৌধুরী শামসুর রহমান প্রণীত ‘মুসাফির’ নামক মূল্যবান গ্রন্থের একটি কপি আমার দৃষ্টি গোচর হয়। বইটি পেয়ে তা পুনঃ প্রকাশের লোভ সামলাতে পারিনি। তাই পাঠক/পাঠিকাদের খেদমতে বইটি প্রকাশ না করে পারলামনা।

‘মুসাফির’ গ্রন্থটি মূলতঃ স্কুল পালানো এক বাউন্ডেলে ছেলের কাহিনী। ভ্রমণের সময় কাল ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই ভ্রমণ কাহিনীটি দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৯৩১-৩২ সালে ধারাবাহিকভাবে তৎকালীন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। লেখক মাত্র সাড়ে আট আনা পয়সা সম্বল নিয়ে এ উপ-মহাদেশের পূর্ব প্রান্তসীমায় মেঘনার তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র শহর থেকে রওয়ানা হয়ে আরব সাগরের উপকূল বোম্বাই পর্যন্ত পাড়ি জমানো নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক অভিযান। কিন্তু এই প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন চৌধুরী শামসুর রহমান। তাঁর কৈশোর জীবনের ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী উপন্যাসের মতোই হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখক উপ-মহাদেশের যে সব এলাকা ভ্রমণ করেছেন সে সব অঞ্চলের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কেও চমৎকার ধারণা পাবেন পাঠক/পাঠিকারা এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে। এ দিক দিয়ে ‘মুসাফির’ প্রকৃতপক্ষেই একটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যতিক্রমধর্মী আঙ্গিকে ভ্রমনকাহিনীমূলক নতুন বই।
পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে আমাদের আয়োজন সার্থক মনে করবো।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

প্রথম মঞ্জিল

১৯১৮ সাল। কোন মাস ঠিক মনে নেই-সম্ভবতঃ জুলাই মাসের শেষাশেষি হবে। বাংলা তখন শ্রাবণ মাস ছিল। আমাদের ষান্মাসিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। পরীক্ষা দিয়েই বুঝতে পারলাম Mathematics-এ ফেল করব; Arithmetic ও Geometry-তে বেশ ভালো করলেও Algebra-য় একেবারে গোল্লা পাওয়ারই সম্ভাবনা। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেলো, কি করি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

Result তখনও out হয়নি। ভাবতে লাগলাম- কি করি! Scholarship পেয়ে এসে সবে মাত্র High School-এ ভর্তি হয়েছি, যদি ফেল করি তবে মুখ-দেখাবার স্থানও যে থাকবে না! Scholar বলে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সব্বাই আমায় বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে থাকেন; কাজেই ফেল করা আমার পক্ষে কেমন কোরে পোষায়! কিন্তু যা অবধারিত সত্য, তা'কে কেমন করে অস্বীকার করবো? Algebra-য় যে এক নম্বরও পাব না, তা'ত পরীক্ষা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। কাজেই ভাবতে লাগলাম-ফেল করার অপমান থেকে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম-স্কুল ছেড়ে দেশত্যাগী হ'ব Rasult out হ'বার আগেই; তবেই ত অবমাননার মসী-রেখা আমার মুখ কালো করে দিতে পারবে না।

যেমন ভাবনা-তেমনি কাজ। দেশত্যাগী হ'বার সঙ্কল্পেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম। ইচ্ছা হলো, জন্মভূমিকে শেষ বিদায় নিবেদন করার আগে মায়ের মুখখানি একবার দেখে নেবার। একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে চাঁদপুর থেকে বাড়ীর পথে যাত্রা করলাম। মাত্র তিন-চার দিন আগে সাংঘাতিক ধরণের ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছিল, আর তা'র ফলে রেল-পথের অনেক জায়গায় পুলগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল। ট্রেন "গঙ্গাসাগর" ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়ে একেবারে থেমে পড়ল। অনুসন্ধানে জানলাম-আর নাকি অগ্রসর হ'বার উপায় নেই- পুল ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে সেখানেই নেমে পড়তে হলো। তারপর নদীর ঘাটে গিয়ে একখানা নৌকা ভাড়া করে গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় গৃহে পৌছে মায়ের কদমবুছি করে জীবন ধন্য করলাম। মাত্র চারদিন বাড়ীতে ছিলাম। যত রকমে পারি মায়ের কাছ থেকে উজাড় কোরে স্নেহ নিঙড়ে নেবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিনি এই চারদিন। পঞ্চম দিন বেলা প্রায় দশটার সময় ছোট ভাই-বোনদের প্রত্যেককে এক-একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মা আমার অশ্রুচোরা নয়নের ভাষা বুঝতে পেরেই বুঝি বলে উঠলেন- "আজ যাবার দরকার নেইরে; থাক আর দু'টা দিন।" ধুতির খোঁট দিয়ে চোখ মুছে

www.pathagar.com

নিয়ে ধরা গলায় উত্তর দিয়েছিলাম- "না, মা। আমায় আজই যে যেতে হবে।"
আমাদের পুকুর ঘাটে এসে নৌকায় চাপলাম। মা-আব্বা, ভাই-বোনেরা সব্বাই দাঁড়িয়ে সেখানে মলিন মুখে। তাদের দিকে চেয়ে আর অশ্রুরোধ করতে পারলাম না- মুখ ফিরিয়ে নিলাম জোর করেই! কেবলি মনে হতে লাগল-এইত শেষ দেখা; যদি বিদেশে পথে-প্রবাসে মরে যাই, আর ত এসব প্রিয় মুখ দেখতে পাব না! -চোখ মুছে আবার মুখ ফিরালাম। নৌকা তখন অনেক দূর চলে এসেছে; তথাপি দেখলাম- মা আমার তখনে ঘাটের পাড়ে বাঁশ-ঝাড়ের একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে-চোখে তাঁর অশ্রুর উৎস। আর চাইতে পারলাম না; আমারো দু'নয়ন ঝাপসা হয়ে এলো-বুকভরা ব্যথা নিয়ে বসে পড়লাম।
চাঁদপুরে ফিরে একদিন মাত্র তথায় ছিলাম। পরদিন-সেদিনটা শ্রাবণ মাসের ১৮ তারিখ সোমবার ছিল, তা' আজো আমার বেশ মনে আছে-বেলা ১১টার সময় নিয়মিত স্কুলে গেলাম। দেড়টার সময় Leisure period-এ সব বই-পুস্তক নিয়ে বাসায় ফিরে এসে দেখলাম, আর কেউ বাসায় নেই; খালি বাসা খা-খা করছে বুঝিবা আমারি আসন্ন বিদায় ব্যথায়। তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়ে কয়খানা কাপড় আর কয়েকটা বই একত্র করে একটি গাঁঠরী বেঁধে "মুসাফির" সাজলাম। মাত্র সাড়ে আট আনা পয়সা তখন আমার সম্বল ছিল। তাই পকেটে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বেরিয়ে পড়লাম-অনির্দিষ্টের সীমাহীন পথে।
ষ্টেশনে এসে এনকোয়ারী করে জানতে পারলাম -স্টীমার ছাড়বার আরো প্রায় এক ঘন্টা দেরী আছে। এ সময়টা কাটালাম চোরের মত এদিক সেদিক ঘুরে-যদি কেউ দেখে ফেলে। বিশেষ করে বন্দুবর আবদুল করীমকে (ইনি এক্ষনে উকীল) আমার খুবই ভয় ছিল; Leisure period-এ আমায় স্কুলে না দেখে তিনি যে আমার অনুসন্ধান করবেন, এ আমার জানাই ছিল। তাই কোন রকমে এ-দিক সে-দিক ঘন্টাখানেক কাটিয়ে স্টীমার ছাড়বার ঠিক দশ মিনিট আগে চার আনা কি সাড়ে চার আনা দিয়ে মোহনপুর স্টেশনের একটা টিকিট করে চেপে বসলাম। স্টীমারখানার নাম ছিল, মনে হচ্ছে- Heron; চাঁদপুর ও নারায়নগঞ্জের মাঝে যাতায়াত করতো।
স্টীমারে চেপে আমার সম-বয়সী একটি ছেলের সাথে পরিচয় হলো। বাড়ী তা'র মোহনপুরে- নামটা বোধ হয় মাহবুব। কথায় কথায় তা'র সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেলো। শেষে সে প্রস্তাব করল-যখন মোহনপুরেই নামব, তখন রাতটা তাদের বাড়িতে অতিথি হতে। আপত্তির আমার কোন কারণই ছিল না; তথাপি কেবল ভদ্রতার খাতিরে মৌখিক একটু ওজর দেখিয়ে শেষে স্বীকার করলাম। ভাবলাম-মুসাফির আমি, এক জায়গায় অতিথি হয়ে আমার রাত কাটাতে হবেইত।
রাত প্রায় আটটার সময় মোহনপুর স্টেশনে স্টীমার গিয়ে পৌছাল। মেঘনার তীরে একটা ছোট গাঁও। স্টেশনে আলোর কোন ব্যবস্থাই ছিল না। একখানা ডিঙ্গি নৌকায় করে স্টীমার

www.pathagar.com

থেকে নেমে ডাঙ্গায় গেলাম। চারদিকে কাদা আর অল্প অল্প পানি। প্রায় আধ মাইল খানেক রাস্তা কাদা ঠেলে আমার সঙ্গীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। মাহবুব মিঞার বাবা-প্রায় পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ- মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক। তিনি আমায় দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো না; হয়ত ভাবছিলেন-এ আপদ আবার এলো কোথেকে। যাক্-বাইরে তিনি আমার সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহারই করলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম-নিদ্রার আশায়; কিন্তু যত রাজ্যের সব চিন্তা মনের সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়াতে লাগল। ভাবতে লাগলাম এই অনির্দিষ্টের পথে যে আমি যাত্রা করেছি, তার শেষ কোথায়? গৃহের সব আনন্দ-সুখ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আজ যে আমি পথবাসী সাজলাম, তার চরম পুরষ্কারটাই বা কি, তা-ও ভাবছিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে মনের কোণে ভেসে উঠছিল-মায়ের বিদায় বেলার অশ্রুসজল মুখখানি, ভাই-বোনদের করুন চাহনি, আব্বার ধীর-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যথিত দৃষ্টি। ভাবছিলাম-যখন আমার নিরুদ্দেশ সংবাদ বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে-তখন আমার প্রিয় স্বজনদের অবস্থা কি হবে। বন্ধুবর আবদুল করীম আমায় না দেখে এতক্ষণে সারা চাঁদপুর শহরটা যে খুঁজে-খুঁজে তোলপাড় করে তুলেছেন, তা-ও ভাবছিলাম।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানিনা। পরদিন সারাটা দিন মাহবুব মিঞাদের বাড়িতেই কাটল- রাত্তিরে আবার স্টীমার পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার পর কিছু খেয়ে নিয়ে মাহবুব মিঞার সঙ্গে স্টীমার ঘাটে গিয়ে "ষাইটনল" স্টেশনের একটা টিকিট কিনলাম সাত পয়সা দিয়ে। বেশি পয়সা তখন আর আমার কাছে ছিল না- পকেটে প্রায় লালবাতি জ্বলার মতো। রাত আটটায় স্টীমার এলে জীবন-পথের এক দিনের বন্ধু মাহবুব মিঞার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাতে চেপে বসলাম। বিকট রবে বংশীধ্বনি করে স্টীমার ছেড়ে দিল। সামনে ঢেউয়ের দোলায় ভেসে উঠল সীমাহীন পথ। শুধু পথ আর পথ। এ পথের শেষ কোথায়? ইংরাজ কবির ভাষায় মনে পড়ল ঃ

"And there's no end of voyaging
When once the voice is heard
For the river calls, and the road calls,
And oh! the call of the bird."

ঢেউ-এর দোলায় ভাসতে ভাসতে অন্ধকারের বুক চিরে জাহাজখানা অগ্রসর হচ্ছিল ধীরে-ধীরে। সার্চ্চ-লাইটের আলোয় মাঝে-মাঝে দু'পাশের গাঁওগুলির সুপ্ত-নিঝুম দৃশ্যটা চোখের সামনে ধরা পড়ছিল অতি মধুর হয়ে। চার পাশে পানি আর মাঝখানে অসংখ্য বৃক্ষসমাকুল এক একটা গাঁও। গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে খড়ে-ছাওয়া কুটীরও এক-আধটা দেখা যায়। কী সুন্দর সে দৃশ্য। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষন সে দৃশ্য দেখছিলাম,

www.pathagar.com

আর আনমনে কত কথাই ভাবছিলাম।

রাত তখন বোধ হয় এগারোটা হবে। "ষাইটনল" স্টেশনে এসে স্টীমার পৌছল। একখানা ডিঙ্গী এসে জাহাজের গা' ঘেষে দাঁড়ালে যাত্রীরা একে-একে ডিঙ্গীতে চেপে বসল। সাত-আট জন যাত্রী-সব্বাই সম্ভবতঃ ডিঙ্গীর মাঝির পরিচিত; তারা গাঁয়েরই লোক। মাঝি আমায় জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে? কি উত্তর দিব বিদেশী মুসাফির আমি। বল্লাম, "এখানে রাতটুকু কাটাবার মতো একটা স্থান কি পাওয়া যাবে না?" মাঝি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল- "এখানে পানির উপর থাকবার জায়গা কোথা পাবে বাপু।" তখন মাঝির কথার অর্থ বুঝতে পারিনি-একটু পরেই বুঝতে পারলাম।

একটু দূরে গিয়েই একটা কাঠের ঘরের সামনে ডিঙ্গীখানা ভিড়ল। জলের মধ্যে বড় বড় খুঁটি গেড়ে তার উপর ঘরখানা তৈরি করা হয়েছে। ঘরের দরজা থেকে নামলেই একেবারে সাঁতার পানি। এ ঘরখানাই স্টেশন এবং তারই পাশে আর একটা ঘরে জল-পুলিশের একটা ফাঁড়ি আছে। সকল যাত্রী ডিঙ্গী থেকে নেমে স্টেশন ঘরে উঠল; তারপর নৌকা যোগাড় করে একে-একে সবাই যার-যার বাড়িতে চলে গেলো; শুধু একা আমিই স্টেশন ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম-কোথায় যাই, কি করি।

পেছনে একটা লোকের পায়ের শব্দ শুনে ফিরে চাইলাম। দেখি, একজন কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে। তার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-সেখানে রাতটুকু কোথাও থাকা যায় কি না, আর পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে যাবার উপায়ই বা কি? কথায়-কথায় কনেষ্টবলটীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো; তার বাড়ি আমাদেরই দেশে, আমাদের গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে। সে আমায় জানাল- সকাল না হলে গাঁয়ে যাওয়ার উপায় নেই; কারণ নৌকায় করে যেতে হবে। রাত্রে ফাঁড়িতেই আমার থাকার একটু জায়গা করে দেওয়া হবে-এ-ও সে জানাল এবং আমায় সঙ্গে করে একটি কাঠের সাঁকো বেয়ে তাদের ফাঁড়ি ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে আর দুটি কনেষ্টবলকে দেখতে পেলাম-তারা তখন ভাত রাঁধছিল। তিনজন কনেষ্টবলই মাত্র এই ফাঁড়িতে থাকে; অপর কোন অফিসার নেই।

কনেষ্টবলদের সঙ্গেই রাত্রে খেলাম এবং ঘরের মেঝেয় তারা আমার শোবার জন্যে একটা মাদুরও পেতে দিল। গাঁঠরী মাথায় দিয়ে সেই মাদুরে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষনের মধ্যেই নিদ্রা এলো-নাক্ ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফাঁড়ি-ঘরের দরজা থেকে লাফিয়ে পানিতে নেমে বেশ করে সাঁতরিয়ে গোসল করলাম। তারপর আমার পরিচিত কনেষ্টবলটি পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক কৃষককে ডেকে তার নৌকায় করে আমায় গাঁয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করল। সে কৃষককে ইহাও বলে দিল যে, গাঁয়ের "বড় বাড়ীতে" যেন আমায় পৌছে দেওয়া হয়।

"বড়বাড়ী" এক অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়ি। বাড়ির কর্তা কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় বয়স্ক জনৈক কৃষক।

www.pathagar.com

আমি যখন তাদের বাড়িতে পৌঁছলাম তখন গৃহকর্তা একটা ঘরের দাওয়ায় বসে জাল বুনছিলেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- "তোমার বাড়ি কোথায়, মিঞা?" আমি জানালাম- মুসাফির আমি, বিদেশে বিপন্ন হয়ে পড়েছি- ঢাকায় যেতে হবে। তিনি আমায় একখানা পিঁড়িতে বসতে দিলেন।

বেশ অমায়িক লোক এই পল্লী কৃষকটি। অতি যত্নে তিনি আমায় দু'বেলা খেতে দিলেন এবং রাত ১০টায় একটা নৌকায় করে আমাকে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে আমার হাতে আট আনা পয়সা দিয়ে বললেন- "বিপদে পড়েছ বাপু নিয়ে যাও এ পয়সা ক'টা-নারায়নগঞ্জের টিকিট করো।" আমায় স্টেশনে নামিয়ে দিয়েই তিনি চলে গেলেন, একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটা পর্যন্ত দিলেন না। নৌকার লগি ঠেলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম-কত বড় বিরাট একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে এই গ্রাম্য কৃষকের মসী-কৃষ্ণ দেহের মাঝে।

রাত এগারোটায় জাহাজ এলে ষাইটনল থেকে মীরকাদিমের একটা টিকিট করে জাহাজে চেপে বসলাম। শেষ রাত্রে মীরকাদিম পৌঁছে ছিলাম। বেশ বড় স্টেশন। বাকি রাতটুকু ফ্ল্যাটেই কাপড় পেতে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফ্ল্যাট থেকে নেমে বাজারে গিয়ে রামপালের বড় বড় কলা আর কিছু চিড়া কিনে নাশতা করলাম। তারপর বাজারের মাঝখান দিয়ে পূব দিকে যে একটা রাস্তা চলে গেছে, অনির্দিষ্ট ভাবে তাই ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রায় মাইল দেড়েক পথ গিয়ে একটা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রাচীন গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামখানার নাম আবদুল্লাহপুর-এখানে একটি হাই-স্কুল আছে। গ্রামের সর্ব্বত্রই বহু পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা গেলো। বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের পিতা বল্লাল সেনের সহিত এই গ্রামের অনেক স্মৃতি জড়ানো আছে বলে শোনা গেলো। এই গাঁয়েরই গরীব মুসলমান বোরহান উদ্দীন গো-কোরবাণী করেছিলেন বলে বল্লাল সেন নাকি তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাত কেটে দিয়েছিলেন। হাতকাটা বোরহান উদ্দীন তখন আবদুল্লাহপুর থেকে পালিয়ে গিয়ে মুসলমান দরবেশ বাবা আদমের শরনাপন্ন হন এবং তাঁর সহায়তায় রামপালে ফিরে এসে বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে বল্লাল সেনেরই জয় হয় বটে; কিন্তু দরবেশের অভিশাপে অবশেষে রাজা সপরিবারে আগুনে পুড়ে মারা যান। আবদুল্লাহপুর দেখতে গিয়ে পাঠশালায়-পড়া এই কাহিনীটা বারে-বারে মনে পড়ছিল। হাতকাটা বোরহান উদ্দীনের কোন স্মৃতির সন্ধান গাঁয়ে পাওয়া না গেলেও, বাবা আদমের যে মাজার সে গাঁয়ে আজো বিরাজ করছে, তাতেই মনে হয় কাহিনীটা সম্ভবতঃ একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

আবদুল্লাহপুরে ঘন্টা দু'তিনেক ছিলাম। সেখানে এক মুসলমান মৎস ব্যবসায়ী বৃদ্ধের বাড়িতে দুপুর বেলা আহার করেছিলাম। বিকালে আবার মীরকাদিমে ফিরে এসে রাত্রে

www.pathagar.com

সেখানেই কাটাই স্টেশনের ফ্ল্যাটে শুয়ে। পরদিন প্রাতে ডাক-হরকরার নৌকায় মুনশীগঞ্জে গিয়ে পৌঁছি। ছ' পয়সা ভাড়া নিয়েছিল।

মুনশীগঞ্জে পৌঁছেই দু'পয়সা দিয়ে দু'খানা পোষ্টকার্ড কিনে (তখন পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সা ছিল) একখানা বাড়িতে আব্বার কাছে, আর একখানা চাঁদপুরে বন্ধুবর আবদুল করীমের নিকট লিখি। উভয় চিঠিতেই লিখেছিলাম –"ফেল করার অবমাননা থেকে বাঁচবার জন্য দেশত্যাগ করলাম; আমার অনুসন্ধান করবেন না। যদি মানুষ হতে পারি, গৌরবের সাথেই ফিরে আসব; নয়ত কালো মুখ দেখাতে আর আসব না।"

চিঠি লিখতে গিয়ে বারে বারেই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল-বাড়ির কথা, ভাই-বোনদের কথা, মায়ের কথা। ভাবছিলাম-মায়ের ছেলে আবার কি মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারব; -না, বিদেশে পথে-প্রবাসেই সব শেষ হয়ে যাবে।

চিঠি দু'খানা পোষ্ট করে বাজার থেকে এক পয়সার আখ কিনলাম। আখের টুকরাটা হাতে নিয়ে হাটতে হাটতে মসজিদের পুকুর ঘাটে গিয়ে বসলাম। বাঁধা ঘাট-বেশ সুন্দর বসবার জায়গা আছে। সেখানে বসে-বসে আখটুকু চিবিয়ে শেষ করে মুখ ধোবার জন্য ঘাটে নামলাম। সুন্দর স্বচ্ছ পানি। পানির মুকুরে নিজের মুখচ্ছবি দেখে শিউরে উঠলাম। দু'দিনের মুসাফিরীতেই চেহারা এতটা বিকৃত হতে পারে, তা ভাবতেও পারিনি। পথের ধূলা-বালি জমে মুখের উপর যেন একটা কালীর পর্দা সৃষ্টি হয়েছিল। কি সুন্দর সে "শ্রী"। যেন চিড়িয়াখানার পিঞ্জরে আবদ্ধ জীব-বিশেষেরই একখানা মুখ। দেখে গোসল করবার ইচ্ছা হলো। লক্ষ্য করে দেখলাম-পরণের কাপড়ও বেজায় ময়লা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে বাজারে গিয়ে দু'পয়সার কাপড় কাঁচা সাবান কিনে আবার ঘাটে ফিরে এলাম। কাপড় ধোঁয়া, গোসল করা এ-সবে প্রায় একঘন্টা সময় চলে গেল। তারপর মসজিদে গিয়ে বসলাম। সেদিন শুক্রবার ছিল। কিছুক্ষণ পরেই দলে-দলে মুসল্লীরা জো'মার নামাজের জন্য মসজিদে আসতে লাগল। বেলা প্রায় একটার সময় নামাজ শেষ হলে একে-একে সব্বাই চলে গেলো-কেবল, আমার সম-বয়সী একটা ছেলে তখনও মসজিদের এক কোণে বসেছিল। সব্বাই মসজিদ ছেড়ে চলে গেলে সে আমার নিকটে এসে জিজ্ঞাস করল-আমার বাড়ি কোথায়, কোথায় যাব, উদ্দেশ্য কি? প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিলে পর, সে আমায় অনুরোধ করল-সেদিন তাদের বাসায় থেকে যাবার জন্যে। তার পরিচয় নিয়ে জানতে পারলাম-নাম মোজাফ্‌ফর উদ্দীন, সেখাতে ভগ্নিপতির বাসায় থেকে Class VIII-এ পড়ে; ভগ্নিপতি আদালতের পেস্কার। প্রথমতঃ আমি কিছুতেই তাদের বাসায় যেতে রাজী হই নি; কিন্তু শেষে সে এমনি নাছোড়-বান্দা হয়ে পড়ল যে, না গিয়ে পারলাম না। মসজিদ থেকে বেরিয়ে মোজাফফরের সাথে তাদের বাসায় গেলাম। বলা বাহুল্য বেলা প্রায় দুটো বাজলেও তখন পর্যন্ত আমার কিছুই খাওয়া হয়নি-সেই আখের টুকরাটুকু ছাড়া।

www.pathagar.com

ক্ষুধার জ্বালায় পেট তখন দস্তুরমত চোঁ-চোঁ করছিল; আর পকেটেও আট-নয়টা পয়সার বেশি সম্বল ছিলনা। বাসায় পৌঁছে মোজাফ্‌ফর মিঞা কিছু মিঠাই এনে আমায় নাশতা করাল। কিন্তু এ সামান্য নাশতা খেয়ে ক্ষুধা যেন আরো বেড়ে গেলো। ভাবতে লাগলাম কি করি, লজ্জাকর ক্ষুধার কথাটা কেমন করেই বা প্রকাশ করি।

শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা নীরবে বুকে চেপে রেখেই আমায় রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিকাল বেলা প্রায় পাঁচটার সময় মোজাফ্‌ফরের বন্ধু শামসুদ্দীন নামক একটা ছেলে এলো। শামসুদ্দীন দারোগার আত্মীয়, তাঁর বাসায় থেকে Class VIII-এ পড়ে। সে এলে পর তিনজনে মিলে বেড়াতে বেরুলাম। অফিস-আদালত, জেলখানা প্রভৃতি সবই তারা আমায় দেখাল। জেলখানাটা দেখাতে গিয়ে মোজাফ্‌ফর আমায় বল্ল- এটাই নাকি সোলতান শামসুদ্দীনের প্রসিদ্ধ ইন্দ্রাকপুরের কেল্লার শেষ স্মৃতি; কেল্লাটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর, তার ভগ্নাবশেষের উপর সরকার নতুন করে জেলখানা তৈরি করেছেন। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে তিন জনে মিলে আহার করলাম। তারপর শুরু হলো সাহিত্য চর্চা। দেখলাম মোজাফ্‌ফরও আমারি মতো একটু সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত। "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" খানা তখন সবে মাত্র বেরিয়েছে। মোজাফ্‌ফর ছিল তার গ্রাহক। তখন পর্যন্ত পত্রিকা খানার দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র বেরিয়েছে। "পিপীলিকা-বধ কাব্য" পড়ে তিন জনায় বেশ আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। কিছুক্ষণ পর শামসুদ্দীন মিঞা বিদায় লওয়ার সময় দাওয়াত দিয়ে গেলো-পরদিন সকালে তাদের বাসায় খাওয়ার জন্যে। রাতটা কাটলো বেশ শান্তিতে। পরদিন বেলা ৯টার সময় গোসল করে মোজাফ্‌ফরের সাথে শামসুদ্দিনদের বাসায় গেলাম। খাওয়ার জন্য বেশ আয়োজন হয়েছিল-মুরগী, পোলাও ইত্যাদি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মোজাফ্‌ফরদের বাসায় ফিরে এসে গাঁঠরী-বোচকা নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। মোজাফ্‌ফর ও শামসুদ্দীন দু'জনেই সঙ্গে এসে আমায় নারায়নগঞ্জের গয়নার নৌকায় তুলে দিয়ে গেলো। মাত্র একদিনের পরিচিত এ দুটী বন্ধুর স্মৃতি আমার জীবনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। জানি না, আজ তারা কোথায়।

ধলেশ্বরীর বিরাট বিরাট ঢেউগুলি ভেঙ্গে নৌকাখানা অগ্রসর হচ্ছিল হেলে-দুলে। এক এক বার মনে হচ্ছিল বুঝি নৌকা উলটে যায়, বুঝি নদীর বুকেই চির-সমাধি লাভ হয়। নৌকার যাত্রীদের মধ্যে একটি মেয়েও ছিল- তরুণী নারী, সাদা থানে দেহ ঢাকা, বুঝি হিন্দু বাল-বিধবা। ভয়ে সে যেন আধমরা হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের যাত্রী' কেউ বলছিল "রাম রাম", কেউ জপছিল "আল্লাহ্ আল্লাহ্"। সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। বুঝা যাচ্ছিল, মানুষ যখন একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে, তখনি সৃষ্টিকর্তা বিধাতার কথা বিশেষ করে তাদের মনে পড়ে, অন্য সময় তাঁকে বড় কেউ আমল দেয় না।

সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে নৌকা নারায়ণগঞ্জে গিয়ে পৌছল। নেমে স্টেশনে গিয়ে বসলাম।

www.pathagar.com

পকেটে তখন মাত্র তিনটে পয়সা সম্বল; ভাবলাম রাত্তিরে কিছু খাব না। স্টেশনে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব এই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাত প্রায় নটার সময় একটা খোট্টা কনেষ্টবল এসে waiting room থেকে আমায় তাড়িয়ে দিল; বল্ল "শোনেকা হুকুম নেহি।" অগত্যা উঠে মসজিদের তালাশে বেরুলাম।

অনেক কাদা-পানি ভেঙ্গে অন্ধকারে হাত্‌ড়িয়ে হাত্‌ড়িয়ে একটা পাকা মসজিদে গিয়ে হাজীর হলাম; কিন্তু সেখানেও আমার জন্য বিধি বাম হলো। মোয়াজ্জিন এসে চোখ রাঙিয়ে জানালেন-সেখানে কেউ শুতে পাবে না; কারণ লোকে নাকি মসজিদের ঝাড়-ফানুশ চুরি করে। খোদার ঘরেও স্থান হলো না মানুষের দোষে। শেষে করি আর কি, আবার ষ্টেশনে ফিরে এলাম। কিন্তু রাত এগারোটার সময় আবার কনেষ্টবল এসে তাড়িয়ে দিল। এই প্রথম বুঝতে পারলাম-মুসাফির জীবন কত লাঞ্ছনার জীবন।

যার কোথাও স্থান নেই, আশ্রয় বলে দুনিয়ায় যার কিছু নেই, বিধাতার বিরাট আকাশ-চাঁদোয়ার তলে ঘাসের গালিচার উপরই তা'র একমাত্র আশ্রয়। এই ভেবে শেষে নদীর কিনারায় গিয়ে ভাসমান একখানা অব্যবহার্য্য ছোট্ট ফ্ল্যাটের উপর আশ্রয় নিলাম। কিন্তু লৌহ-নির্মিত সে ফ্ল্যাটের উপর বেজায় ঠান্ডা-মিনিট দশ-পনেরোর বেশি সেখানে থাকতে পারলাম না। শেষ নদীর বাঁধা-ঘাটের উপর গিয়ে কাপড় পেতে শুয়ে পড়লাম।

একটানা ঘুমে রাতটা কেটে গেলো; কোন অসুবিধাই মনে হয়নি। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি-সারা শরীরে বিছা কিলবিল করছে: ঘাটে একপাল বিছা ছিল, রাতের অন্ধকারে বিছানা পাতার সময় তা দেখিনি। তাড়াতাড়ি উঠে শরীর থেকে বিছাগুলি ঝেড়ে ফেলে সেখানেই নদীতে গোসল করলাম। নারায়নগঞ্জের উপর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আর এক মিনিটও সেখানে থাকবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। গোসল করেই রেলপথ ধরে হেটে ঢাকার দিকে যাত্রা করলাম। যেখানে একটু মাথা গোঁজার স্থানও পাওয়া যায় না, এমন লক্ষীছাড়া জায়গায় কেউ থাকে।

হেঁটে হেঁটে বেলা প্রায় দুটার সময় ঢাকা দোলাইগঞ্জ (এখনকার গেন্ডারিয়া) স্টেশনে পৌছলাম। পূর্ব রাত থেকে কিছুই খাইনি বেজায় ক্ষিদে পেয়েছিল। স্টেশনের এক মুড়িওয়ালীর নিকট থেকে দু'পয়সার মুড়ি কিনে একটা গাছতলায় বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খেলাম; তারপর স্টেশনে গিয়ে পেট ভরে পানি খেয়ে শরীরটা শান্ত করলাম। এখন পকেটে মাত্র আর একটা পয়সা বাকী। মুসলিম বাঙলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে পৌছেই আমি একেবারে রিক্ত-কাঙ্গাল সাজলাম। ভাবতে লাগলাম অতঃপর কি হবে, কোথায় যাব। কবির ভাষায় মনে পড়ল ঃ

"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী-
হায় গতিহারা।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মঞ্জিল

ঢাকা-মুসলিম গৌরবের জীর্ণ কঙ্কাল; অতীতের শত সুখ-স্মৃতি বিজড়িত জাহাঙ্গীর নগর। এখানে এলে যুগ-যুগান্তের যবনিকা পেরিয়ে মন স্বতঃই সুদূর অতীতের এক কল্পলোকে গিয়ে পৌঁছায়। চোখের সামনে তখন ভেসে উঠে-শাহানশাহ জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন-কল্পনা, শাহজাদা ফররোখশিয়ারের সুখ-স্মৃতি, শাহজাদী পরীবানুর হেরেম-স্বপ্ন, সোলতান হোসেন শা'র সুশাসন এবং আরো কত কি। মনে হয়, নগরীর পাষাণ-পথের প্রতি ধূলি-কণায় আজো যেন অতীত দিনের সোনার স্বপন ঘুমিয়ে রয়েছে, চারিদিকেই যেন "ক্ষুধিত পাষাণের" ফরিয়াদ। রূপকথার রাজপুত্রের মতো কে এসে সোনার কাঠির পরশে এ পাষাণ-পুরীর ঘুম ভাঙ্গাবে, কে জানে।

ঢাকায় পা' দিয়েই অতীতের এ-সব স্মৃতি মনে জেগে উঠল। যদিও পেটে ভাত নেই, পকেটে মাত্র একটা পয়সার বেশী সম্বল নেই; তথাপি বাদশাহী যুগের কীর্ত্তিরাজি দেখে জীবন ধন্য করব, এ উৎসাহ ছিল পুরা মাত্রায়। আপাততঃ মুড়ি খেয়ে পেটটাও একটু ঠান্ডা হয়েছিল; তাই স্টেশন থেকে শহরে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হলাম।

কাঁধে বোচকা, হাতে ছাতা "মুসাফির" পথ বেয়ে চল্লাম শহরের দিকে। স্টেশন থেকে সামান্য দূরে গিয়েই শহরের সীমানা। এঁকে বেঁকে পথ চলেছে, দু'পাশে গাছে-ঢাকা গৃহরাজি। শহরের এ অঞ্চলকে ঠিক শহর না বলে শহরতলি বল্লেই ভালো হয়। দেখলাম, মিউনিসিপ্যালিটী এখনও শহরটাকে ঠিক আধুনিক শহরের মতো করে গড়ে তুলতে পারেনি; তাই এখানে-সেখানে ঝাড়-ঝোপ, নালা-ডোবার ছড়াছড়ি।

লোহার পুল পেরিয়ে একটু অগ্রসর হয়েই রাস্তার বাঁ পাশে একটা মসজিদ দেখতে পেয়ে বিশ্রামের আশায় তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মসজিদের ইমাম একজন মাদ্রাসার ছাত্র, তিনি সেখানেই থাকেন, পাড়ার লোকে তাঁর খরচ যোগায়। তাঁর সাথে অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। কথায় কথায় তিনি বল্লেন, বাবুবাজার মসজিদে গেলে সেখানে খাওয়া-থাকা দুটারই সুবিধা হবে; সেখানে নাকি মুসাফিরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। হাঁটতে হাঁটতে এ-পথ সে পথ ঘুরে অবশেষে বাবুবাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। সুদৃশ্য মসজিদখানা দেখে মনে একটু আশারও সঞ্চার হলো। ভাবলাম, এত সুন্দর করে যে মসজিদ তৈরি হয়েছে, তার মোতয়াল্লীরা নিশ্চয়ই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন লোক এবং মুসাফির মিসকিনের জন্য তাঁদের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু মসজিদে ঢুকে অল্পক্ষণ পরেই আমার ভুল ভেঙ্গে গেলো। মাগরেবের নামাজের পর মসজিদের

www.pathagar.com

বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় একটা লোক (সম্ভবতঃ মসজিদের মোয়াজ্জিন হবে) এসে আমায় জানাল, সেখানে নাকি কারো থাকার ব্যবস্থা নেই- খাওয়া ত দূরের কথা। আমি যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে পড়লাম। বিদেশ-বিভূঁইয়ে-এ অপরিচিত শহরে রাত্রিবেলা কোথায় যাব আশ্রয়ের আশায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমি মোয়াজ্জিনের মুখের দিকে চাইলাম। আমার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেই বোধ হয়, মোয়াজ্জিনের হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি আমায় উপদেশ দিলেন-বংশাল মসজিদে যাওয়ার জন্যে। সেখানে গেলে থাকা-খাওয়া সব বিষয়েরই সুবিধে হবে, এ-ও তিনি বলে দিলেন এবং মসজিদের গেট থেকে বেরিয়ে ইঙ্গিতে আমায় বংশালের পথটাও দেখিয়ে দিলেন।

কি আর করি, গাঁ-দেশ হলে না হয় গাছ তলায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু শহরে যে তাও সম্ভবপর নয়। অগত্যা বাবুবাজার মসজিদ থেকে বেরিয়ে বংশালের পথে চললাম- লোককে জিজ্ঞাসা করে করে। এশার নামাজের সামান্য কিছু আগে বংশাল মসজিদে গিয়ে পৌঁছলাম। নামাজ পড়ে মসজিদের বারান্দায় চুপ করে বসে-বসে ভাবতে লাগলাম- এত দুঃখ যে পথে, সেই মুসাফির জীবনের শেষ কোথায়? পেটের ভেতর তখন দস্তুরমত আগুন জ্বলে উঠেছে। কবে সেই মুনশীগঞ্জে পেট ভরে দুটো ভাত খেয়েছিলাম, তারপর প্রায় দু'দিন হতে চললো, কেবল দু'পয়সার মুড়িই মাত্র পেটে পড়েছে।

বসে-বসে দুরদৃষ্টের কথা ভাবছি, এমন সময় একটা লোক নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি মুসাফির কিনা এবং খাওয়া হয়েছে কিনা। তাকে যথাযথ উত্তর দিলে পর, তিনি আমায় সঙ্গে করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে মসজিদের পূর্ব দিকের একটা দালানে পায়রার খোঁপের মত ছোট্ট একটা অপরিস্কৃত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেটা একটা হোটেল; প্রায় সত্তর বছর বয়সের এক কুজো বুড়ি এ হোটেলের মালিক। বুড়ি কানে কম শুনে, সম্ভবতঃ চোখেও খুব কমই দেখে। ভদ্রলোকটি খুব উঁচু গলায় বুড়িকে বলে দিলেন আমায় ভাত দেওয়ার জন্যে। এত চীৎকার করে কথা বলা সত্ত্বেও বুঝি বুড়ির কানে তা পৌঁছায়নি। সে ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোকের মুখের পানে চেয়ে উচ্চারিত কথাটার মানে বুঝে নেবার চেষ্টা পেল। ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাতের ইঙ্গিতে আমায় দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন ভাত দিতে। এতক্ষণে বুড়ি কথার মর্ম বুঝতে পেরে বলে উঠল, "ভাত"? তা বাপু দেব বৈকি; ওত আমার পেশা। তা এখানে বসো। একটা অপরিস্কৃত ছেড়া মাদুরের উপর ময়লা-জড়ানো একটা ঝাঁটার কয়েকটা পোঁছ দিয়ে মাদুরখানায় আরো কিছু ময়লা মাখিয়ে বুড়ি আমায় তার উপর বসার জন্যে ইঙ্গিত করল। ঘরের চার পাশে লক্ষ্য করে দেখলাম, ঘরখানা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় জোর চার পাঁচ হাত হবে; তারি এক কোনে আবার চুল্লী। চুল্লীর ধুমে ঘরের দেয়াল, ছাদ সব একাকার হয়ে গিয়েছে- চেনবার উপায় নেই, ঘরখানা ইট দিয়ে তৈরি, না আলকাৎরা দিয়ে।

www.pathagar.com

দু'দিন উপবাসের পর ভাত খাওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষুধা যেন তখন আরো দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছিল। কোন দিকে লক্ষ্য না করে বুড়ির নির্দেশ মত সেই ময়লা মাদুরখানার উপরই বসে পরলাম। বুড়ি তার পোড়া-কাঠের মত হাতখানা দিয়ে হাঁড়ির ভেতর থেকে একটা বাসনে কিছু ভাত বেড়ে দিয়ে আর একটা হাঁড়ি থেকে শাকের মতো একটা জিনিষ বের করে ভাতের এক পাশে সাজিয়ে আমার সামনে এনে হাজির করল। পাতে হাত দিয়ে দেখলাম, শাকটা পুঁই শাক, ছোট ছোট চিংড়ি মিশিয়ে রাঁধা। পুঁই শাক ছেলেবেলা থেকেই খাই না; বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলাম- আর কিছু আছে কিনা। বুড়ি ডালের পেয়ালাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে- "বাপু, আর কিছু নেই- সব ফুরিয়ে গেছে।" অগত্যা করি আর কি, ডাল দিয়েই পাতের ভাতগুলি শেষ করে হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন-এত শীগগীর খাওয়া হয়ে গেল কেমন করে। বল্লাম- "বেশি ক্ষিধে ছিলনা, সামান্য কিছু খেয়েছি মাত্র"। পকেট থেকে পয়সা বের করে হিসাব করে বুড়িকে বুঝিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাবার সময় আমায় বলে গেলেন মসজিদের বারান্দায় শুতে।

যাই হোক না কেন, কিছু খেয়ে পেটটা অনেকটা ঠান্ডা হয়েছিল। মসজিদে গিয়ে বারান্দায় কাপড় পেতে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম-আমারি মতো আরো কয়েক জন গৃহহীন হতভাগা এদিক সেদিক শুয়ে আছে। ভাবতে লাগলাম, যাদের সামান্য একটু মাথা গুজার স্থান ও নেই, তারা কেন জন্ম নিয়েছে জগতে শুধু ভীড় বাড়াতে। একজন রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় আরামে আয়াসে দিন কাটাচ্ছে, আর একজন ঝড়-বৃষ্টি, শীতাতপ থেকে মাথাটা বাঁচাবার মতো একটু ঠাঁইও কোথায় পাচ্ছে না, বিশ্বময় এ অবিচার কেন চলছে তাও ভাবছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল-সুখনীড় বাড়ীর কথা, মায়ের স্নেহাঞ্চলের কথা। চোখ বেয়ে অজ্ঞাতেই দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মনে হলো, আকস্মিক উত্তেজনায় গৃহত্যাগ করে বাস্তবিকই বড় ভুল করেছি। কিন্তু এ ভুল সংশোধনের কোন্ উপায়ই তখন আর ছিল না।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না; মোয়াজ্জিনের "আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম"- চীৎকারে ঘুম ভাঙলো। উঠে ওজু করে এসে ফজরের নামাজ পড়লাম এবং অতঃপর গাঁঠরী-বোচকা নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই-জানিনা কোথায় যাব, কি করব-তবু পথ বেয়ে চলেছি আনমনে। বংশাল মসজিদ থেকে বেরিয়ে কোন দিকে গিয়েছিলাম আজ আর তা ঠিক করে বলতে পারবো না। ঢাকায় পা দিয়েই আমার এমন করে দিগভ্রম হতে লাগল, যে কিছুতেই আমি ঠিক করতে পারছিলাম না, কোনটা উত্তর, কোনটা দক্ষিন, কোনটা পূর্ব আর কোনটাই বা পশ্চিম-সবই যেন আমার কাছে একাকার মনে হচ্ছিল। সেই পুরানো ভুলটা যেন আমার

www.pathagar.com

আজো কাটেনি-এখনো পশ্চিম দিকটাকে উত্তর বলেই আমার মনে হয়। কাজেই আজ থেকে প্রায় তিন যুগ আগে কোন পথে কোন দিকে যে গিয়েছিলাম, তা ঠিক করে বলা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে-মাহুতটুলী নাকি তার নাম- এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোন দিকে যাব, হঠাৎ পার্শ্ববর্তী একটা গৃহের রোয়াকে বসা এক বৃদ্ধ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন,- "ইয়ে লাড়কা, এধার আও।" উর্দু ভাষা আর কিষ্কিন্ধ্যা বা হনুলুলুর ভাষায় তৎকালে আমার নিকট কোন প্রভেদ না থাকলেও বৃদ্ধের হাতছানির মর্ম উপলব্ধি করতে পেরে আমি তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বৃদ্ধ- বেশ আদর করে আমায় তার মাদুরাসনের একাংশে বসতে দিলেন। তারপর কথার পালা। তিনি উর্দুতে আমায় প্রশ্ন করেন, আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না- হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। শত চেষ্টা করেও বৃদ্ধ আমায় কিছুই বুঝাতে পারছিলেন না-সে কী কসরৎ, দস্তুরমতো গলদ ঘর্ম কাণ্ড। অবশেষে পার্শ্বে বসা এক ভদ্রলোক এসে আমাদের মধ্যে দোভাষী হলেন। তিনি আমায় জানালেন-বৃদ্ধের নাম হাফিজ সাহেব শহরের কোথাকার এক বিরাট মসজিদের পুনর্গঠনে নাকি আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তজ্জন্য অনেক টাকার দরকার। তাই হাফিজ খলিলুল্লাহ-ঢাকা শহরের তিনি একজন নামজাদা আলেম। সম্প্রতি হাফিজ সাহেব আমায় অনুরোধ করছেন, বাংলা ভাষায় একটা সাহায্যের আবেদন লিখে দেওয়ার জন্যে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম-ব্যাপারখানা কি। বল্লাম- "বেশ, কাগজ আনুন-লিখে দিচ্ছি।" কাগজ এল, আবেদন লিখতে বসলাম। কথায় কথায় বৃদ্ধ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দিলাম তালেব-এলম বলে।

আবেদন লিখা শেষ হলে পর হাফিজ সাহেবকে তা পড়ে শুনালাম। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হলেন; আমায় অনুরোধ করলেন-সেদিনটা তাঁর ওখানে থেকে যাবার জন্যে। ছন্নছাড়া গৃহহীন পথবাসী আমি-আপত্তির আমার কোন কারণই ছিল না। সুতরাং গাঁঠরী-বোচকা সব হাফিজ সাহেবের ঘরে রেখে তাঁর সাথে বসে আলাপ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হাফিজ সাহেব উঠে চলে গেলেন তার বাড়িতে। মাহুতটুলীর এ ঘরটা নাকি তাঁর বৈঠকখানা। ক্ষুধার জ্বালা যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে-সেই সময়ে-বেলা প্রায় তিনটা হবে তখন-একটা আট-দশ বছরের ছেলে বাসনে করে কিছু ভাত নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি ভাত দুটো খেয়ে পেটটা একটু ঠাণ্ডা করলাম। বিকাল বেলা একটু বেরিয়েছিলাম। অপরিচিত শহর, কোথায় যাই একা একা। এ গলি সে-গলি করে কিছুক্ষণ ঘুরে সন্ধ্যার সময় আবার হাফিজ সাহেবের আড্ডায় ফিরে এলাম। দেখলাম হাফিজ সাহেব আবার মজলিস গুলজার করে বসেছেন কতকগুলি লোক নিয়ে।

রাত নটার সময় হাফিজ সাহেব তাঁর বাসায় চলে গেলে পর, দিনের বেলাকার ছোড়াটাই

www.pathagar.com

ভাত নিয়ে এল। ভাত খেয়ে গাঁঠরী মাথায় দিয়ে ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর কেউ সে ঘরে ছিল না, শুধু আমি আর সেই ছোকরাটি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম-অদ্ভুত প্রকৃতির এই হাফিজ সাহেব লোকটারই কথা। তাঁর উদ্দেশ্য কি, তাঁর পেশা কি-সবই যেন আমার কাছে নেহায়েৎ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, খোদার এ বিশাল দুনিয়াটা একটা চিড়িয়াখানারই মতো-এখানে হরেক রকম জানোয়ার আছে; তার মধ্যে কোনটা কোন প্রকৃতির, তা চেনা বড় সোজা নয়।

বেচারা হাফিজ সাহেব আজ পরলোকে। তাঁর কাঁচা ঘরখানা এখন আর নেই, তার বদলে এক দ্বিতল অট্টালিকা সেখানে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। খোদা বেচারা হাফিজের আত্মার কল্যাণ করুন। তিনি আমার সাথে যে সদব্যবহার করেছিলেন, যদি আমি তা ভুলে যাই, তবে আমার পক্ষে নেহায়েত অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে হাফিজ সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেই তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার অনির্দিষ্ট যাত্রা। পকেটে কিছু নেই-ভাবতে লাগলাম কি করি। বেলা প্রায় বারোটার সময় পগোজ স্কুলের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। স্কুলভরা ছাত্র দেখে চাঁদপুরের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, স্কুল ছেড়ে আমার জীবন কি সত্যিই ধ্বংসের পথে চলেছে? মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু পেটের ভাবনা তখন আর সকল ভাবনাকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। Leisure period-এ অনেকগুলি ছেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে এল। পকেটে তখন আমার একটা Gem Dictionary-ছিল। ভাবলাম, এসব ছেলের কারো কাছে এটা বিক্রি করলে ত কিছু পয়সা পাওয়া যেতে পারে। অতি সঙ্কোচিতভাবে একটা ছেলের সামনে গিয়ে বল্লাম, "ভাই আমার কিছু পয়সার দরকার; এ Dictionary-টা তুমি কেনবে?" ছেলেটা কেমন যেন থতমত খেয়ে আমার মুখের পানে চাইল; তারপর হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে বইখানা নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বল্ল-"কত দিতে হবে?" বল্লাম,-"যা হয় দাও, বন্দু।" "নতুন অবস্থায় এ বারো আনায় পাওয়া যায়, পুরানো অর্ধমূল্য ছ'আনা, কি বলো?" ছেলেটি পকেট থেকে ছ'আনা পয়সা বের করে আমার হাতে দিল। কৃতজ্ঞ চিত্তে পয়সাগুলি নিয়ে আবার পথ ধরলাম।

এক পয়সাও যার কাছে ছিল না, সে এখন ছ'আনার মালিক। বুকখানা যেন ফুলে আধ হাত বেড়ে গেলো। একটা দোকান থেকে কিছু খাবার খেয়ে বেরুলাম-একে একে বাদশাহী যুগের কীর্ত্তিগুলি দেখতে। প্রথমেই ছোট-কাটরা, বড়-কাটরা-বাদশাহী যুগের দু'টি জীর্ণ কঙ্কাল। চারদিকে আবর্জনার স্তুপ, অনেক জায়গা ভেঙ্গে পড়েছে, মাঝে মাঝে এক-আধটা কুঠরী পরিষ্কার করে গৃহহীন একদল হতভাগা ভিখারী আশ্রয় নিয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য। মনে হতে লাগল-একদিন এসব গৃহই ত আমীর ওমরাহ আর বেগমদের বসবাসের

www.pathagar.com

জন্য তৈরি হয়েছিল। আর আজ? চার দিকেই যেন "ক্ষুধিত পাষানের" ফরিয়াদ ঘুরে ফিরছে। দেয়ালের ভাঙ্গা ফাটল হা করে দর্শককে গিলতেই যেন আসছে। দেখে বাস্তবিকই ভয় হয়।

কাটরা থেকে বেরিয়ে চকের মসজিদে গেলাম। মসজিদের বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হলোনা। উপরে উঠে মাওলানা হাফিজ আহমদ সাহেবের মকবেরাহ জেয়ারৎ করলাম। চারদিকে কী শান্তির ছায়া-মন যেন স্বভাবতঃই দ্রবীভূত হয়ে যায়।

চক থেকে লালবাগের পথে অগ্রসর হলাম। অনেকটা দূরে গিয়ে সর্ব্ব প্রথমেই বিরাট শাহী মসজিদ পেলাম। দালানী ফ্যাশানে প্রস্তুত কি প্রকাণ্ড মসজিদ। মরহুম নওয়াব স্যার আবদুল গণি সাহেব বহু টাকা খরচ করে মসজিদখানা মেরামত করে দিয়েছিলেন। এখন এখানে নিয়মিত ভাবে নামাজ হয়। মসজিদের বিরাটত্ব দেখে মনে অতীতের কত কথাই না জেগে উঠে।

শাহী মসজিদ থেকে বেরিয়ে একটু সামনে অগ্রসর হলেই শাহানশাহ জাহাঙ্গীরের অসম্পূর্ণ কেল্লার ভগ্নাবশেষ নজরে পড়ে। স্থানে স্থানে এখনো দু'তলা দেয়ালগুলি অতীতের প্রহরীর মতোই মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু ভেতরে কিছু নেই-সব শুন্য। একটা উচু ঢিবির উপর এখন পুলিশ ব্যারাক অবস্থিত। তারি সামনে শাহজাদী পরীবানুর সুদৃশ্য সমাধি-সৌধ। যে ঢিবিটার উপর ব্যারাক অবস্থিত, তারি নিচে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ দেখা যায়। সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে ভেতরে খিলানযুক্ত ইমারতের কতকাংশ নজরে পড়ে। এ সুড়ঙ্গের ভেতরে কী আছে, আজ পর্যন্ত কেউ তার রহস্য আবিষ্কার করতে পারেনি, অনেকেই নাকি চেষ্টা করে বিফল প্রযত্ন হয়েছেন। স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে সুড়ঙ্গের ভেতরে নাকি কালো কম্বলধারী এক দরবেশ বাস করেন। যেদিন দরবেশ সাহেব কালো কম্বলে দেহ আবৃত্ত করে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেদিন নাকি বাঙলায় আবার মুসলমানদের বাদশাহী কায়েম হবে-এ বিশ্বাসও সাধারন মুসলমানদের আছে। সুড়ঙ্গের মুখটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে কল্পিত দরবেশ সাহেবের অথবা অপর কোন মানুষের বাসের কোন আভাষই পাওয়া গেল না। অতীয় স্মৃতির ব্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অবশেষে লালবাগ পরিত্যাগ করলাম।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আজ যখন দেশে সত্যি ইসলামী হুকুমৎ কায়েম হয়েছে, তখন স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগছে-লালবাগ কেল্লার কল্পিত দরবেশ সাহেব সত্যিই কি কালো কম্বলে দেহ আবৃত করে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

হোসেনী দালান বা নদী-পারের শাহী কামানটা দেখার সুযোগ আর হয়ে উঠল না। বিকাল প্রায় পাঁচটায় শহর ছেড়ে টঙ্গীর পথে যাত্রা করলাম। শহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত একটা গাঁয়ে এক গেরস্তর বাড়িতে রাতটা কাটালাম মুসাফির হয়ে। রাতে শুয়ে শুয়ে মনে মনে

www.pathagar.com

বিচার করছিলাম অতীত আর বর্তমানের মুসলমানে কত পার্থক্য। অতীতের মুসলমানেরা ছিল সত্যিই বিরাট, মহীয়ান। আর আজিকার আমরা হৃত-সর্বস্ব ভিখারী। কেন এ পরিবর্তন হলো, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে পড়ল কোরআনের বাণী ঃ

"ইন্নাল্লাহা ল-ইউগায়েরো মা বে-কওমীন্
হাত্তা ইউগায়েরো মা বে-আন্ফুসেহীম্।"

খোদা বলছেন,- "কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন আমি করি না ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে।"

ডিষ্টিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। বেলা তখন প্রায় বারোটা বাজে-বেজায় ক্ষিধে পেয়েছিল। পূর্ব রাত্রে যে কৃষকের বাড়িতে ছিলাম, সকাল বেলা বিদায় নেওয়ার সময় সে সামান্য কিছু পান্তা খেতে অনুরোধ করেছিল; কিন্তু বিশেষ ক্ষিধে তখন না থাকায় খাইনি। এক্ষণে বেলা প্রায় দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবতে লাগলাম-কোথায় যাই, দু'টো খাবার কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

রাস্তার বাঁ পাশে মৈনপুরের সরকারী কৃষিক্ষেত্র। মাঠের মাঝখানে সুন্দর বাংলো; তাতেই প্রায় হাজার তিনেক টাকা মাইনের বিলেতি কৃষিবিশেষজ্ঞ নবাবী হালে বাস করে চাষ-বাসের তদারক করেন। বাঙলার মাটিতে যেখানে হতভাগ্য চাষী দুই বেলা দুই মুষ্ঠি নুন ভাতেরও যোগাড় করতে পারেনা-এমন দেশে কৃষি-বিভাগের ইংরাজ সাহেব বিলাষী ফ্যাশানে চাষের কাজ করবার চেষ্টা করছেন দেখে হাসি পেল। ভাবলাম-হাজার হাজার টাকা মাইনের সাহেব কর্মচারী পুষতে গিয়ে হতভাগ্য গরীব দেশের টাকাটা সরকার কিরূপভাবেই না পানিতে ফেলে দিচ্ছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ এ অবস্থার অবশ্য অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে।

মৈনপুর কৃষিক্ষেত্র পেরিয়ে আরো কিছুদূর গিয়ে পূব দিকে একটা গাঁও। ভাবলাম-সেখানে গিয়েই কোথাও খাবার চেষ্টা করা যাক। রাস্তা থেকে গাঁয়ে যেতে হলে অনেক কাঁদা-পানি ভাঙতে হয়; মাঝে একটা খালও আছে-খালের উপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে সামনে সামান্য একটু অগ্রসর হতেই একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা। বয়স তার চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে। সুন্দর গেঁয়ো তম্বি-যেন একটা বনফুল জঙ্গলের মাঝখানে অযত্নে বিকশিত হয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালেই রূপগন্ধ বিলিয়ে যাচ্ছে। তম্বী আমায় জিজ্ঞাসা করল- "খোকা, তুমি কাদের বাড়ি যাবে?" কি উত্তর দেব-লক্ষ্যহীন মুসাফির আমি। বল্লাম-"বলত, এ গাঁয়ে কাদের বাড়ি গেলে দু'টো খাবার পাওয়া যেতে পারে?" তম্বী হেসে উত্তর দিলে, -"ওঃ তাই। তা আসনা তুমি আমাদের বাড়ীতে; আমরা কি আর তোমায় দু'টো খেতে দিতে পারব না।"

তম্বী তরুণীর পিছু পিছু তাদের বাড়ীতে গেলাম। গরীব চাষীর ঘর, স্বামী স্ত্রী দু'জনাই তারা এ গৃহে নীড় বেঁধে আছে। স্বামী বোধ হয় তখন মাঠে গিয়েছে, স্ত্রী একাই বাড়ীতে।

www.pathagar.com

গৃহে পৌঁছে তরুনী আমায় হাত মুখ ধোবার জন্য পানি দিয়ে ঘরের মেঝেয় একখানা ছোট্ট চাটাই বিছিয়ে ভাত বেড়ে দিল। আমি খেতে বসলে আমার সামনে বসে সে আপন বোনের মতোই স্নেহে আমায় খাওয়ালে। খাওয়া শেষ হলে পর একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্ল, "খোকা, এখুনি কি তুমি চলে যাবে-না, থাকবে?" বল্লাম, "নাগো, যাই-তোমার আদর যত্নের কথা চিরকাল মনে থাকবে।"

তরুণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু অগ্রসর হয়েই একবার পেছনে ফিরে চাইলাম। দেখলাম বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক নয়নে সে তখনো আমার পানে চেয়ে আছে। মনে পড়ল-এমনি আর একটা দিনের কথা। গৃহ ছেড়ে যেদিন বেরুই, মা-ও এমনি করে তাঁর হতভাগা সন্তানের পানে চেয়েছিলেন। ভাবলাম স্নেহ-মমতায় গড়া বলেই বুঝি নারী মায়ের জাত। বুকটা বড় ব্যথিয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম।

তার পরের দু'টো দিন আমার জন্যে অতি কষ্টের দিন। রেল-রাস্তা ধরে টঙ্গী থেকে ভৈরবের পথে চলেছি- দু'দিনের মধ্যে পেটে একটা দানাও পড়েনি। রাস্তা থেকে দু'পাশের গাঁয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই- দারুণ বর্ষায় রেল-পথের দু'পাশে যেন সাগরের সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া কোনো স্টেশনে একটা চিড়া-মুড়ির দোকানও নেই। দু'দিন পর একটা স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম-নিকটেই বাজার আছে, কিন্তু বাজারে যেতে হলে অনেকখানি জায়গায় পানি। অনুসন্ধান করে কোন নৌকা পেলাম না। অগত্যা প্রায় পোয়া মাইল খানেক পথ সাঁতরিয়ে বাজারে গিয়ে একটা দোকান থেকে কিছু চিড়া আর বাতাসা কিনে খেয়ে দু'দিন উপবাসের পর পেটটাকে একটু ঠান্ডা করলাম।

ঢাকা থেকে রওয়ানা হওয়ার চতুর্থ দিন প্রাতে ভৈরব স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনের নিকটেই এক মুড়িওয়ালী বসেছিল। তার নিকট থেকে দু'পয়সার মুড়ি কিনে স্টেশনে বসে-বসে চিবিয়ে খেলাম। খাওয়া শেষ করে পানির সন্ধানে বেরিয়েছি, অমনি সামনে দেখতে পেলাম আমার এক আত্মীয়কে। সম্ভবতঃ ঢাকায় আসার মতলবেই তিনি আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব এসে (ভৈরবের পুল তখনও তৈরি হয়নি) গাড়ীতে চাপছিলেন। আত্মীয়টি আমায় দেখতে পাননি. কিন্তু আমি তাঁকে দেখেই দিলাম একেবারে ভোঁ-দৌড়। কি জানি, যদি দেখে ফেলেন, তবে কি কৈফিয়ৎ দেব।

www.pathagar.com

তৃতীয় মঞ্জিল

ভৈরব কলুপাড়া। কয় ঘর গরীব কলু এখানকার বাসিন্দা। প্রত্যেক বাড়িতেই এক-একটি ঘানী-গাছ আছে; কারো কারো সামান্য কিছু জমি জমাও রয়েছে। প্রায় তিন যুগ আগে একদিন এখানকার এক পর্ণ-কুটীরে যে বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলাম, আজ অতীতের কাহিনী লিখতে গিয়ে সে মধুর স্মৃতি বারে-বারেই হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলছে। প্রকৃত প্রাণ যে গরীবের ঘরেই রয়েছে, মানুষের মাঝেই যে কখনো-কখনো ফেরেশতার সন্ধান পাওয়া যায়, কলুপাড়ার এক কুঁড়ে ঘরে তারই পরিচয় পেয়েছিলাম।

আত্নীয়ের চোখ এড়াবার জন্যে স্টেশন থেকে পালিয়ে কিশোরগঞ্জের লাইন ধরে সোজা পশ্চিম দিকে কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ীর পাশে মুরগী চরছে দেখে ভাবলাম,- এ বাড়ীটা ত নিশ্চয়ই মুসলমানের, যাইনা এখানে গিয়েই পানি খেয়েনি। মুড়ি খাওয়ার পর পানি খাওয়ার আবশ্যকতা তখন খুবই অনুভব করছিলাম। অগ্রসর হয়ে বাড়ির দরজায় গিয়ে হাঁক দিলাম, "কেউ বাড়ীতে আছেন?" একটি বছর ত্রিশেক বয়সের মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,- "কেহে খোকা, তুমি কাকে চাও?" বল্লাম- "মুসাফির আমি, বড় পিপাসা পেয়েছে, একটু পানি খেতে চাই, মা।" নারী আমায় বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একখানা জল-চৌকিতে বসতে দিলেন। তারপর একটা বড় গ্লাসে করে আমার সামনে পানি দিয়ে বল্লেন,- "সকাল বেলা খালি পেটে পানি খাবে, আগে দু'টো পান্তা খাওনা কেন। গত কয় দিনের উপর্য্যুপরি উপবাসের কথা মনে করে উত্তর দিলাম, "আচ্ছা দাও, খেয়েই যাই।"

নারী প্রকৃত মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে আমায় বসবার জন্যে ঘরের মেঝেয় একখানা ছোট্ট চাটাই বিছিয়ে দিলেন। তারপর আমার চোখের সামনেই একখানা বাসনে কিছু পান্তা বেড়ে দিয়ে, তরকারীর হাঁড়ীর মুখ খুলেই অকস্মাৎ বলে উঠলেন,- "ওমা, কি হবে গো, তরকারী যে একটুও নেই।" তাঁর এ বিব্রত ভাব দেখে ঝটিতি উত্তর দিলাম,- "আচ্ছা, তরকারী নেই, তা আর কি হয়েছে। যদি পার, দু'টো লঙ্কা দাও, আর কিছু নেমক।"

লঙ্কা আর নেমকের সাহায্যে পান্তাগুলির সৎকার করছিলাম, আর নারী আমার সামনে বসে মায়ের মত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমায় নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কাঁদছ কেন গো?" আচলে চোখ মুছে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, খোকা তুমি তা বুঝবেনা। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ তুমি, ভেবে দেখতো,

www.pathagar.com

তোমার মা'র দশা আজ কি হচ্ছে। লক্ষ্মীটি, তুমি বাড়ি ফিরে যাও, মাকে আর কষ্ট দিও না।"

মাথা নত করে নীরবে খেয়ে উঠলাম, কোন উত্তরই দিলাম না। খেয়ে সেরে আবার এসে দাওয়ার চৌকিখানার উপর বসলাম। একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে নারী বল্লেন- "খোকা, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি, তুমি এখন শুয়ে বিশ্রাম করো; তারপর দুপুর বেলা রাঁধলে পর খেয়ে-দেয়ে যাবে খন।" বল্লাম,- "না গো, এখন গেলেই ভালো হয়।" কিন্তু স্নেহময়ী সে পল্লীবালা আমায় কিছুতেই তখন ছাড়লেন না। বিছানা পেতে তিনি আমায় মায়ের মতই স্নেহে শুতে দিলেন। দুপুর বেলা রমনীর স্বামী বাড়ী এলে পর আমায় ডেকে ঘুম থেকে উঠান হলো। তারপর দু'জনায় মিলে গোসল করতে গেলাম এক পুকুরে। গোসল করে এসে দেখলাম খাবার তৈরি হয়েছে। খেতে বসলাম। রমনী প্রকৃত মাতৃ-হৃদয়ের দরদ দিয়ে আমাদের পরিবেশন করতে লাগলেন। খাওয়া হয়ে গেলে পর একটা পান মুখে দিয়ে গাঁঠরী-বোচকা নিয়ে রওয়ানা হলাম। বিদায় দেওয়ার সময় রমনী আমার মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে স্নেহজড়িত স্বরে বলেছিলেন, "বাপ লক্ষ্মী আমার, যাও, বাড়ী ফিরে যাও, মায়ের মনে আর কষ্ট দিও না।" সেদিন আবার নতুন করে বুঝতে পেরেছিলাম-নারী হৃদয়ে বিধাতা কত অফুরন্ত স্নেহই না সঞ্চিত রেখেছেন।

বুকভরা ব্যথা নিয়ে আমার সে পথের মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছন্নছাড়া মুসাফির আবার পথ ধরলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পেছন ফিরে দেখতে পেলাম-রমণী বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে করুণ নয়নে আমার পথের পানে চেয়ে আছেন, চোখ তাঁর অশ্রুর ধারা। আজ এত বর্ষ পর, এখনো আমার মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয়, আবার ভৈরবে গিয়ে সে স্নেহময়ী নারীর সামনে বসে দুটো পান্তা খেয়ে আসি। জীবনে কত মূল্যবান খাদ্য-সামগ্রীই না খেয়েছি, কিন্তু মুসাফির জীবনের কলুপাড়ার সেই পান্তার মত এত সুস্বাদু অমৃততূল্য ত আর কিছুই মনে হয় নি।

ভৈরব থেকে সোজা কিশোরগঞ্জের পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। ভূমিকম্পে রেল-পথের মাঝে-মাঝে অনেক পুল ভেঙে গিয়েছিল; সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। অতি কষ্টে তিন দিনে কিশোরগঞ্জে গিয়ে পৌছলাম। পথে চাঁদপুর নামক স্থানে হাজী বাড়ীতে যে আতিথেয়তার পরিচয় পেয়েছিলাম, আজো তা ভুলতে পারি নি। হাজী সাহেবেরা চার ভাই- বছরের বারোটা মাস তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন অতিথি মুসাফিরের সেবার জন্য। কাজেই কোন দিনই সেখান থেকে মুসাফিরকে ক্ষুন্ন মনে ফিরতে হয় না। কিশোরগঞ্জে পৌছে লোককে জিজ্ঞাসা করে করে হয়বৎনগর দেওয়ান বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম বিকেল প্রায় পাঁচটার সময়। নিকটস্থ প্রাচীন মসজিদে মাগরেবের নামাজ পড়ে তথায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম দেওয়ান বাড়ির পুরাতন প্রাসাদ আজ

www.pathagar.com

অতীতের ভগ্নাবশেষ হয়েই দাঁড়িয়েছে। বর্তমান দেওয়ান সাহেব নিকটেই নতুন হাবেলী তৈরি করেছেন।

দেওয়ান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখে বাঙলার স্বাধীন পাঠান সর্দ্দার বারভূঞার মুকুট মনিঈসা খাঁ মসনদ আলীর পূণ্য-স্মৃতির কথা মনের কোণে জেগে উঠল। বঙ্গ-শার্দ্দূল ঈসা খাঁর বংশধরগণ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তা ভাবতে গিয়ে মন ব্যথায় ভরে উঠল।

দেওয়ান বাড়ীর ব্যবস্থা অনেকটা নবাবী চালেরই। রাতের খাবার পেলাম রাত প্রায় একটার সময়-ক্ষিদেয় যখন পেট দস্তুর মত চোঁ-চোঁ কচ্ছিল। যা হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর কাচারী ঘরে এক প্রবীন ভদ্রলোকের (সম্ভবতঃ ইনি দেওয়ান বাড়ীর নায়েব) কামরায় একখানা চৌকিতে শুবার স্থান পেলাম। আমার সঙ্গে একটি বার-তেরো বছরের ছেলেও শুল। ছেলেটি উক্ত ভদ্রলোকের পুত্র, স্থানীয় আজিমুদ্দীন হাই-স্কুলে Class IV-এ পড়ে।

রাত্রিটা বেশ আরামে কেটে গেলো। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লাম এবং তারপর কাচারী ঘরে এসে আবার বসলাম। প্রবীন ভদ্রলোকটি তখন আমায় উদ্দেশ্য করে বল্লেন,- "খোকা, তুমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ; অনর্থক ঘুরে মরোনা-যাও বাড়ী ফিরে যাও।" আমি তখন কোন উত্তরই দেইনি' মাথা নিচু করে ছিলাম।

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেলা প্রায় পাঁচটার সময় দেওয়ান বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথ ধরলাম। পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাব এবং এরূপ উদ্দেশ্যহীন ভ্রাম্যমান জীবনের সার্থকতাই বা কী ? তখন এ প্রশ্নের কোন জওয়াবই অন্তর থেকে পাইনি; কিন্তু আজ মনে পড়েছে, বাইবেলের একটা উৎসাহ-উদ্দীপক বাণী ঃ

"I shall give you pain, poverty, sufferings, thousands of sleepless nights, high sores on the long journey, rags to wear and at last a glorious victory".

বাইবেলের এ কথা সত্যিই হজরত ঈসার কথা কিনা জানিনা; কিন্তু এ বাণীতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে বাস্তবিকই প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। দুঃখ, দারিদ্র, ব্যথা-বেদনা, সহস্র বিনিদ্র রজনী, দীর্ঘ অভিযানে ক্ষত-বিক্ষত পদতল, ছিন্ন বসন-এ সবের চরম পুরষ্কার যদি বিজয় গৌরব হয়, তবে অতি বড় দুঃখকেও যে মানুষ অতি অবহেলায় জয় করতে পারবে, তাতে আর সন্দেহ কী।

আনমনে পথ চলেছি-কোথায় যাব, কি করব কিছুই ঠিক নেই। অকস্মাৎ পথিমধ্যে পুরাতন বন্ধু আবুল হোসেন মিঞার সাথে দেখা। চার বৎসর পূর্বে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তার সাথে আমার পরিচয়; তারপর দু'জনায় পত্রের আদান-প্রদানও কম হয়নি। তিনি তখন কিশোরগঞ্জ রামানন্দ হাই-স্কুলে Class VIII-এ পড়তেন। আমায় দেখে আনন্দোৎফুল্ল

www.pathagar.com

হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোত্থেকে অকস্মাৎ ধূমকেতুর মতোই গিয়ে কিশোরগঞ্জে উপস্থিত হলাম। বল্লাম-"ময়মনসিংহে যাব, এখানে নেমে দেওয়ান বাড়ীটা দেখে গেলাম মাত্র।" বন্ধুবর সেদিন আমায় তার জায়গীর বাড়ীতে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। আপত্তির আমার কোন কারণই ছিলনা, অনুরোধ মাত্রই রাজী হলাম।

আবুল হোসেনের জায়গীর বাড়ী শহরের মাঝেই অবস্থিত। বাড়ীর লোকেরা বেশ ভদ্রলোক; মুরগী জবাই করে তারা অতিথি-সৎকার করলেন। বিকাল বেলা একটু বেড়াতে বেরিয়ে আবুল হোসেনের কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলাপ হলো। তন্মধ্যে একজনের কথা আজ আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনি তখন ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সহিত আলাপ করে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি শুধু বইয়ের পোকা নন, বাইরের জগতের খোঁজ খবরও কতকটা রাখেন। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকের নামটা আজ আর আমার মনে পড়ছে না; জানি না তিনি কোথায় আছেন এবং কী ই-বা করছেন।

পরদিন সকাল বেলা কিছু নাশতা করে আবুল হোসেন মিঞার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ময়মনসিংহ যাত্রা করলাম। বিদায় বেলায় বন্ধুবর রাস্তা খরচ স্বরূপ আমায় দু'টো টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্তও এ দু'টো টাকা পরিশোধ করা আমার হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে তিনি যে কোথায় আছেন এবং জীবন সংগ্রামে কতদূর কৃতকার্যই বা হয়েছেন, সবই আমার অজ্ঞাত। আজ শুধু মনে পড়ছে-অতীতের সেই আবুল হোসেনের কথা, জীবনটা যার কাছে ছিল একটা স্বপ্নময় কল্পনা মাত্র। বাস্তব জীবনে সেই সব স্বপ্নকে তিনি কতটা রূপ দিতে পেরেছেন, আজ যদি তা' জানতে পারতাম, তবে কত সুখের হতো। কিন্তু জীবনটা সত্যি পান্থশালা-এখানে কতো মুসাফিরের সাথে পরিচয় হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কয়জনের সঙ্গে পুনঃপরিচয়ের সুযোগ ঘটে।

হোসেনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে চেপে সোজা গিয়ে পৌছলাম গৌরীপুরে। এখানকার প্রকাণ্ড জমীদার বাড়ী বাস্তবিকই দেখবার মতো। গৌরীপুরে একদিন ছিলাম-এক ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হয়ে। পরদিন সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা হই ময়মনসিংহের পথে। প্রায় তিন দিন পর ময়মনসিংহে গিয়ে পৌছি। কী বিশ্রী শহর, একটু আতিথেয়তার পরিচয় কোথাও পেলাম না। নদী-পারের হোটেলে খেয়ে সেখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন ময়মনসিংহ ত্যাগ করে গফরগাঁয়ের পথে অগ্রসর হলাম। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে দুই দিন চলার পর গফরগাঁও স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম।

তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা হবে-স্টেশনে বসে আছি, আর ভাবছি রাতটা কোথায় কাটাব। এমন সময় একজন যুবক আমার সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ী কোথায়, কোথায় যাব। যথাযথ উত্তর দিলে পর যুবক আমার নিকটে উপবেশন করলেন এবং নানারূপ আলাপ শুরু হলো। কথায় কথায় যুবকের পরিচয় পেলাম। নাম তাঁর হাশমত

www.pathagar.com

আলী; তিনি সাহিত্যিক- "কল্পকাহিনী" নামে একখানা ছোট্ট গল্পের বই ছাপিয়েছেন এবং শীঘ্রই নাকি তাঁর আরো দু'-একখানা বই বেরুবে। একজন তরুণ সাহিত্যিকের সহিত পরিচিত হয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। হাশমত মিঞা আমায় তাঁদের বাড়ীতে সেদিন থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করে আমি তাদের বাড়ীতে গেলাম।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর সাহিত্যালোচনা শুরু হলো। তরুণ সাহিত্য-সেবী হাশমত মিঞা আমার ভেতর একজন সত্যিকার সমঝদার পেয়ে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর "ভারতীয় তাপস" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কতকাংশ আমায় পাঠ করে শুনালেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, বহুগ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত সাহিত্যিক শেখ আবদুল জব্বার সাহেবের বাড়ীও নাকি গফরগাঁয়ের নিকটেই। শেখ সাহেব সে সময়ে জামালপুরে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন।

আলাপ-আলোচনায় রাতটা বেশ কেটে গেলো। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে হাশমত মিঞার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে জামালপুরের পথ ধরলাম। পথে "ধলা" নামক স্টেশনে সৌভাগ্যক্রমে শেখ আবদুল জব্বার সাহেবের সহিত দেখা হয়ে গেলো। শেখ সাহেব আমায় উপদেশ দিলেন- অনর্থক পথে পথে না ঘুরে বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু তাঁর এ সদুপদেশ তখন আমার কাছে আদৌ ভাল লাগেনি।

"ধলা" থেকে কয়দিনে জামালপুর পৌঁছেছিলাম ঠিক মনে নেই। জামালপুরে মাত্র একদিন ছিলাম। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে জগন্নাথগঞ্জ গিয়ে পৌঁছি। সেখানকার জমিদারী কাছারীর তহশীলদার মহাশয়ের সাহায্যে সিরাজগঞ্জ যাই। স্টিমার থেকে নেমেই সোজা গেলাম মাথাভাঙ্গায় সিরাজী সাহেবের বাড়ীতে। কিন্তু শুনলাম-সিরাজী সাহেব বাড়ীতে নেই-কোনও সভায় বক্তৃতা করতে মফঃস্বলে গিয়েছেন। হতাশ হয়ে সেখান থেকে গেলাম সুপ্রসিদ্ধ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে। তখন বেলা প্রায় দুটো। কিন্তু এই অবেলায়ও মুন্‌শী সাহেবের বাড়ীর লোকেরা আমায় এত আদর যত্ন করলেন যে, আজো তা'ভুলতে পারিনি। তখন বোধ হয় দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই নতুন করে ভাত রেঁধে আমায় খাওয়ানো হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর পাকা মসজিদে গিয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। আসরের নামাজের পর আবার গেলাম শহরে। বাজারের প্রকান্ড টীনের মসজিদটায় রাত কাটালাম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর রেল-রাস্তা ধরে ঈশ্বরদীর পথে রওয়ানা হলাম। স্টেশনে এসে আমারি মতো আর একটা ভবঘুরের সাথে দেখা; তার বাড়ি ময়মনসিংহে-বড় ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে কলকাতা যাবে বলে পালিয়েছে। দু'জনায় এক সাথে ঈশ্বরদী পর্যন্ত গেলাম। এখানে এসে আমাদের মধ্যে মতভেদ হলো;

www.pathagar.com

আমি রাজশাহী যাওয়ার মনস্থ করলাম, আর সে সোজা কলকাতায়। কাজেই দু'জনায় ছাড়াছাড়ি হলো। সামান্য দু'দিনের জন্য একটা সঙ্গী জুটেছিলো- আবার হলাম একা। কিন্তু আমার মনে হয়, পথে-প্রবাসে একক জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন।

দুই দিনের সাথী ছন্নছাড়া বন্ধুটিকে ত্যাগ করতে মনে বেশ একটু ব্যথা বেজেছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, যখন চাঁদপুর ত্যাগ করে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, তখন ত একাই ছিলাম; এই অনির্দিষ্টের অভিযানে কোন সঙ্গী যে কোন সময় পাব, তা তখন ত আদৌ চিন্তাও করিনি। কাজেই আজ দু'দিনের পথের সঙ্গীকে ত্যাগ করতে মনে মনে ব্যথা দোল দিয়ে উঠে কেন? যাক মনের এই সাময়িক দুর্বলতাটাকে অবশেষে উপেক্ষাই করতে হলো। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশন থেকে দুই বন্ধু দুই পথ ধরলাম।

"ঈশ্বরদী" থেকে সোজা রেল-রাস্তা ধরে নাটোর। কয় দিনে যে নাটোরে গিয়ে পৌছেছিলাম, আজ আর তা ঠিক করে বলতে পারব না। নাটোরে পৌছেই সর্বপ্রথম রানী ভবানীর বাড়ীটি দেখবার ইচ্ছে হলো। এত বড় জমিদার বাড়ী ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নি। চার পাশে বড় বড় দিঘী তারি মাঝখানে লাল রঙের প্রকাণ্ড প্রাসাদ-সত্যিই রানী ভবানীর নামের উপযুক্ত। প্রাসাদ দেখতে গিয়ে মনে পড়ল-দূরদর্শিনী রাজনীতিজ্ঞা রাণী ভবানীর সেই স্মরনীয় উপদেশ। বাঙলার স্বাধীনতা -সূর্য নওয়াব সিরাজ-উ-দৌলার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী নেমকহারাম জগৎশেঠ-মীরজাফর যখন কুটীল ষড়যন্ত্র-জাল রচনা করছিল, তখন এই দূরদর্শিনী মহিলাই সাহসে বুক বেঁধে বলতে পেরেছিলেন, -

"কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে,
নিজ হস্তে অনলে দগ্ধিবে সবারে ॥"

রাণীর প্রাসাদ দেখতে গিয়ে পরলোকগতা এই মহিয়সী মহিলার প্রতি মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠল। বাঙলার শেষ স্বাধীন নওয়াব হতভাগ্য সিরাজের দূর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে ক্ষুন্ন মনে রাণীর প্রাসাদ ত্যাগ করলাম।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা হবে। ভাবতে লাগলাম-রাতটা কাটাই কোথায়? রাস্তার পাশে একটা পুরানো ধরনের প্রকাণ্ড বাড়ীর বারান্দায় জনৈক প্রৌঢ় বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখে তাঁর নিকটস্থ হয়ে তাঁকে আমার অবস্থা জ্ঞাপন করলাম। ভদ্রলোক আমায় পাশ্ববর্তী একখানা বেঞ্চে সাদরে বসতে দিলেন এবং জানালেন যে, রাতটা আমার তার ওখানেই থাকা চলবে। অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক তিনি। তাঁর সহিত আমার অনেকক্ষন পর্যন্ত নানা বিষয়ে আলাপ হলো। কথায় কথায় পরিচয় পেলাম, বাড়ীখানা খান বাহাদূর সাহেবের বাড়ি এবং ভদ্রলোক খানবাহাদুর সাহেবের ভাই।

রাত্রিতে খাওয়া শুবার বেশ সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু নাসতা করে উল্লিখিত ভদ্রলোকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রাজশাহীর পথ ধরলাম।

www.pathagar.com

নাটোর স্টেশন থেকে সোজা পশ্চিম দিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তায় মোটর এবং ঘোড়ার গাড়ী (তখনও রাজশাহী যাবার রেলপথ তৈরি হয়নি) সবই যাতায়াত করে; কিন্তু ছন্নছাড়া মুসাফির আমি, আমার পক্ষে গাড়ী-ঘোড়ার কল্পনাও যে অস্বাভাবিক। সুতরাং হেঁটেই চল্লাম।

নাটোর থেকে বারো চৌদ্দ মাইল দূরে এক জায়গায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাস্তার ডানদিকে একটা খড়ো মসজিদ দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ পর তিন-চারটি গ্রাম্য কৃষক মাগরেবের নামাজ পড়তে মসজিদে এলেন। তাঁরা আমায় ধরে বসলেন, নামাজের ইমামতি আমায়ই করতে হবে। একে ছেলে মানুষ-তায় আবার ইমামতি করার মত বিদ্যার দৌড়ও আমার নেই-কেমন যেন একটু বাঁধ-বাঁধ ঠেকাতে লাগল। কিন্তু অবশেষে তাঁদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আল্লাহু-আকবার বলে ইমাম হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। এই আমার জীবনের প্রথম ইমামতি।

নামাজ শেষে মোক্তাদিদের মধ্যে একজন আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং অতি সমাদরে আহার করালেন। আহারের পর বেচারা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় শুবে? অকস্মাৎ উত্তর দিয়ে ফেল্লাম- "মসজিদেই শোয়া যাবে খন"। পরক্ষণেই মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। নির্জ্জন গ্রাম্য মসজিদে একা-একা শোয়া-বাবা, কি ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু মনের এ ভীতিকে মনেই চেপে রাখতে হলো; কারণ যে-কথা একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তার সংশোধনের আর কোন উপায়ই তখন আমার হাতে ছিল না। সুতরাং কিছুক্ষণ পর বাধ্য হয়েই আমায় মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। এ'শার নামাজের পর মাথার নীচে গাঁঠরী দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর হয় না-কেবলি চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল-নানারূপ ভূত-প্রেত আর জ্বীন-পরীর ছবি।

অবশেষে রাত প্রায় তিনটার সময় অজ্ঞাতসারেই চোখের পাতা বুজে এল। সকাল বেলা আজান দিতে এসে এক ব্যক্তি আমায় জাগালেন। উঠে ওজু করে আবার ইমাম হয়ে ফজরের নামাজ পড়লাম। পূর্ব আকাশে সূর্যের সোনালী কিরণচ্ছটা ঝিলিক মেরে উঠলে পর কাঁধে গাঁঠরী হাতে ছাতা নিয়ে মুসাফির আবার পথ ধরলাম।

সারদাহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজের দিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা থেকে যে পথ চলে গিয়েছে, তা পেরিয়ে সামনে কিছুদূর অগ্রসর হলে পর এক জায়গায় রাস্তার ডান দিকে জঙ্গলের মাঝখানে একটা ধ্বংসোন্মুখ পাকা মসজিদ দেখা গেলো। মসজিদের কাছে গিয়ে মন আমার অকস্মাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে বসল। কোন অতীত কালে মসজিদটা কোন নওয়াব বা বাদশাহ তৈরি করেছেন, তা আবিষ্কার করার জন্যে মসজিদের নিকটে গিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষন শুরু করলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কোন শিলা-লিপি বা ও-রকম কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না, কাজেই মসজিদের

www.pathagar.com

ইতিহাস সম্বন্ধে কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করাও হয়ে উঠল না। তবে মসজিদের পাতলা পাতলা ইট দেখে মনে হলো বাঙলায় মুসলিম শাসনের যুগেই সম্ভবতঃ ইহা নির্মিত হয়ে থাকবে।

একদিন সন্ধ্যায় রাজশাহী টাউনের উপকণ্ঠস্থিত পাঠানপাড়ায় গিয়ে পৌছলাম। এক ধনাঢ্য মুসলমান ভদ্রলোকের পাকা বাড়ী দেখে সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। জনৈক আই এ পাঠার্থী কলেজের ছাত্র এ বাড়ীতে জায়গীর থাকেন-বাড়ীর মাষ্টার তিনি। তাঁর সাথেই প্রথমে দেখা হল। তিনি গৃহকর্তার তের-চৌদ্দ বছরের ছেলেকে ডেকে তাকে দিয়ে বাড়ীর ভেতরে খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, রাত্তিরে একজন মুসাফিরের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মাষ্টার সাহেবের সঙ্গেই খাওয়া হলো এবং বৈঠকখানা ঘরে একখানা ক্যাম্পখাট বিছিয়ে তাঁরা আমায় শুতে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিঞ্চিৎ নাশতা করে শহরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মখদুম সাহেবের দরগায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দরগার মসজিদে জোহরের নামাজ পড়ে বসেছিলাম, এমন সময় কাঁপুনী দিয়ে জ্বর এলো। বুঝতে পারলাম-ভাগ্যবণ্ড জীবনের দীর্ঘ দিনের অনিয়মেরই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আমার শরীরে ম্যালেরিয়ার রূপ ধরে। ইমাম সাহেব এসে আমার পাশে বসে স্নেহমিশ্রিত স্বরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কথায় কথায় তাঁর সাথে বেশ পরিচয় হয়ে গেল। মৌলবী আবদুল্লাহ তাঁর নাম, তিনি স্থানীয় মাদ্রাসার হেড মৌলবী। বাড়ী আমাদেরই জেলায় চৌদ্দগ্রাম থানায়। আমার ফুপা মরহুম মজহারুল হক সাহেব চাটগাঁ মাদ্রাসায় এক সময়ে মোদাররেস ছিলেন এবং তখন নাকি মৌলবী আবদুল্লাহ সেই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। এই পরিচয়ে মৌলবী সাহেব আমার প্রতি বেশ সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি আমাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে প্রায় একমাস কাল পুত্রাধিক স্নেহে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন এবং স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিবার জন্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইনি।

গত কয়েক মাসের ছন্নছাড়া পথিক জীবনের ফলেই হোক, বা অপর যে কোন কারণেই হোক এই সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বর আমায় বেশ করে পেয়ে বসল। মৌলবী সাহেব এ সময়ে ডাক্তার ডেকে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং আরো নানাভাবে আমার প্রতি যে স্নেহের পরিচয় দিলেন আজো তা ভুলতে পারি নি। জ্বর থেকে আরোগ্য হওয়ার সাথে-সাথেই কলেজের পূজার ছুটি এল। মৌলবী সাহেব আমায় নয় টাকা গাড়ী-ভাড়া দিয়ে কতিপয় কলেজের ছাত্রের সাথে বিদায় করে দিলেন। বিদায় বেলায় তিনি অশ্রুসজল চোখে আমায় পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়েছিলেন- গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্যে। আজ জীবন যখন অনেকটা সাফল্যের পথে বয়ে চলেছে, এ-সময়ে আমার কেবলি মনে হচ্ছে-রাজশাহীর সেই স্নেহময় মৌলবী আবদুল্লাহর কথা। সম্ভবতঃ আজ আর তিনি বেঁচে নেই।

www.pathagar.com

রাজশাহী থেকে নৌকাযোগে পাকশী পর্যন্ত যাত্রা- সে এক মজার ব্যাপার। প্রায় ত্রিশজন ছাত্র আর আমি এক বিরাট পানসী ভাড়া করে একদিন বেলা বারোটার সময় রাজশাহী ত্যাগ করলাম। রাত প্রায় ন'টার সময় অকস্মাৎ কয়জন ছাত্রের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপলো নৌকা ছেড়ে নদীর কিনারা ধরে হেঁটে চলার। আমিও তাদের দলে যোগ দিলাম। সে নৈশ অভিযানের স্মৃতি আজো আমার হৃদয় থেকে মুছে যায় নি। সে কী কষ্ট। নদীপাড়ের ঝাড়-জঙ্গল ভেঙ্গে আমরা রাত প্রায় তিনটার সময় একটা বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে এক নিদ্রিত হালুয়াইকে জাগিয়ে তার দোকান থেকে কিছু পচা রসগোল্লা আর তেলে ভাজা জিলিপী কিনে আমরা আট-দশ জনে মিলে ক্ষুধার তাড়নায় গো-গ্রাসে উদরস্ত করলাম। তারপর আবার পথ ধরে পরদিন সকাল বেলা প্রায় সাতটার সময় পাকশীতে গিয়ে পৌঁছে দেখলাম- নৌকা তখনো পৌঁছে নি। বেলা প্রায় নটার সময় নৌকা পৌঁছলে আমরা নৌকায় গিয়ে যার যার গাঁঠরী -বোচকা তুলে স্টেশনে নিয়ে এলাম।

গাড়ীর আর অল্প দেরী। ভাবতে লাগলাম কোথাকার টিকিট কিনি। নদীয়া-মেহেরপুরের একটি ছাত্র অনুরোধ করলেন, তাদের ওখানে যাবার জন্যে। কিন্তু সে অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি। অবশেষে পোড়াদহের টিকেট করে গাড়ীতে চেপে বসলাম: ইচ্ছা-আস্তে আস্তে কোলকাতার পথে অগ্রসর হব। গাড়ীতে বসে ভাবতে লাগলাম-মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেব বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্যে আমায় গাড়ী ভাড়া দিলেন, কিন্তু আমি যাচ্ছি কোথায়? এ অনির্দিষ্ট যাত্রার শেষ কোথায় এবং এ সীমাহীন পথে চলার সার্থকতাই বা কি। কিন্তু মাথা-মুণ্ডু ছাই-পাশ কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমার জীবন যেন নাবিকহীন একখানা ভেলার মতোই অকূলে ভেসে চলেছে, এর গতি রোধ করে সাধ্য কার।

www.pathagar.com

চতুর্থ মঞ্জিল

কুলীদের হাঁক্ ডাক্ চীৎকার আর যাত্রীদের ব্যস্ততার মাঝে ট্রেন এসে ধীরে ধীরে পোড়াদহ স্টেশনে থামল। মাত্র একদিনের পরিচিত মেহেরপুরের সেই ছাত্র-বন্ধুটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। প্ল্যাটফর্মের চারদিকে যাত্রীদের উঠা-নামার হল্লা- যেন গেঁয়ো একটা হাট। তারি মাঝে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে Waiting Room এ গিয়ে একখানা বেঞ্চি দখল করে বসলাম। একটা কুলী এসে আমার গাঁঠরীটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করল, "বাবু কাঁহা যায়েগা?" হাসি পেল,- জানে না সে, আমার অবস্থা রেলের কুলীর চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নয়। বল্লাম- "নেই বাবা, যাও"। হতাশ হয়ে হতভাগা অন্য শিকারের সন্ধানে চলে গেলো।

বসে বসে ভাবছিলাম-অতঃপর কি করব, কোথায় যাব। কখন যে গাড়ী স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে, তাও জানতে পারি নি। অকস্মাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে নজর পড়তেই সদ্যঘুম ভাঙা লোকের মতো উঠে দাঁড়ালাম। স্টেশনে বসে বসে ঝিমানোর চেয়ে কোনো হোটেলে গিয়ে দুটো খাবার ব্যবস্থা করা যে অনেক বেশী প্রয়োজন, এতক্ষণে তা বুঝতে পারলাম। তাড়াতাড়ি গাঁঠরীটা হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে চল্লাম।

স্টেশনের অল্প একটু দূরেই একটা হোটেল। সেখানে গিয়ে হোটেল ওয়ালার জিম্মায় গাঁঠরীটা রেখে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলাম। বিনা-নুনে রাঁধা বেগুণের তরকারী, "জলবৎ তরলং" ডাল, আর এক টুকরা ইলিশ মাছ ভাজা-এই হচ্ছে খাদ্যের তালিকা; দাম এ'রি চৌদ্দটা পয়সা। বেজায় ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই এই সব "অতি উপাদেয়" ব্যঞ্জনের সাহায্যেই এক বাসন ভাত উড়িয়ে দিলাম। আমার এ রাক্ষুসে ভোজন দেখে হোটেলওয়ালা থ' হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেলেরই একটা চৌকীর উপর শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। বিকেলের দিকে বাজারে বেরিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে স্থানটার "পোড়াদহ" নাম হওয়ার ঐতিহাসিক তথ্য আবিস্কার করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথাও কোন "দহ" (দিঘী) দেখতে পেলাম না-পোড়া শুক্‌নো বা জলে-ভরা কোন রকমই নয়। সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে রাতটা সেখানেই কাটালাম; রাতে থাকার ভাড়া খাওয়া ছাড়াও আরো ছ' পয়সা।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে স্টেশনে গিয়ে চা খেলাম এবং তারপর গাঁঠরী কাঁধে করে রেল রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে কোল্‌কাতা মুখো হেঁটেই রওয়ানা হলাম। পকেটে তখনো আমার ছয়-সাতটি টাকা মওজুদ; ভাবলাম এ-টাকা দিয়ে খোরাকী চালাব-আর

www.pathagar.com

রেল -কোম্পানীকে পয়সা না দিয়ে খোদার দেওয়া পদ-যানেরই সদব্যবহার করব। কয়দিন পথ চলার পর পথ-শ্রমেই হউক, আর অনিয়মেই হউক-একদিন সন্ধ্যার সময় আবার কাঁপুনী দিয়ে জ্বর এল। জায়গাটার নাম বোধ হয় মুন্‌শীগঞ্জ। স্টেশন থেকে বাজারে গিয়ে অনেক তালাশ করে ও কোন হোটেল বা খাওয়ার জায়গা না পেয়ে এক মুদীর দোকান থেকে একটা হাঁড়ি, কিছু চাল আর কয়টা আলু কিনে মুদীর বারান্দায়ই আলু ভাতে সিদ্ধ করে খাবার আয়োজন করছি, অমনি এল জ্বর। খাওয়া আর হয়ে উঠল না। কাপড় মুড়ি দিয়ে সেই বারান্দায়ই শুয়ে কাঁপতে লাগলাম। রাতটা কাটল বড় কষ্টের ভেতর দিয়ে। শেষ রাত্রে জ্বর ছাড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার পথ ধরলাম। রোজ বিকেলে জ্বর আসে; কাজেই বেশী পথ-চলা আর হয়ে উঠে না কোনো দিনই। একদিন দুপুর বেলা রেলপথ ছেড়ে খাবার সন্ধানে পার্শ্ববর্তী এক গাঁয়ে এক অবস্থাপন্ন গেরস্তর বাড়ির দরজায় গিয়ে হাঁক দিলাম। কোনো পুরুষ মানুষ তখন বোধ হয় বাড়িতে ছিল না;- এক আশি বছরে বুড়ী এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল- কি দরকার আমার। বল্লাম- "ভুখা মুসাফির আমি, দুটো খাবার চাই।" বুড়ী আমায় আদর করে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে গিয়ে একটা থালায় করে কিছু ভাত নিয়ে এল। খেতে বসলাম-বুড়ী পার্শ্বে বসে আমায় এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে পর বুড়ী আবদার ধরল- তার কোন নাতনীর নাকি বেজায় জ্বর-এলোপাথারী, হুমোপাথী, কবররাজী কোন রকম ওষুধেই নাকি কোন ফল হয় নি;- সুতরাং আমায় তার জন্যে একটা তাবিজ লিখে দিতেই হবে। যতই আমি বুড়ীকে বুঝাবার চেষ্টা করি, তাবিজ লেখা আমার কর্ম্ম নয়, বুড়ীর ভক্তি যেন আমার প্রতি ততই বেড়ে যায়। শেষে তাঁর নাছোরবান্দা ভাব দেখে অগত্যা কাগজ-কালী নিয়ে আসার আদেশ করলাম। অল্পক্ষনের মধ্যেই বুড়ীর আদেশ মত একটা ছয়-সাত বছরের ছেলে কাগজ আর কালী নিয়ে এসে হাজির হলো।

কলম হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলাম-কি লিখি। দেখেছিলাম, তাবিজ লিখুয়েরা কাগজের উপর দাবা-খেলার ছক-বানাবার মতো কতকগুলি আড়াআড়ি রেখা টেনে তার মধ্যে প্রত্যেক ঘরে হিজিবিজি কি সব লিখে থাকে। তারি নকল করে কাগজের উপর প্রথমে কতকগুলি রেখা টেনে পাঁচটা ঘর বানালাম। এবার আমার আরবী বিদ্যার পরীক্ষা। ছেলেবেলায় বাড়ীর মুন্‌শী সা'বের কাছে আমপারা পড়বার সময় কলাপাতায় আলেফ-বে-তে-সে লিখা শিখেছিলাম। তারপর মাইনর পাশ করে হাই স্কুলে যে ছ'মাস পড়েছি, এর মধ্যেও Second Language রূপে ফার্সী পড়তে গিয়ে শুধু কায়দা করে "বিস্‌মিলাহ্‌" লিখাটাই শিখেছিলাম। আরবীর অক্ষর-জ্ঞানের সীমা আমার এতটুকু পর্যন্তই। সুতরাং তৈরি পাঁচটা ঘরের মধ্যে কি লিখি, কিছুতেই তার ঠিক করতে পারছিলাম না। অবশেষে ভাব্‌লাম,

www.pathagar.com

"বিস্‌মিলাহ্"টা খোদার কালাম; আর এটা যখন আমি খুব কায়দা করে তোগারা ধরণে লিখতে পারি, তখন পাঁচটা ঘরে পাঁচবার "বিসমিল্লাহ" লিখে দেই না কেন খোদার কালামের বরকতে, আর বুড়ীর বিশ্বাসের প্রাবল্যে এতে হয়ত বেশ সুফল ফলতেও পারে। কার্যতঃ করলামও তাই। পাঁচটা ঘরে পাঁচবার "বিসমিল্লাহ্" লিখে তাবিজটা বুড়ির হাতে দিয়ে বল্লাম- তামা বা পিতলের কবজের মাঝে পুরে রোগিনীর ডান হাতে যেন তা' বেধে দেওয়া হয় এবং রোজ রাত্তিরে শোবার সময় তাবিজটা খুলে রোগিনীর শিয়রে একটা গ্লাসের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে রেখে, পরদিন সকাল বেলা সে পানিটা যেন রোগিনীকে পান করানো হয়। বুড়ি স্বর্গীয় অবদানের মতই অতি আগ্রহে আমার হাত থেকে তাবিজখানা গ্রহণ করে একবার মাথায় ঠেকাল।

বুড়ীর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আবার পথ ধরলাম। তাবিজটা ধারণ করে বা তাবিজ-ভিজানো পানি খেয়ে বুড়ীর নাতনীর জ্বর সেরেছিল কিনা, সে খবর আর পাই নি; কিন্তু এরপর থেকেই আমার নিজের জ্বরটা যেন গেলো বেড়ে। রোজ দুবেলা জ্বর-ভুগে ভুগে শরীর একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একদিন বিকেল বেলা কাঁপতে কাঁপতে এসে পৌছলাম কাঁচড়াপাড়ায়। তখন বোধ হয় কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি শীতটা বেশ জমে এসেছে। রাতে শুবার জন্য গেলাম রেলওয়ে ওয়ার্কশপের সামান্য কিছু দূরে রেল রাস্তার পূর্ব পাশে একটা করোগেটের মসজিদে। বাবা, কী ভীষণ শীত! আজো সে রাতের কষ্টের স্মৃতি ভুলতে পারি নি'। পশমী রেপারটার সাথে আর সব কটা কাপড় একত্র জড়িয়ে গায়ে দিয়েও আধ ঘন্টার বেশি থাকতে পারিনি। অবশেষে উঠে মসজিদের সব কটা চাটাই এনে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলাম। এবার একটু গরম মতন মনে হতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর বেশ আরামে ঘুমিয়েও পড়লাম।

পকেটের সম্বল তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। পরদিন বেলা দশটার সময় খাবার সন্ধানে বেরুলাম। নিকটে মুসলমানের বসবাস প্রায় নেই বল্লেই চলে। স্টেশন থেকে মাইল খানেক পশ্চিম দিকে একটা গাঁয়ে গিয়ে এক মুসলমানের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাক দিলাম। একটা পনের-ষোল বছরের তরুণী দরজায় এসে আমায় দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল। বল্ল, "খোকা, তুমি কি চাও, তোমার বাড়ী কোথায় গা।" তার এ নিঃসঙ্কোচ সচ্ছন্দভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আরো বিস্মিত হলাম তার কপালজোড়া সিঁথির সিঁদুর দেখে। মুসলমান মেয়েরাও সিঁথিতে সিঁদুর লেপে, এই প্রথম দেখলাম। বুঝলাম এ, হিন্দুয়ানী প্রভাবেরই ফল। মেয়েটির নিঃসঙ্কোচ সচ্ছন্দ ভাবও যে হিন্দু পারিপার্শ্বিকতারই প্রভাব, তারও বুঝতে বাকী রইল না। যাক, দুপুর বেলার খাবার সে বাড়ীতে পেয়েছিলাম। হিন্দু-ফ্যাশানে ওরা কাঁসার থালায়ই ভাত খায়। নামাজ খুব কম লোকেই পড়ে; এমন কি, প্রসাব করে পানি ব্যবহারের অভ্যাসও এ-সব তথাকথিত মুসলমানদের অধিকাংশেরই নেই।

www.pathagar.com

কাঁচড়াপাড়ায় তিন দিন থাকার পর, একদিন প্রাতে রেলওয়ে-ওয়ার্কশপের বড় সাহেবের বাংলোয় গিয়ে লম্বা এক সেলাম ঠুকে তার সামনে দাঁড়ালাম। সাহেব আমায় প্রশ্ন করলেন -কি দরকার। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম, হতভাগ্য ভ্যাগাবন্ড আমি, তাঁর অধীনে কোন একটা কাজ পেলে ছন্নছাড়া জীবনটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। কিছুক্ষন পর্যন্ত আমার মুখ-চোখের দিকে খুব অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতঃপর সাহেব হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা যাও, বেলা এগারোটার পর কারখানায় তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।"

কথামত ঠিক এগারোটার সময় সাহেবের সাথে দেখা করার জন্যে কারখানায় গেলাম। Paid Apprentice রূপে আমায় কাজে ভর্ত্তি করা হলো। পরদিন থেকে নিয়মিতভাবে রোজ প্রাতে ৮টায় কারখানায় হাজিরা দিতে লাগলাম। কিন্তু বেশি দিন আমার সেখানে কাজ করা পোষালনা। মাত্র চার-পাঁচ দিন কাজ করার পর কারখানার কামারশালার প্রায় দশ সের ওজনের হাতুরী পেটার পরিশ্রমেই হউক বা অপর যে-কোন কারণেই হউক জ্বরের মাত্রাটা গেলো বেড়ে। একদিন বিকাল বেলা জ্বর শরীরে কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করলাম। সাহেব পরামর্শ দিলেন হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ খাবার।

তিন চারদিন ওষুধ ব্যবহার করার পর জ্বর ছাড়ল। আবার কাজে গেলাম। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ কাজ করার পরই আবার এল জ্বর। সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যথিত স্বরে বল্লেন,- "খোকা তোমার, স্বাস্থ্য বড় খারাপ আছে; এ কাজ তুমি পারবে না। আমি বড় দুঃখিত।" সাহেব তাঁর পকেট থেকে বের করে আমার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুজে দিয়ে কেরানীকে আমায় হিসাব করে দশ দিনের বেতন দিয়ে দেবার জন্যে আদেশ করলেন। স্বাস্থ্যে না কুলালে কাজ করা পোষায় কেমন করে! কাজেই বেতনের টাকা বুঝে নিয়ে সাহেবের কাছ থেকে বাধ্য হয়েই বিদায় নিতে হলো। সাত হাজার মাইল দূরের অধিবাসী বিদেশী ও শ্বেতাঙ্গ সাহেবের কাছ থেকে ছন্নছাড়া জীবনে একদিন এই যে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম, আজও সময় সময় থেকে থেকে তা মনের ভেতর দোল দিয়ে উঠে। সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে গিয়ে পশ্চিমদিকের বারান্দায় শুয়ে রাতটা কাটালাম। রাত্তিরে যখন জ্বরের ঘোরে শুয়ে শুয়ে কাঁপছিলাম, জনৈক সদয়-হৃদয় যাত্রী তখন কাছে এসে আমার শরীরে হাত বুলাতে বুলাতে পরামর্শ দিলেন- হুগলীর ইমাম-বারা হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নিতে। হুগলীতে যেতে হলে নৈহাটি থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হলেই যে যাওয়া যায়, তিনি তাও আমায় বলতে ভুললেন না।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নৈহাটী যাওয়ার জন্য রেল-রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম। কিন্তু হালিশহর স্টেশন ছেড়ে সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হতেই এল ভীষণ

www.pathagar.com

জ্বর। কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয়ের আশায় চারদিকে চাইতে লাগলাম। কিন্তু নিকটে কোথাও কোনো বাড়ী-ঘর দেখা গেলনা। অবশেষে মাঠের মাঝে বিদেশী কৃষাণদের পরিত্যক্ত একটী ছোট্ট কুড়ে দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। বিচালীর স্তুপের উপর কাপড় বিছিয়ে শুয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাটলো। পাঁচটার পর জ্বর ছাড়লে বড় পিপাসা পেল। উঠ মাঠের পূর্ব পাশে অবস্থিত একটা বাড়ি লক্ষ্য করে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হতে লাগলাম।

বাড়ীটা এক অবস্থাপন্ন ডোমের বাড়ী। বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ভাবতে লাগলাম- কি করি। কিন্তু তখন পিপাসা এমন ভীষনভাবে পেয়েছিল যে, ডোম-বাড়ীর পানি খেতে আমার আপত্তি করার কোন অবসরই ছিলনা। কাজেই কোনরূপ দ্বিধা না করে অগ্রসর হয়ে বাড়ীর কর্তাকে ডেকে তার কাছে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করলাম। মুসলমানের ছেলে তার বাড়ীতে পানি খেতে চাচ্ছে দেখে গৃহকর্তা প্রথমতঃ বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর, তিনি (জাতিতে ডোম হোলেও, তার ভেতরে যে মহান একটা হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তার কথা মনে করতে গেলে স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় হৃদয় অবনত হয়ে পড়ে; কাজেই তাঁর কথা লিখতে গিয়ে সম্মানবাচক শব্দ ব্যবহার না করে আমি পারছিনা) আমায় অতি সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের বারান্দায় একখানা ছোট্ট জল চৌকিতে বসতে দিলেন। অতঃপর গৃহকর্ত্রীকে ডেকে এনে গ্লাস পরিষ্কার করে ধুয়ে আমায় পানি দিতে আদেশ করলেন। গৃহকর্ত্রীও স্বামীর মতোই মহান একটা হৃদয়ের অধিকারিনী। তাঁরা জাতিতে ডোম বলে হয়ত বা আমার মনে ঘেন্না জন্মাতে পারে, এ-ই মনে কোরেই সম্ভবতঃ তিনি কাঁসার গ্লাস এবং একটা থালা আমার সামনে এনে ছাই দিয়ে পাঁচ-ছয় বার ঘষে খুব ভালো করে ধুলেন। অতঃপর ঘর থেকে পানি এনে গ্লাসে করে আমায় দেওয়া হলো।

গ্লাস হাতে নিয়ে মুখে তুলতে যাব, অমনি গৃহকর্তা বাধা দিয়ে বললেন, "খালি পেটে পানি খাওয়া কি ভালো হবে, তার চেয়ে বরং সামান্য দুটো খৈ আর কিছু দুধ খেলে হয় না?" তিনি উত্তরের আশায় করুণ নয়নে আমার মুখের পানে চাইলেন। কোনরূপ দ্বিধা না করেই উত্তর দিলাম- "আচ্ছা, নিয়ে এস।" ডোম বাড়ীর সে দুধ-খৈ এর স্মৃতি আজো ভুলতে পারিনি। মানুষের চামড়ায় যে আভিজাত্যের কোন ছাপমারা নেই, প্রকৃত আভিজাত্য যে অন্তরে, সেদিন তাহা বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

খাওয়ার পর একটা পান মুখে দিয়ে সেই মহীয়ান ডোম দম্পত্তির নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবার এলাম মাঠের সে কুড়েখানার মাঝে। রাতটা কাটালাম সেখানেই শুয়ে। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কোন রকমে রোগ-জর্জরিত দেহখানাকে টেনে হিচড়ে নৈহাটী ষ্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। তারপর নদীর ঘাটে গিয়ে দু'পয়সা নৌকাভাড়া দিয়ে নদী পেরিয়ে

www.pathagar.com

হুগলীতে পৌঁছলাম এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে করে চুচূড়া এমাম-বারা হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলাম।

এমাম-বারা হাসপাতালে মোট দশ দিন ছিলাম। এর মধ্যে আটদিন পর্যন্ত বেশ জ্বরই ছিল, নবম দিন জ্বর ছাড়লে পর অন্ন-পথ্যির জন্যে দু'দিন সময় দিয়ে একাদশ দিন সকাল বেলা ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার এসে জানালেন "ওহে খোকা, এখনত তুমি বেশ ভালো হয়ে উঠেছ, আর তোমার এখানে থাকা চলেনা। জানই ত এ রোগীর জায়গা-ভালো লোকের স্থান এ নয়।" বুঝলাম, আর একদিনও আমার হাসপাতালে থাকা চলবেনা। সুতরাং তল্পী-তল্পা বেঁধে আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হলো।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলাম কত অসহায় আমি। যে কয়দিন রোগী হয়ে হাসপাতালের ছারপোকাভরা খাটীয়ায় শয়ান ছিলাম, সে কয়দিন রোগের শত যন্ত্রনার মাঝেও একটা বিষয়ে একান্তই নিশ্চিত ছিলাম-পেটের ভাবনা এ কদিন আদৌ ভাবতে হয়নি। কিন্তু যেই হাসপাতাল ছেড়ে পথে এসে পা বাড়ালাম, অমনি পেটের ধান্ধায় অস্থির হয়ে পড়তে হলো। ঘুরতে ঘুরতে বেলা প্রায় বারোটার সময় এক সদয় হৃদয় ভদ্রলোকের বাড়িতে দু'টো খাবার পেয়েছিলাম বটে; কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই এত বিস্বাদ লাগতে লাগল যে, আর খাওয়া হয়ে উঠলনা; জ্বরো মুখে সবই যেন নেহায়েত তেতো মনে হচ্ছিল। কি আর করি, ভদ্রলোকের অনুগ্রহের দান ভাতগুলির কোনরূপ সদব্যবহার না করেই উঠে পড়তে হলো।

বেলা প্রায় দু'টোর সময় মহাত্মা হাজী মহসীনের পূণ্য-স্মৃতি বিজড়িত এমাম-বারায় গিয়ে পৌঁছলাম। তখন মোহররমের মউসুম; এমাম-বারা উৎসব বেশে সজ্জিত। প্রকাণ্ড প্রাসাদটির ভেতর-বাহির সর্বত্র ঝাড়-ফানুস ও নানাবিধ কারুকার্য্যের যে শোভা সেদিন দেখেছিলাম, আজো তা ভুলতে পারিনি। ভেতরে প্রবেশ করে এক জায়গায় স্বর্ণ-বিমণ্ডিত মুখমলের আস্তরণে আস্তৃত দুটি কবর ও একটি মিম্বরের দৃশ্য দেখতে পেয়ে জনৈক খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলাম- এগুলির ইতিহাস কি? খাদেম-পুঙ্গব মাথা একটু হেলিয়ে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন কবর দু'টি হচ্ছে ইমাম হাসেন হোসেনের কবর, আর মিম্বরটি রসুলুল্লার মিম্বর-রসুলুল্লাহ এর উপর দাঁড়িয়ে খোৎবা পড়তেন। শুনে আশ্চর্য হলাম। কেমন করে এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে, তা কিছুতেই ঠিক করতে না পেরে ভয়ে-ভয়ে খাদেম সাহেবকে আবার প্রশ্ন করলাম- "ইমাম হাসান সাহেবত মারা যান মদিনায়, ইমাম হোসেন শহীদ হন কারবালায়, তাঁদের কবর হুগলীতে এল কেমন করে; আর রসুলুল্লার মিম্বরই বা কেমন করে এ সুদূর বাঙলা মূলুকে এসে উপস্থিত হলো?" খাদেম সাহেব চোখ রাঙিয়ে উত্তর দিলেন, "তোম লাড়কা আদমী, ক্যায়া সমঝেগা।" বুঝলাম এ মূর্খের সাথে যুক্তিতর্কের কথা বলে কোন লাভই নেই।

www.pathagar.com

দেখলাম, হাজার-হাজার লোক কৃত্রিম কবর দুটি ও মিম্বরের সামনে এসে সেজদায় ঝুঁকে পড়ছে, আর উঠে যাওয়ার সময় যার যেমন সাধ্যি টাকা, পয়সা, নোট নজর দিয়ে যাচ্ছে। পৌত্তলিকতা-বিধ্বংসী ইসলামেও কেমন করে দিন-দিন পুতুল পূজার পাপ এসে ঢুকছে, তা দেখে বাস্তবিকই মনে বড় ব্যথা লাগল। পরদিন বিকাল বেলা তাজিয়া বিসর্জ্জনের মিছিলের সাথে বেরিয়ে "দুলদুল" রূপী "ঘোটক -পূজা" এবং শেষে তথাকথিত কারবালার ময়দানে (শহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যস্থিত একটা মাঠ) "ইমাম দফন" করার অভিনয় অবলোকন করে, ইসলাম-হারা আধুনিক মুসলিম-সমাজের চরম অধঃপতন দৃষ্টে মন একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। ক্ষুন্ন মনে সন্ধ্যার সময় হুগলী ত্যাগ করলাম।

রাত আটটায় নৈহাটী স্টেশনে উপস্থিত হয়ে রাতটা সেখানেই Waiting Room-এ শুয়ে কাটালাম। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গৌরীপুর চট-কলের দরজায় গিয়ে কাজের চেষ্টায় বড় সাহেবের সাথে দেখা করার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করলাম; কিন্তু ছিন্ন-মলিন বসন এক ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সাহেবের সাথে দেখা করা কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে। সারা দিন ব্যর্থ চেষ্টার পর সন্ধ্যায় আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। দিন পাঁচেক এরূপ ভাবে চেষ্টা করার পর কলের এক সর্দারকে ধরে Bobin Department-এ ঢুকবার সুযোগ হলো। সর্দার বল্ল, কাজ শিখতে পারলে রোজ বারো আনা করে মজুরী পাওয়া যাবে।

বিরাটকায় মেশিন ঘড়-ঘড় শব্দে কেবল আবর্তনের উপর আবর্তন করে যাচ্ছে। এক দল নারী মজুর তারি পাশে দাঁড়িয়ে যন্ত্র-দানবের দন্তে-দন্তে সুতোর ফাঁস পরিয়ে যাচ্ছে, আর তারি ফলে মেশিনের গায় এক সাথে শত শত Bobin গড়ে উঠছে। সর্দার আমায় সঙ্গে করে কার্যরত এক যুবতীর কাছে গিয়ে আমাকে কাজ শিখাবার জন্যে অনুরোধ করল। যুবতী আমার মুখের পানে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বল্ল, "আচ্ছা যাও।" সর্দার চলে গেলো।

এক পাল নারীর মাঝে আমি পড়লাম সম্পূর্ণ একা। এ নারী রাজ্যে একা পুরুষ আমি, কি করব ভেবে বিব্রত হয়ে পড়লাম। চমক ভাঙলো তখন, যখন তরুণী এসে হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে আকর্ষণ করল। আমার কাঁধে তার ডান হাতটা রেখে হাসতে হাসতে সে বল্ল- "অমন করে চেয়ে আছ কেন, তোমার লজ্জা করছে? লজ্জা কিসের-পুরুষ মানুষ তুমি। এস, কাজ শিখবে। পেছন থেকে এক পাল রমণী হি হি করে হেসে উঠল। তাদের মধ্যে এক মুখরা খোলাখুলিভাবেই বলে ফেল্ল - "বেচারী কুলসুমের (তরুণীর নাম বোধ হয় এ-ই ছিল) এতদিনে একটা হিল্লে হলো। কি লো কুলসুম পছন্দ হচ্ছে তোর?" তাদের এ নির্লজ্জ ইয়ার্কী দেখে লজ্জায় আমার চোখ-কান সব লাল হয়ে উঠল। কুলসুম কোন রূপ দ্বিধা না করে হাসতে হাসতেই উত্তর দিল-"পছন্দ হলেই বা কি, এ যে আমার ভাইয়ের মতো।" আবার হাসির হররা।

www.pathagar.com

নারী-বাহিনীর এরূপ হাসি-ঠাট্টা বিদ্রুপের মাঝে পড়ে আমি যখন নিজেকে একান্তই অসহায় মনে করছিলাম, এমন সময় কলের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই নিকটে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- আমি কে? কেউ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কুলসুম এগিয়ে গিয়ে বল্ল-"সাহেব, এ আমার ভাই।" আমার হাত ধরে সাহেব বল্লেন,- "আভি তোম বাহার যাও; কামকা ওকৎ কভি আন্দর মাৎ আনা।" সাহেব ইঙ্গিতে আমায় বাইরের গেট দেখিয়ে দিলেন। সাহেবকে চাকুরীর কথা বলি-বলি কোরে বলা হলোনা। অগত্যা কি আর করি, বাইরের দিকেই পা বাড়ালাম। মাঝ-পথে পেছন ফিরে দেখতে পেলাম অসহায়া এক বঞ্চিতা নারীর মতোই কুলসুম করুণ নয়নে আমার পথের পানে চেয়ে আছে। তার মুখের হাসির সে চিরন্তন রেখাটি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে-সুন্দর মুখখানা বিষাদভরে মলিন। জীবনের রঙ্গিন কৈশোর প্রভাতে নারীর ভালবাসা বুঝি এই প্রথম পেয়েছিলাম। আজো মনে পড়ে সময়-সময় সে মধুর ক্ষণটির কথা।

কল থেকে বেরিয়ে কুলসুমের কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার সময় স্টেশনে ফিরে এলাম। শরীরটা বেজায় খারাপ লাগছিল। রাত প্রায় ৮টার সময় আবার এল জ্বর। কাঁপতে কাঁপতে কাপড় বিছিয়ে প্লাটফর্মেই শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর এক খোট্টা কনেষ্টবল এসে আমার পাশে লাঠি ঠুকে বল্ল-"কৌন্ হ্যায়, ওঠো, হিয়া শুনেকা হুকুম নেহি।" জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে রাগতঃ ভাবেই উত্তর দিলাম, -"নেই জায়েগা, যাও।" ছন্নছাড়া এক গৃহহীন হতভাগার মুখে এ রাগের কথা শুনে কনেষ্টবল পুঙ্গবের মেজাজ গেল বেজায় খাট্টা হয়ে। সে রেল-পুলিশের থানায় গিয়ে জানাল স্টেশনে এক ছোকড়া বিপ্লবী এসেছে, তার পকেটে পিস্তলের চকচকে নালটাও নাকি দেখা গিয়াছে; সম্ভবতঃ সাথে দু'একটা বোমাও থাকতে পারে। বোমাবাজ বিপ্লবীর সংবাদে রেল-পুলিশের থানায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। প্রায় পঁচিশ জন কনেষ্টবল চারপাশ থেকে স্টেশনটা ঘেরাও করে আমায় নজরবন্দী করল। এদের এ আহমকী দেখে জ্বরের মাঝেও আমার হাসি পেতে লাগল।

রাত প্রায় একটার সময় ব্যারাকপুর থেকে পুলিশের বড় সাহেব মোটরে করে স্টেশনে এসে পৌছলে পর রেলপুলিশের কর্তাদের যেন ধড়ে প্রাণ এল। ততক্ষণে আমার জ্বর ছেড়ে এসেছিল। উঠে আমি চা'খানায় গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে সেখানে বসে বসে সিগারেট ফুকছিলাম। পুলিশ সাহেব বন্দুকধারী দু'জন সেপাই সঙ্গে করে আমার কাছে এসে খপ করে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বল্লেন - "You are arrested "। তারপর শুরু হলো তল্লাসী। আমার কাপড়-চোপড়, পকেট, গাঁঠরী-বোচকা সব কিছু তল্লাস করেও যখন কতকগুলি বই-পুস্তক আর ছেড়া কাপড় ছাড়া কোন পিস্তল বা বোমার সন্ধানই পাওয়া গেলনা, সাহেব তখন বেজায় লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে রেল

www.pathagar.com

পুলিশের ইন্সপেক্টরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, It is breaking a butterfly on the wheel - (মশা মারতে কামান দাগা)। তারপর আমার নাম-ধাম লিখে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। যাবার বেলায় তাঁকে ডেকে আমি বল্লাম, -"সাহেব, তোমার লোককে বলে যাও, রাত্তিরে আমি এখানে শো'ব; তারা যেন আমায় বিরক্ত না করে।" সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন,- "কুচ পরোয়া নেহি।"

রেল পুলিশের কর্মচারীদের প্রতি খুব করে বিদ্রুপ-বাণ বর্ষণ করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিলাম এবং তারপর দিব্যি আরামে শুয়ে স্টেশন ঘরের মাঝে নবাবী হালে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

পঞ্চম মঞ্জিল

আবার পথ। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার পথ ধরলাম। নৈহাটী স্টেশনের Over-Bridge পেরিয়ে সামান্য একটু দক্ষিণে গিয়ে প্রায় রেলওয়ে ইয়ার্ডের পাশেই বঙ্কিমচন্দ্রের "কাঁটালপাড়ার" আবাস-বাটী নজরে পড়ল। বাঙলায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সর্বপ্রধান হোতা, মুসলিম-বিদ্বেষী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই কিরূপ একজন গোঁড়া বামুন ছিলেন, তা তার বাড়ীখানা দেখেই অনুমান করা যায়। বাড়ীতে এখনও দুটি মন্দির বিদ্যমান। তথায় এক্ষণে লোক-জন বিশেষ কেউ থাকে বলে মনে হলোনা। বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে পড়ল, ছেলে-বেলায় একদিন লাইব্রেরী থেকে "বঙ্কিম গ্রন্থাবলী" পড়তে এনে "রাজসিংহ" পড়তে গিয়ে রাগের বশে কেমন করে বইখানা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম এবং অবশেষে পকেট থেকে দু'টাকা জরিমানা দিয়ে কিরূপে লাইব্রেরীয়ানকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল। পথ চলতে চলতে ভাবছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে প্রচাকার্য্য চালিয়ে ভাঙলার তরুণ হিন্দুর মনে মুসলিম-বিদ্বেষের একটা ভাব জাগিয়ে দিয়ে না যেতেন, তবে দেশের সাম্প্রদায়িক আব-হাওয়া হয়ত অন্যরূপেই দেখা যেত।

কাকিনাড়া, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থান হয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় ইছাপুরে এসে পৌছলাম। এখানে সরকারের একটা মস্তবড় বন্ধুকের কারখানা (Rifle Factory) রয়েছে। কারখানায় প্রবেশাধিকার public-এর কারো নেই; বিশেষ করে আমি ত ছন্নছাড়া একটা ভিখারী ভিন্ন আর কিছুই নই। সুতরাং বিশেষভাবে চেষ্টা করেও কারখানার ভেতরে গিয়ে মানুষ মারা কল বন্ধুক তৈরীর রহস্য আবিষ্কার করতে পারলাম না। কারখানার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটা মসজিদে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ব্যারাকপুরের পথ ধরলাম।

ব্যারাকপুর টাউন ষ্টেশনের বেশ একটু দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন থেকে শহর পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটি বেশ সুন্দর; দু'পাশে বড় বড় গাছ, মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকরের বাঁধানো রাস্তা একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করেই যেন বয়ে চলেছে। এই রাস্তারই ডান দিকে অদুরে মিলিটারী ব্যারাক। এখন যেখানে Race-course তৈরি হয়েছে, সে জায়গাটা ছিল একটা মাঠ।

বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় শহরে পৌছে বড় একটা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মসজিদের ইমাম সাহেবের মতো এমন অমায়িক ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখা যায়। অশীতিপর এ বৃদ্ধ আমায় দেখতে পেয়েই বোধ হয় অনুমান করেছিলেন যে, আমি ছন্নছাড়া গৃহহীন মুসাফির ছাড়া আর কিছুই নই। তাই, এশার নামাজের পর তিনি যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সামনে এক বাসন ভাত এনে হাজির করলেন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারিনি। মসজিদে সেদিন আরো একজন মুসাফির ছিল। সে এক কাবলীওয়ালা-লম্বা

www.pathagar.com

আলখেল্লা গায়ে, মাথায় মস্তবড় পগগড়। কথায় কথায় সে আমায় অনুরোধ করল তার সাথে বাঙলার মফঃস্বল জেলাগুলিতে সফর করতে। সে বল্ল, তার বাড়ী নাকি কান্দাহারে; কিন্তু নিজেকে আজমীর-শরীফের বাসিন্দা এবং খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর বংশধর বলে পরিচিত করে থাকে। প্রতি বৎসর মওলানা সেজে সে বাঙলায় এসে পাড়াগাঁয়ের সরল-প্রাণ মুসলমানদিগকে পাগড়ী আর আলখেল্লা দেখিয়ে কেমন করে ছ'মাসে প্রায় দু'আড়াই হাজার টাকা রোজগার করে দেশে ফেরে, কথায়-কথায় এ গোপন রহস্যও সে আমায় বলে ফেল্ল। শেষে সে মন্তব্য করল, "তোমহারা মুল্লুককা আদমী বহুৎ বুরবক হ্যায়" (তোমার দেশের লোক আস্ত গাধা)। নিরক্ষর এক কাবলীওয়ালা ঠগের হাতে বাঙলার গেয়ো মুসলমানেরা প্রতি বর্ষে কিরূপে প্রতারিত হচ্ছে, তা জানতে পেরে মনে বেজায় ব্যথা লাগল; অতি ঘেন্নার সাথে আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

পরদিন সকাল বেলা মসজিদের মোতয়াল্লী সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। সুন্দর পাকা বাড়ী। বাড়ীতে একজন বোজর্গ দরবেশের এক দরগাহ বিদ্যমান। নানাস্থান থেকে বহু লোক প্রত্যহ এ দরগাহ জেয়ারৎ করতে এসে থাকে। মোতয়াল্লী সাহেব যৌবনের সীমা পেরিয়ে কেবল প্রৌঢ়ত্বের দরজায় গিয়ে পৌঁছেছেন। আমাদিগকে (আমি এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সেই কাবলীওয়ালা ঠগ) তিনি অতি সমাদরে বসতে দিলেন এবং দু'চার কথা আলাপ করে জাকাতের তহবিল থেকে আমাদের প্রত্যেককে দু'টাকা করে দিয়ে বিদায় দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে কাবলীওয়ালা আবার আমায় লোভ দেখিয়ে বল্ল- "তোম চলো মেরা সাথ; তোমকো মাহিনামে পাঁচশ-তিশ রুপেয়া করকে মিলেগা।" -আমি পুনরায় অতি ঘৃণার সাথে এ প্রতারকের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলাম এবং তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্টেশনের পথ ধরলাম।

স্টেশনের সামান্য একটু পশ্চিমে পথিপার্শ্বে অবস্থিত একটা মসজিদে উপস্থিত হয়ে সেখানে গোসল করলাম এবং কাপড়-চোপড় ধুয়ে সারাটা দিনই সেখানে কাটালাম। বিকেল প্রায় চারটার সময় ব্যারাকপুর ত্যাগ করে টিটাগড়ের দিকে যাত্রা করলাম।

মগরেবের নামাজের সামান্য কিছুক্ষণ পূর্বে টিটাগড়ে পৌছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক-রোডের পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মসজিদের ইমাম সাহেব কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকৃতি এক পশ্চিমা ভদ্রলোক। একপাল ছেলে-মেয়ের মাঝে বসে তিনি তখন যষ্ঠি আন্দোলন করে সাবেকী চালের পণ্ডিতী প্রাধান্য জাহির করছিলেন। আমায় মসজিদে ঢুকতে দেখে ভীতি সন্ত্রস্ত পড়ুয়াদের মধ্যে একটু যেন ভরসা জন্মাল, ক্ষণকালের জন্যে তারা স্ব-স্ব "সবক" থেকে মাথা তুলে আমায় দেখে নিল।

একটা দুষ্টু ছেলে এই অবসরে তার পাশের ছেলেটির পিঠে আচ্ছা করে একটা চিমটি বসিয়ে দিল। চিমটি খেয়ে ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ স্বরে ওস্তাদজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল।

www.pathagar.com

ওস্তাদজী গর্জে উঠে চাবুক আস্ফালন করতে করতে যে ছেলেটি নালিশ করতে গিয়েছিল, প্রথমে তার পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে একে একে সবগুলি ছেলেকেই খুব করে ঠ্যাঙ্গালেন এবং শেষ ছেলেটির পিঠে পুরা বিরাশী সিক্কা ওজনের শেষ ঘা'টা বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "যাও ছুটি"। আঘাতের সব জ্বালা ভুলে ছেলেরা কলরব করতে করতে যার যার "তখ্‌তি" আর কেতাব গুছিয়ে নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো।

এবার ইমাম সাহেব আমার দিকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেলেন। মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুয়ো থেকে দড়ি-বাঁধা বালতি দিয়ে পানি উঠাতে উঠাতে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি একজন মুসাফির এ কথা জানতে পেরে মুখখানা কেমন যেন বিকৃত করে তিনি জানালেন, মুসাফিরের জন্য মসজিদে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই; তবে থাকার কোন অসুবিধাই হবে না। মসজিদের মোতয়াল্লী স্থানীয় মিলের একজন সর্দার এবং বেশ বড়লোক; তিনি বেশ দাতাও বটে; তার কাছে গেলে দুপয়সা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে-এ সব কথাও ইমাম সাহেব কথা-প্রসঙ্গে আমায় জানাতে ভুললেন না। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম, খাওয়া এবং সাহায্যের আমার আপাততঃ দরকার করেনা; পকেটে যা কিছু সামান্য সম্বল আছে, তাতেই আমার বেশ চলবে। শুনে ইমাম সাহেব যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, যতদিন ইচ্ছা আমি তার মসজিদে থাকতে পারি, তাঁর কোন আপত্তিই নেই।

এশার নামাজের পর ইমাম সাহেব তাঁর বাসায় চলে গেলেন এবং মসজিদের বারান্দায় শুয়ে আমি দিব্যি আরামে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ইমাম সাহেবের জিম্মায় গাঁঠরীটা রেখে নিকটস্থ একটা চা'খানায় গিয়ে নাশতা করলাম এবং ট্রাঙ্ক-রোড ধরে উত্তর দিকে সামান্য একটু দূর গিয়েই রাস্তার মাঝখানে একটা ছোট্ট বটগাছের তলায় এক উলঙ্গ মার্কা "সাধু বাবাজীকে" একদল ভক্ত-পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন দেখতে পেলাম "সাধু মহারাজের" সর্বশরীরে ভস্ম মাখা ছিল। রাস্তা থেকে কতকগুলি পাথর কুড়িয়ে এনে সিঁদুর মাখিয়ে সেগুলি বট-গাছটার গোড়ায় সাজিয়ে তিনি সেখানে একটা "শিবতলা" সৃষ্টি করেছিলেন। দেখলাম, মিলের নিরক্ষর কুলীরা এসে সেখানে বেশ ভীড় জমাচ্ছে এবং সকলেই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী দু'এক পয়সা করে "শিবতলায়" নৈবিদ্যিও দিচ্ছে। সাধু-মহারাজের অর্থনৈতিক জ্ঞানটা যে খুব টনটনে এবং কালে এই তৈরি করা "শিবতলার" বদৌলতে তিনি যে বেশ দু'পয়সা কামাতেও পারবেন, তা পরিষ্কারই বুঝা গেলো।

দু'পাশে কুলী লাইন, মাঝখান দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে মিলের গেট পর্যন্ত রাস্তা চলে গিয়েছে। তখন বেলা প্রায় নটা হবে। ঘুরতে ঘুরতে মিলের গেট পর্যন্ত গিয়ে সেই রাস্তা

www.pathagar.com

ধরেই আবার ফিরছিলাম। দেখলাম, মাদ্রাজী কূলী তরুণীরা গায়ে হলুদ মেখে দলে দলে পথি-পার্শ্বস্থ পানির কলে নাইতে আসছে। তারুণ্য উদ্ভাসিত তাদের স্বাস্থ্য সম্পন্ন কালো কুচকুচে দেহের উপর হলুদের জাফরানী রঙ মিশে যে একটা শ্যামলিমা সৃষ্টি করেছিল, বাস্তবিকই তা নয়ন-ভুলানো। হলুদের রঙে রঞ্জিত তাদের আধ ময়লা কাপড়গুলি পানিতে ভিজে যৌবন ভারাতুর কালো দেহের সাথে মিশে গিয়ে কেমন করে আপন হারা হয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাই দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম-কুলীর জীবনও কত সুখের হতে পারে। গায়ে হলুদ মেখে কালো বরণী মেয়েও তার দেহখানাকে অপরের কাছে লোভনীয় করতে চায় যে যৌবনের প্রেরণায়, মনে মনে সেই যৌবনের জয়গান করতে করতে বেলা প্রায় দশটার সময় মসজিদে ফিরে এলাম।

তখন বেলা বোধ হয় প্রায় বারোটা হবে। একটা হোটেলে বসে ভাত খাচ্ছিলাম। পাশে বসে আরো কয়েকটি লোকও খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন কথায়-কথায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। বল্লাম, "বিদেশী মুসাফির আমি চাকুরীর সন্ধানে ঘুরছি।" লোকটা আমায় জানাল, হাওড়ায় নাকি একটা নতুন চটকল তৈরি হচ্ছে; সেখানে গেলে সে আমায় একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তার এ মিষ্টি কথায় আমি ভুলে গেলাম। বল্লাম যদি সে হোটেলে আসে তবে পরদিন আমি তার সাথে যেতে পারি। লোকটা মুখে আরো বেশি করে দরদের সুর ফুটিয়ে জানাল, পরদিন সে আর সেখানে আসবেনা; যদি যেতে হয়, তখনই তার সাথে যাওয়া দরকার। আমার সাথে তখন সামান্য কিছু পয়সা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; আর গাঁঠরী-বোচকা সবই তখন ইমাম সাহেবের কাছে। তাকে তা জানালাম। সে বল্ল, "কুচ পরওয়া নেই, তোমার হাওড়া যাওয়ার ভাড়াও আমিই দেব।" -অপরিচিতের এ সদয় ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। চাকরির ব্যবস্থা হলে পর ফিরে এসে গাঁঠরী-বোচকা নেওয়া যাবে ভেবে তখনই লোকটির সাথে হাওড়া রওয়ানা হলাম।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে একটা স্টীমার স্টেশনে এসে লোকটি দু'খানা টিকিট কিনল এবং দু'জনেই স্টীমারে চেপে বসলাম। স্টীমারে বসে লোকটির সাথে অনেক কথা-বার্তা হলো; সে আমায় চাকরির ভবিষ্যত সম্বন্ধে কত লোভই না দেখাল। শেষে "শিবতলা" ঘাটে এসে যখন স্টীমার থামলো, সে তখন আমায় জানাল সেখানেই আমাদিগকে নামতে হবে। তার এ কথায় আমার মনে ভিষণ সন্দেহ জাগল। টিটাগড় হোটেলে এবং স্টীমারে বরাবরই সে আমায় জানিয়েছে হাওড়ায় যেতে হবে, কিন্তু "শিবতলায়" এসে নামতে চাইছে দেখে আমি তাকে সন্দেহ না করে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি হাওড়ায় যাবে বলেছিলে, কিন্তু এখন এখানে নামছ কেন?" আমতা আমতা করে সে বল্ল, মানিকতলায় নাকি তার বাসা; সে বাসায় যাবে প্রথমে, তারপর যাবে হাওড়ায়। কিন্তু তার এ কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। ভাবলাম, লোকটা নিশ্চয়ই জোচ্চোর-বদমায়েশ হবে, তার সাথে যাওয়া

www.pathagar.com

কিছুতেই সঙ্গত নয়।

মনের ভাব মনেই গোপন রেখে লোকটির সাথে স্টীমার থেকে নামলাম এবং তার পেছন-পেছন স্টেশন থেকে বেরিয়ে ষ্টান্ড-রোডে এসে পড়লাম। ষ্টান্ড রোড পেরুতে যাব অমনি মাল-বোঝাই প্রায় বিশ-পঁচিশ খানা মহিষের গাড়ী এসে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল। আমি রাস্তার পশ্চিম পাশে, আর আমার সঙ্গী পূর্ব পাশে, মাঝখানে গাড়ীগুলি। ভাবলাম, লোকটাকে ফাঁকি দেওয়ার এই সুযোগ।

সুতরাং তাকে কোন কথা না বলেই ষ্ট্রান্ড রোড ধরে সোজা উত্তর দিকে চল্লাম। অনেক দূর অগ্রসর হয়ে পেছন ফিরে দেখতে পেলাম লোকটা হাত উঁচু করে আমায় ডাকছে। কিন্তু তার এ ডাকে কে সাড়া দেয়। কোলকাতার এক ব্যবসাদার বদমায়েশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি তখন দ্বিগুণ গতিতে সামনে অগ্রসর হয়ে চলেছি।

আসরের নামাজের প্রাক্কালে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে চীৎপুর "মহিষ-বাথানের" নিকটস্থ "মস্তান-শাহের" মসজিদে গিয়ে পৌছলাম। নামাজের আজান তখন হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং ওজু করে সর্বপ্রথমেই নামাজটা সেরে নিলাম। নামাজ অন্তে মসজিদের মোয়াজ্জিন সাহেবের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, মসজিদের মোতওয়াল্লী নাকি এক পাঞ্জাবী শাহ সাহেব- "মস্তান শাহ" নামে তিনি সাধারণ্যে পরিচিত। শাহ সাহেব একজন অতি কামেল দরবেশ এবং প্রত্যেহ যে-সব লোক তাঁর কাছে এসে থাকে, তাঁর দোয়ায় তাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য নাকি পূর্ণ হয়-মোয়াজ্জিন সাহেব এ-সংবাদও আমায় দিলেন। আরো জানতে পারলাম, শাহ সাহেব মসজিদের নিকটেই একখানা বাড়িতে থাকেন- দিনে মাত্র দু'তিন বার তিনি মসজিদে আসেন।

মগরেবের নামাজের পর "মস্তান শা'র" দর্শন এবং তাঁর কারামতের পরিচয় পেলাম। দেখলাম, একখানা সাদা লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় কাঁধে একটা চাদর ঝুলিয়ে শাহ সাহেব এসে মসজিদে ঢুকলেন এবং তাঁর পিছু পিছু একপাল অনুগ্রহপ্রার্থীও এসে মসজিদের প্রাঙ্গনটা ভর্তি করে তুলল। সমাগত লোকদের মধ্যে দু'তিন জন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও দেখা গেলো- সম্ভবতঃ কেরাণীগিরির ওমেদওয়ার তারা।

সব্বাই এসে মসজিদের প্রাঙ্গনে উপবেশন করলে পর মস্তানজী পার্শ্ববর্তী মক্তবখানা থেকে একটা লাঠি সংগ্রহ করে এনে উপবিষ্ট লোকদের এক জনের পিঠে দমাদম মারতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে লাথিও চল্ল। লোকটা সেখানেই এলিয়ে পড়ল। কয়েকজন লোক অগ্রসর হয়ে তাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলে পর দেখলাম-শিক্ষিত বাঙালী "বাবু" তিনটির মধ্যে এ হতভাগাও একজন। সব্বাই তাকে উদ্দেশ্য করে তখন বলছিল- "তোম্হারা তক্‌দীর বহুৎ আচ্ছা হ্যায়; তোম্হারা নওকরি জরুর মিল্ জায়েগা।" মস্তান শাহ ততক্ষণে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর চুপে চুপে মসজিদে ফিরে এসে তিনি মার-

www.pathagar.com

খাওয়া লোকটির সন্ধান করলেন এবং তাকে কাছে ডেকে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন, "বাবু, তুম্ মুঝে মাফ করো, খোদা তোম্হারা নওকরি লাগা দেয়েগা।" লোকটি সন্তুষ্ট চিত্তে শাহ সাহেবকে সালাম করে প্রস্থান করল। পরে জানতে পেরেছি, যত লোকই অনুগ্রহ লাভের আশায় মস্তানের কাছে এসে থাকে, সব্বার উপরই নাকি এরূপ জুলুম অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর হাতের মার খেয়ে লোকে সত্যি-সত্যিই উপকারও নাকি পায়। তাই প্রত্যহ শত-শত লোক মার খাওয়ার জন্যে মস্তানের দরজায় এসে ধন্না দেয়।

অতি কষ্টে রাতটা কাটালাম মস্তানের মসজিদে। শীতকাল গায়ে একখানা পশমী চাদরই মাত্র সম্বল; তার উপর আবার মসজিদের মেজেটা মার্বেল পাথরের বাঁধানো। সুতরাং কী কষ্টে যে রাতটা কাটাতে হয়েছিল, তা না বল্লেও চলতে পারে। শীতের কাঁপুনীর সাথে রাত্তিরে আবার জ্বরের কাঁপুনীও এসে যোগ দিল। সকালের দিকে জ্বর ছাড়লে পর ঘুম থেকে উঠে কোন রকমে ফজরের নামাজটা পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

শীতের দিনের প্রভাতী রোদের কিরণটা কত মিষ্টি, সেদিন তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলাম। সোজা উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যখন কাশীপুর গান-ফ্যাক্টরীর নিকটস্থ হয়েছি, তখন বুঝতে পারলাম আবার কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসছে। আশ্রয়ের আশায় দুপাশে মসজিদের সন্ধান করতে করতে বড়নগর নামক স্থানে গিয়ে এক জায়গায় রাস্তার ডানপাশে একটা নতুন মসজিদ তৈরি হচ্ছে দেখা গেল। ভাবলাম, সেখানে গেলে নিশ্চয় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। জ্বরের প্রকোপে শরীরের কাঁপুনীও তখন এত বেড়ে গিয়েছিল যে আর পথ চলা যায় না। কাজেই মসজিদের দিকেই অগ্রসর হলাম। নিকটে গিয়ে দেখলাম মসজিদখানা কেবল তৈরি হচ্ছে, শোবার মত কোন ব্যবস্থা তখনও তাতে হয়নি।

মসজিদের পাশেই একটা খোলা জায়গায় একজন লোক একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে ছিল। নিরুপায় হয়ে সেই বিছানারই এক পাশে বসে পড়লাম। আমার অস্বাভাবিক কাঁপুনীতে নিদ্রিত লোকটার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। উঠে আমার এ শোচনীয় অবস্থা দেখে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই তিনি অতি যত্নে আমায় নিজের বিছানায় শুতে দিলেন এবং নিকটস্থ বাড়ি থেকে দুটো কম্বল এনে আমার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে যখন কাঁপছিলাম, লোকটি তখন পাশে বসে দু'হাতে আমায় চেপে ধরে দু'এক কথায় আমার পরিচয় জেনে নিলেন। আমি পানি খেতে চাইলে তিনি এক বোতল সোডাওয়াটার এনে আমায় খাওয়ালেন।

কিছুক্ষণ পর জ্বর ছাড়লে পর উঠে বসলাম এবং পথের বন্ধু অপরিচিত এ দরদী ব্যক্তিটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। জান্‌লাম-নাম তাঁর কাল্লু; পেশা-কোচওয়ানী-পাশের বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি পথ ধরতে চাইলে তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন, -

www.pathagar.com

তা কিছুতেই হতে পারে না, জ্বর যতদিন না ছাড়ে ততদিন আমায় তাঁদের বাড়িতেই থাকতে হবে। সামান্য কোচোয়ান কাল্লুর এ মহাপ্রাণতার কাছে মাথা অবনত না করে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, মানুষের মাঝে যদি ফেরেশতা কোথাও থেকে থাকে, তবে তা গরীবের মাঝেই আছে-বড়লোক অভিজাতদের মধ্যে নয়।

চারদিন পর্যন্ত কাল্লুদের বাড়ীতে থেকে তাঁর মা, তিনটি বোন এবং ছোট দু'টি ভায়ের আদর যত্ন পেয়েও জ্বর কিছুতেই ছাড়ল না। পঞ্চম দিন সকালে কাল্লু নিজে আমায় সঙ্গে করে কাশীপুর North Suberban হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন। এগার দিন হাসপাতালে থেকে জ্বর আরোগ্য হলো এবং আবার কাল্লুদের বাড়িতে ফিরে গেলাম। সেখানে আরো দু'দিন থেকে পুনরায় ফিরে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাঁঠরী-বোচকা সব টিটাগড় থেকে আনবার জন্যে একদিন সকালে টিটাগড় যাত্রা করলাম। নিজের গাড়ীতে করে আমায় দমদম স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিয়ে কাল্লু ছ'আনা পয়সা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, পরদিনই যেন আবার ফিরে আসি। তাকে আশ্বস্ত করে গাড়ীতে চাপলাম।

দু'দিন পরই টিটাগড় থেকে ফিরেও এলাম। প্রায় পনর দিন পর্যন্ত কাল্লুদের বাড়ীতে থেকে এ-দিক সে-দিক কাজের চেষ্টা দেখতে লাগলাম। একদিন বিকাল বেলা কাল্লুর চাচা কথায় কথায় আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, কাল্লুর অবিবাহিতা যে ছোট্ট একটা বোন আছে তাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে তাঁরা বেশ খুশী হন। বোনটাকে আমি দেখেছিলাম; বেশ সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি-বয়স বারো-তেরো হবে। তৎক্ষনাৎ কোন উত্তর না দিয়ে ভেবে পরে উত্তর দেব বলে আমি তখনকার মত প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলাম।

পরে ভেবে দেখলাম, অপরিচিত জায়গায় সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বিয়ে করার মতো মূর্খতা বাস্তবিকই আর কিছু হতে পারে না। বিশেষতঃ বিয়ে করার জন্য আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসিনি। সুতরাং বাঁধনহারা পথের মাঝে বন্ধনের নতুন জিঞ্জীর পরে নিজের ভবিষ্যতকে একেবারে মাটি করে দিতে আমার মন কিছুতেই সায় দিলনা। পরদিন কাল্লুর চাচার কাছে অসম্মতি জ্ঞাপন করে নিজের অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চাইলাম এবং আপাততঃ তাঁদের কাছ থেকে আমায় মুক্তি দিবার জন্যে অনুরোধ করলাম। পরে কাল্লুর কাছেও আমি অতি খোলাখুলি ভাবে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করে বিদায় চাইলাম।

বিদায়ের সম্মতি পেলাম; কিন্তু বড় ব্যথাপূর্ণ সে বিদায় স্মৃতি! কাল্লুর মা, বোন, ভাই সব্বারই কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাল্লু নিজের গাড়ীতে তা'রি পাশে কোচ-বাক্সে চেপে আবার অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা করলাম। বিদায় বেলায় সব্বাই যেরূপ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমায় বিদায় দিয়েছিলেন, নিজের মা-বোনের কাছেও কোনো দিন এর চেয়ে বেশি সহানুভূতি আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে আমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে আমার হাতে দু'টো টাকা গুঁজে দিতে দিতে অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে ধরা গলায় কাল্লু অনুরোধের স্বরে বল্লেন- "ভাই, যেখানেই থাকনা কেন, তোমার এ পথের ভাইটিকে মনে রেখো। আর্শীর্বাদ করি, খোদা তোমার মাথা আকাশের চেয়েও উঁচু করে তুলুন; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" -আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না; গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন-উত্তর দিকে, যে পথে এসেছিলেন আবার সেই পথে। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোচ-বাক্সে সমাসীন বিরাট মানুষটির পানে চেয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ মঞ্জিল

আবার অকূলে ভাসলাম। চলার পথের মাঝে বাঁধনহারা এ মুসাফিরের পায়ে বন্ধনের জিঞ্জীর পরবার জন্যে দরদী বন্ধু কালু যে প্রয়াস পেয়ে ছিলেন, তা ব্যর্থ করে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালাম- বিশ্বের উন্মুক্ত পথ ময়দানে। চার পাশে চক্ষু ফিরিয়ে দেখতে পেলাম কোথাও একটুমাত্র পরিচয়ের চিহ্ন নেই-সবই অপরিচিত অজানা। ভাবতে লাগলাম, এ অজানা রহস্য-পুরীতে কোথায় যাব পরিচয়ের সন্ধানে। কবির ভাষায় মনে পড়ল ঃ-

"নিকটকে করিলে দূর বন্ধু,
পরকে করিলে আপন।"

মনে সাহস জন্মালো। ভাবতে লাগলাম, যারা আমার অতি "নিকট" আপনার জন ছিল, তাদের "দূর" করে দিয়ে "পরকে" করে নেবার জন্যেইতো আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি; সুতরাং অপরিচয়ের বিভীষিকা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দিবে কেন? অজানা রহস্যপুরী এ কোলকাতার অলি-গলি খুঁজে "পরের" মাঝে "আপনার" জনকে আবিষ্কার করে বিজয়ী হবো, তবেইত আমার অভিযানের সার্থকতা। কাজেই, কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না করে সার্কুলার রোড ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পা বাড়ালাম।

সারাদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে-পথে ঘুরে কাটালাম। সন্ধ্যার সময় হ্যারিসন রোডে রিপন কলেজের সামনে যে একটা মসজিদ আছে, তাতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মসজিদের মোতয়াল্লী প্রৌঢ় বয়স্ক জনৈক ভদ্রলোক স্থানীয় কোনও স্কুলের মাষ্টার। মসজিদ সংলগ্ন বাড়িতেই দ্বিতলে সপরিবারে থাকেন। এশার নামাজের পর একটা বাসনে করে ভদ্রলোক আমার জন্যে কিছু খানা পাঠিয়ে দিলেন। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে মসজিদের ভিতরই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

সাত-আট দিন এরূপভাবে কোলকাতার পথে-পথে ঘুরলাম অনর্থক। পকেটে কালুর দেওয়া যে সামান্য কিছু সম্বল ছিল, তার শেষ পয়সাটাও যেদিন খতম হয়ে গেলো, তার পরও আরো দু'দিন চল্ল সম্পূর্ণ অনাহারে কেবল কলের পানি খেয়ে। উপবাসের তৃতীয় দিন দুপুর বেলা ঘুরতে ঘুরতে ইন্টালী মার্কেটের (তখনও সেখানে বাজার তৈরি হয়নি) পেছনে পূর্ব পাশে অবস্থিত মসজিদটীতে গিয়ে জোহরের নামাজ শেষ করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে শুয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

ঘুম পেয়েছিল। হঠাৎ একটা লোক এসে মসজিদে ঢুকে কাঁচা ঘুমের মাঝে আমায় জাগিয়ে দিলেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পেলাম, গলায় ব্যাগ ঝুলানো এক ডাকপিয়ন এসে আমার পাশেই ব্যাগটা নামিয়ে রেখে পায়ের পটী খুলে ওজু করার ব্যবস্থা করছেন। ওযু করে এসে তিনি নামাজ শেষ করলেন এবং আমার পাশে বসে পায়ে পটী জড়াতে-জড়াতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দিলে পর সহানুভূতির স্বরে তিনি বল্লেন, – "ভাই, আমি মুসলমান, আমার কাছে তোমার লজ্জার কোনও কারণ নেই। বলত, তুমি আজ ভাত খেয়েছ কি? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছুই খাওনি।" অপরিচিত এ দরদী মানুষটির কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও নিজের দুরবস্থা গোপন করে রাখতে পারলাম না; শেষে স্বীকার করতে হলো, বাস্তবিকই তিন দিন যাবত আমার পেটে এক মুষ্টি দানাও পড়েনি।

শুনে তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন। হাত ধরে আমায় বিছানা থেকে টেনে তুলতে-তুলতে বল্লেন- "চল ভাই আমার বাড়ীতে-সেখানে গিয়ে দু'ভায়ে মিলে খাওয়া যাবে খন।"

উঠে দাঁড়িয়ে দরদী পিয়ন বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। জানলাম-নাম তাঁর বশারত আলী, ইন্টালী পোষ্ট অফিসে ৩৫ টাকা বেতনে কাজ করেন, নারকেলডাঙ্গায় থাকেন। তাঁর পরিবারে একমাত্র আট বছরের একটি ছেলে ও এক বৃদ্ধা ফুফুমা ছাড়া আর কেউ যে নেই, এ সংবাদটিও তিনি জানালেন এবং পরে বল্লেন, "খোদা আমায় বেশ সুখে রেখেছেন ভাই-তাঁর দয়ায় আমি পরিবার প্রতিপালন করেও গত কয় বছরে শ'তিনেক টাকা জমাতে পেরেছি। খোদার কাছে হাজার শোকর।" দেখলাম, খোদার মেহেরবানীর কথা মনে করে তাঁর চোখে বিস্ময়কর কৃতজ্ঞতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

বেলা প্রায় দু'টোর সময় বশারত আলীর বাড়ী পৌঁছে তাঁর সঙ্গে একসাথে বসে আহার করলাম। আহারের পর আমায় সঙ্গে করে নিকটবর্তী একটা চা-খানায় নিয়ে গিয়ে তিনি এক পেয়ালা চা খাওয়ালেন এবং চুপি চুপি আমার হাতে চারটি টাকা গুজে দিতে দিতে বল্লেন- "ভাই, এ টাকা কটা নিয়ে গিয়ে তুমি খবরের কাগজ ফেরী করা শুরু কর; দেখবে, তোমার খাওয়ার কষ্ট কোন দিনই হবেনা। পরে কোথাও সুবিধা মত কোনো চাকরী যোগাড় হলে তুমি পারত আমার টাকা পরিশোধ করো-নয়তো আমার কোনোও দাবী নেই এ টাকার উপর।"

কৃতজ্ঞ চিত্তে পথের ভাই বশারত আলীর হাত থেকে টাকা চারটি গ্রহণ করলাম। প'য়ত্রিশ টাকা বেতনের সামান্য এক ডাকপিয়নের এ মহাপ্রাণতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

বশারত আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামান্য কয়েক পদ অগ্রসর হতেই তিনি আমায় ডেকে ফিরালেন। কাছে গেলে পর আমার হাতে আর একটি টাকা গুজে দিতে দিতে

www.pathagar.com

বল্লেন- "তোমার পায়ে জুতো নেই দেখছি, নিয়ে যাও এ টাকাটাও-এক জোড়া চটি জুতা কিনো।" "পর" যে কেমন করে "আপন" হয়, বশারত আলীর মাঝে তার নতুন পরিচয় পেলাম।

বশরাত আলীর পরামর্শ মতোই কাজ করলাম। পরদিন সুর্যোদয়ের পূর্বেই "বসুমতি" অফিসের দরজায় গিয়ে ধন্না দিলাম এবং হকারদের অস্বাভাবিক ভীড়ের মাঝে কোন রকমে পঁচিশ খানা কাগজ কিনে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের গেটে এবং কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই তা বিক্রি করে শেষ করলাম। কাগজ নিয়ে বেরিয়ে প্রথম-প্রথম খুব লজ্জা লাগছিলো; শত চেষ্টা করেও হাঁক-ডাক করতে পারছিলাম না। লোকজন দেখলেই লজ্জায় যেন গলা জড়িয়ে আসছিল। এই অস্বাভাবিক লজ্জাটাকে দূর করার জন্যে শেষে এক মতলব ঠাওরালাম রাস্তায় লোকজন দেখলেই আস্তে আস্তে হাঁক দিতাম; কিন্তু একটু ফাঁকা পেলেই জোরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু করতাম। এরূপভাবে প্রথম দিনের মাঝেই লজ্জার ভাবটা অনেকাংশে কেটে গেলো। হকার জীবনের প্রথম দিনে রোজগার হলো মোট তের পয়সা। মনে একটু আশার সঞ্চার হলো। পরদিন কাগজ নিলাম সাঁইত্রিশ খানা এবং সেদিনও সবগুলি কাগজ সন্ধ্যার মধ্যেই বিক্রি করে ফেল্লাম। তৃতীয় দিন থেকে রোজ পঞ্চাশ খানা করে কাগজ নিয়ে অতি অনায়াশে বিক্রি করতে লাগলাম। সামান্য কয় দিনের হকার জীবনে যে সব লোকের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আজ আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। রোজ বিকালে ক্লাইভ ষ্ট্রিটে লয়েড ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ বিক্রি করতাম। কালো আচকান আর তুর্কী টুপী-পরা এক ভদ্রলোক এসে রোজ আমার কাছ থেকেই কাগজ কিনতেন। একদিন আমি তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন, "আমার নাম সুধাংশু শেখর চ্যাটার্জী"। আমি আশ্চর্য হয়ে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো তাঁর মুখের পানে চাইলে হাসতে হাসতে বুকের ক'টা বোতাম খুলে গলার পৈতাটা বের করে আমায় দেখিয়ে তিনি বল্লেন, "আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কাপড়-পরা প্রত্যেকের নিজের পছন্দ মতো। এ আমার Official dress;-বেশ ভদ্র পোষাক বলেই আমি এই পরে রোজ অফিসে এসে থাকি।"

আমার এই হকার-জীবনের আর এক বিরাট অভিজ্ঞতা হচ্ছে পুলিশ কোর্টের পাইকারী বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। একদিন ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে পুলিশ আরো অনেক ফেরীওয়ালার সাথে আমাকেও ধরে নিয়ে গেলো রাস্তায় ভীড় সৃষ্টি করার অপরাধে। বংশাল ষ্ট্রীট পুলিশ কোর্টে আমাদের বিচারক হলো। দেখলাম- বিচারম মশায় আসামীদের কাকেও কোন প্রশ্ন না করেই পাইকারীভাবে জরিমানা করে যাচ্ছেন। প্রথমে আমার জরিমানা হয়েছিল আট আনা; কিন্তু প্রতিবাদ করায় মুহূর্ত মধ্যে তা বেড়ে দু'টাকায় পরিণত হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রায় মাস তিনেক কোলকাতায় হকারী করেছিলাম। প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও শেষে রোজ এক টাকা, দেড় টাকা এবং মধ্যে মধ্যে দু'তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার হচ্ছিল। সারাদিন কাগজ বিক্রি করে রাত্রিতে সিন্দুরিয়া পট্টীতে হাফেজ জামালুদ্দিন সাহেবের মসজিদে গিয়ে থাকতাম। সেখানে আমারি মতো আর একটা ভ্যাগাবণ্ডের সাথে পরিচয় হলো। নাম তার -মফিজ উদ্দীন, বগুড়া জেলার মহাস্থানে বাড়ি; ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে নাকি বেরিয়ে এসেছে।

মাস তিনেক হকারী করার পর একদিন মফিজ উদ্দীনের সাথে পরামর্শ করে কোলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করলাম। প্রথমতঃ আজমীরে গিয়ে অতঃপর সেখান থেকে পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্থান এবং তুরস্কে যাব- ইহাই ছিল আমাদের প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভ্রমণ সমাধা করতে হলে যে হাজার হাজার টাকার দরকার, আমরা অবশ্য তা জানতাম এবং আমাদের উভয়ের পকেটেই যে রাত-দিন লালবাতি জ্বলছে, সে বিষয়েও আমরা সজ্ঞান ছিলাম। কিন্তু তথাপি কপর্দকহীন অবস্থায় দুঃসাহসিক অভিযান করতে আমাদের একটুও বাধল না। কয় মাসের ভ্যাগাবণ্ড জীবন আমাদের অন্তরকে সত্যিই বেদুঈনের অন্ত রে রূপান্তরিত করে তুলেছিল।

আমার পকেটে পাঁচ সিকা, আর মফিজের সাথে এক টাকা- এই সম্বল নিয় দু'জনায় একদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে প্লাটফর্ম টিকিট করে গাড়ীতে চেপে বসলাম। গার্ডের সবুজ নিশানের দোলানীর ইঙ্গিতে বিকট রোলে বংশীধ্বনি করে গাড়ী ছেড়ে দিল। কোলকাতায় মুসাফিরী শেষ করে গতিহারা মুসাফির আবার চল্লাম অনির্দিষ্টের পথে। গাড়ীতে বসে বসে ভাবছিলাম-পথের হাতছানির আকর্ষণ এড়াতে পারে, এমন শক্তি বুঝি সত্যি মানুষের নেই।

যে ট্রেনে চেপেছিলাম, তা ছিল বি-এন আরের একখানা লোকাল ট্রেন। মেছেদা স্টেশনে পৌছে বাধ্য হয়ে আমাদের নেমে পড়তে হলো। মেছেদা জায়গাটা বোধ হয় মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার এলাকায়। স্টেশন মাস্টার এসে টিকিট চাইলে আমি এবং মফিজ উভয়েই উত্তর দিলাম, "পয়সা নেই, সুতরাং টিকিট কেনা হয়নি।" দাঁত খিঁচিয়ে মাস্টার মশাই ভীতি প্রদর্শনাত্মক সুরে জানালেন, আমাদের নাকি পুলিশে সোপর্দ করা হবে। অতঃপর তিনি স্টেশন-ঘরের বারান্দায় রক্ষিত একখানা বেঞ্চিতে বসবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করলেন এবং নিজে ঘরের ভেতর ঢুকে কাজে মশগুল হয়ে পড়লেন।

প্রায় আধঘন্টা খানেক বসে থাকার পর মাস্টার বাবুর নিকটে গিয়ে খাবার চাইলাম। তিনি দাঁত খিচিয়ে উঠে বল্লেন- "বিনা টিকেটে আসা, আবার খাবার আবদার।" বল্লাম,- "মশাই, কি আর করব, কাছে পয়সা নেই বলেই ত বিনা টিকিটে এসেছি। বড্ড খিদেও পেয়েছে; হয় দু'টো খাবার ব্যবস্থা করে দিন; নয়ত ছেড়ে দিন, কোথাও গিয়ে খাবার সন্ধান করে

www.pathagar.com

নেব খন।" এবার মাস্টারের মুখে হাসি দেখা গেল। হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কোথায় যাবে, খোকা।" খড়গপুর যাব বলে উত্তর দিলাম। মাস্টার মশাই হাসতে হাসতে জানালেন, মিনিট পনেরো পরেই আর একটা ট্রেন আসছে, তাতে চেপে অনায়াসে আমরা খড়গপুর চলে যেতে পারি। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বসে গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গাড়ী এল এবং আমরা দুই ভ্যাগাবণ্ডও তাকে নবাবী হালে চেপে বসলাম। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় খড়গপুর স্টেশনে পৌছে প্রথমতঃ বাজারে গিয়ে একটা হোটেলে কিছু খেয়ে নিলাম এবং তারপর আস্তে আস্তে জোমা মসজিদের পথে অগ্রসর হলাম। পথে বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা স্থানে তৈরি কয়েকটা নতুন দালান দেখা গেলো। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, মেদিনীপুর জেলাটাকে ভাগ করে নতুন "হিজলী" জেলা গঠন করার মতলবেই নাকি সরকার এ সব দালান এমারত তৈরি করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে নতুন জেলা গঠনের সংকল্প পরিত্যক্ত হওয়ায় এ সব সরকারি এমারতও অনেকাংশে পরিত্যক্ত অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ পূর্বে জোমা মসজিদে পৌছে মাগরেবের নামাজ শেষ করলাম। নামাজ অন্তে দুইটি সাধাসিধা ধরণের লোক (সম্ভবতঃ তাঁরা রেলের কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী হবেন) এসে আমাদের উভয়কে সঙ্গে করে নিয়ে একটা হোটেলে বেশ তৃপ্তির সাথে আহার করালেন। আহার করে উভয়েই আবার মসজিদে ফিরে এলাম এবং এশার নামাজ শেষ করে সেখানে শুয়েই রাতটা কাটালাম।

পরদিন সকালে স্টেশনে গিয়ে দেখতে পেলাম, বেজায় কড়া ব্যবস্থা সেখানে। কাজেই হেটেঁই খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর যাব মনে করে পথ ধরলাম। খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর মাত্র ছ'মাইলের পথ। রাস্তার দু'পাশেই ঝাড়-জঙ্গল-কেমন যেন একটা পাহাড়ে ভাব। মেদিনীপুরের এই অঞ্চলটাকে দেখলেই মনে হয়, সোনার বাঙলার সাথে তার কত পার্থক্য। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এই অঞ্চলকে কিছুতেই যে বাঙলার সামিল করা যায় না, বরং বিহারের এলাকাধীন সিংভূম-মানভুম জেলার পার্ব্বত্য ভূমির সাথেই যে এর যোগ বেশি, তা পরিষ্কারই বুঝা গেল।

শাল-বনানীর মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকরের বন্ধুর পথ এঁকে বেঁকে অগ্রসর হয়েছে। পথ চলতে চলতে মনে হয়, দু'পাশের বড় বড় শাল গাছগুলি যেন প্রহরীর মতোই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে আবার ছোট-ছোট টিলাও নজরে পড়ে। কোথাও একটু সাদা মাটি দেখা যায় না; সমগ্র দেশটাই যেন গেরুয়া পরে' সন্ন্যাসী সেজেছে। বাঙলার শেষ সীমা মেদিনীপুরের এই কঠোর প্রকৃতিটা দেখলেই কবির ভাষায় মনে পড়ে ঃ

"সোনার বাঙলা, তোমায় আমি ভালবাসি।

www.pathagar.com

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস-
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

সত্যই বাঙলার মতো এমন সোনার দেশ আর নেই। বেলা প্রায় বারোটার সময় মেদিনীপুর শহরে পৌঁছেও বুঝতে পারলাম, সোনার বাঙলার শ্যামলিমা কতো পেছনে ফেলেই না চলে এসেছি। অনাগত ভবিষ্যতে আমাদের যে কঠোর প্রকৃতির সাথেই সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হবে তাও বুঝতে বাকী রইল না। প্রকৃতির কঠোরতার সাথে সাথে স্থানীয় লোকদের হৃদয়ও যে কঠোরভাবে গড়ে উঠেছে, তারও পরিচয় পেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই।

সেদিন শুক্রবার ছিল। শহরে পৌঁছেই প্রথমে জোমা মসজিদে গেলাম। জোমার নামাজ শেষ করে বসেছিলাম, এমন সময় একটা লোক এসে আমাদের দু'জনকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। লোকটার সাথে আমরা এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন লোকের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের বৈঠকখানার মস্তবড় দালানটায় বসিয়ে রেখে লোকটি সেই-যে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল, বিকেল তিনটা পর্যন্তও তার টিকিটিরও আর সন্ধান পাওয়া গেলো না। তিনটা পর্যন্ত অনর্থক অপেক্ষা করে অবশেষে আমাদের সে বাড়ির খানার আশা ত্যাগ করতে হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর এক গরীব ভদ্রলোকের দয়ায় আমরা উদরজ্বালা নিবারণ করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

মেদিনীপুরের উপর মন বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এরূপ অদ্ভূত আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়ার পর, এমন লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় আর এক মিনিটও থাকার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। সুতরাং বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় স্টেশনে গিয়ে "গমু"-গামী একখানা ট্রেনে চেপে বসলাম।

শাল-বনানীর বুক চিরে লৌহ-রথ ছুটছিল উর্দ্ধশ্বাসে-একটা উন্মত্ত দৈত্যের মতোই। গাড়ীতে বসে বসে ভাবছিলাম-কোন সীমাহীন অনন্তের উদ্দেশ্যে আমাদের এ যাত্রা। পনের হাতছানির এ মোহময় আকর্ষণ টানতে টানতে আমাদের জীবনটাকে শেষে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে, সে প্রশ্নও বারে-বারে মনকে পীড়িয়ে তুলছিল। সেদিন মনের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি; কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, এ উদ্দেশ্যহীন যাত্রারও একটা মূল্য ছিল। নব-ফ্রান্সের মন্ত্র-গুরু রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় আজ মনে পড়ছে, সত্যই "Life is a battle without armistice, without mercy" (জীবন সংগ্রামে সন্ধি নেই-দয়া-মায়ার স্থান নেই)। এই ভীষণ জীবন-সমরে বিজয়ী হতে হলে কি করা দরকার, তা ভাবতে গিয়েও রোমাঁ রোলাঁর কথাই মনে পড়ে,- "Go on to death, you, who must die! Go and suffer, you, who must suffer! You do not live to be happy. You live to fulfil His law. Suffer, die! But be, what you must be-a Man."

www.pathagar.com

সত্যিই তো। বাঁচবার ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবে মরণকে ভয় করার কী অধিকার আমাদের থাকতে পারে! দুঃখ-কষ্টকে বিজয় করার ক্ষমতা যদি আমরা সংগ্রহ করতে না পারি, তবে দুঃখকে ভয় করে দূরে থাকলেই দুঃখকে এড়িয়ে চলা যায় না তো। আমরা দুনিয়ায় এসেছি আনন্দ করে ফুঁ দিয়ে জীবনটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে নয়; বিশ্বের যে মহীয়ান মালিক, সেই স্রষ্টার ইচ্ছার তলে মাথা পেতে দিতেই হবে আমাদের। সুতরাং মিছামিছি মরণকে ভয় করে, দুঃখকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা পেয়ে ক্লৈব্যের প্রশ্রয় দেওয়ার সার্থকতা কী? এ ক্লৈব্য ত্যাগ করে আমাদের যে মানুষ হতেই হবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে যখন মনের ভেতর একটা বিরাট দ্বন্দ্ব পাকিয়ে তুলবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে মাথায় মস্তবড় পগগড়-বাঁধা পাঞ্জাবী T.T.C (ট্রাভেলিং টিকিট চেকার) গাড়ীতে উঠে "টিকেট" বলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মনের সে সোনার স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে দিল। স্বপ্নোত্থিতের মতোই থতমত খেয়ে উঠে উত্তর দিলাম- "কই টিকেট নেই তো"। "টিকেট নেই তো, কেও গাড়ী পর আয়া।" পুলিশমে দেয়েগা তোম লোগোকো গমুমে যা কর।" এই বলে চোখ রাঙ্গিয়ে T.T.C পুঙ্গব পার্শ্ববর্তী অপর একজন যাত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গমুতে গিয়ে পুলিশের ফাঁদে ধরা দেবার মতো নিরীহ মেষ-শাবক যে আমরা নই, সম্ভবতঃ T.T.C সাহেব তা জানতেন না। গমুর আগের স্টেশনেই পুলিশকে রম্ভা প্রদর্শন করে আমরা স্টেশনের অপর দিকে গাড়ীর জানালা দিয়ে নেমে পড়লাম এবং বাকী পথটুকু (বড় জোর মাইল চার-পাঁচেক হবে) হেঁটেই গমুতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

গমু রেলওয়ে ইয়ার্ডের পশ্চিম পাশে সামান্য একটু দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটা পাকা মসজিদে গিয়ে আমরা আস্তানা জমালাম। রাত্তিরে এশার নামাজ হয়ে গেলে পর যখন আমরা মসজিদের বারান্দায় শোবার আয়োজন করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে দোহারা গোছের ছিপছিপে এক ভদ্রলোক নামাজ পড়তে মসজিদে এলেন। নামাজ শেষ করে নিয়ে তিনি আমাদের পাশে এসে বসে আলাপ জমালেন। জানতে পারলাম- ভদ্রলোক রেলের গার্ড, নাম নজীর আহমদ (অথবা নজীর উদ্দীন), পশ্চিম মূলুকে বাঁশবেরেলী জেলার অধিবাসী। আমরা দু'জন ছন্নছাড়া মুসাফির জানতে পেরে তিনি বল্লেন, যদি পরদিন সকালে আমরা স্টেশনে যেতে পারি, তবে তিনি বিনা টিকেটে আমাদের গয়া পর্যন্ত পৌছে দিতে পারেন। অপরিচিত এক ভদ্রলোকের এ সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হলাম। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম, পরদিন প্রাতে নিশ্চয়ই আমরা স্টেশনে গিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব।

কথামত পরদিন ফজরের নামাজের পরই স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে Waiting Room-এ-ই নজীর সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাদের উভয়কে সঙ্গে করে প্লাটফর্মের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গাড়ীর সবগুলি থার্ড ক্লাশ কামরার দ্বারে-দ্বারে ঘুরেও

www.pathagar.com

কোথাও আমাদের তুলে দেবার মতো একটু জায়গা আবিষ্কার করতে পারলেন না। পুরীর রথযাত্রার অবসানে দেশ-প্রত্যাগমনের পথে গাড়ীতে সেদিন 'জগন্নাথের' ভক্তদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বল্লেই চলে। দেখলাম, প্রত্যেক যাত্রীরই গাঠরী বোচকার সাথে কয়েকটা করে গেরু-মাটির রঙে রঞ্জিত বেতের লিকলিকে ছড়ি বিরাজ করছে। ছড়িগুলির একটা পাশ আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে গোল্ করা হয়েছে। যে জগন্নাথ-দেবের হাতেরই কোন বালাই নেই, তাঁর ভক্তদের হাতের হাতিয়ার এ ছাড়ি-মাহাত্ম্য বুঝা বাস্তবিকই সোজা ব্যাপার নয়। অনেক অনুসন্ধানের পরও যখন কোনো থার্ড ক্লাশ কামরায় এতটুকু জায়গা পাওয়া গেল না, নজীর সাহেব তখন একান্ত হতাশভাবেই আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "তবে কি করা যায় হে। চল, ইন্টার-ক্লাশেই তোমাদের তুলে দি।" আমাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়ার আগেই তিনি একখানা ইন্টার ক্লাশ কামরার সামনে গিয়ে নিজ হাতে দরজা খুলে আমাদের তাতে চাপিয়ে দিলেন। তারপর সবুজ নিশানের একটুকু দোলানি এবং হুইসেলের সামান্য একটু "শ্রিং" শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট অজগরের দেহ-নাড়ার মতোই "হুশ্-হুশ-কাতু-কাতু" ধ্বনির ভেতর দিয়ে গাড়ীর গতি আরম্ভ।

যে কামরাখানায় আমরা চেপেছিলাম, তা আকারে নেহায়েতই ছোট ছিল; সবশুদ্ধ আট জন বসবার উপযোগী। আমাদের আগে থেকেই ছয় জন যাত্রী কামরার সবগুলি বেঞ্চি দখল করে দিব্যি নবাবী আরামে গল্প-গুজবে মশগুল ছিল। তারা সবাই পশ্চিমা হিন্দু কেউ মোটা-ভুড়িওয়ালা মাড়োয়ারী, কেউ তিলক-কাটা বেনারসী পণ্ডিত, আর কেউ বা টিকিধারী বিহারী বামুন। দুইটি টুপী পরা গরীব মুসলমানকে গাড়ীতে চাপতে দেখে তারা সব্বাই নিজেদের মুখগুলিতে যে একটা অপরূপ ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছিল, যদি তার ফটো তুলে রাখা যেতো, তবে হিংসাতুর শয়তানের কয়খানা বেশ সুন্দর ছবি হতো নিশ্চয়। কিন্তু শত বিরক্তি স্বত্ত্বেও ইহাদের কিছু করবারই উপায় ছিল না; স্বয়ং গার্ড সাহেব যে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেছেন।

একটা বেঞ্চিতে সামান্য একটু জায়গা করে নিয়ে আমি বসে পড়লাম এবং মফিজকে স্থানাভাবে উপরের দোদুল্যমান একটা বার্থে চালান দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর পার্শ্ববর্তী মাড়োয়ারী যাত্রীটির সাথে আমার আলাপ শুরু হলো। কথায়-কথায় জানতে পারলাম, কোলকাতার জানবাজারে (Corporation Street) তার কাপড়ের দোকান আছে; জয়পুরে নিজের জন্ম-ভুমিতে যাচ্ছে। লোকটিকে দেখে বেশ পয়সাওয়ালা বলে মনে হলো। লোটা-কম্বল-সম্বল সামান্য মাড়োয়ারী সোনার বাঙলায় এসে বাঙালীর রক্ত শোষণ করে দু'দিনেই কেমন করে ফেঁপে উঠে, তার মূর্ত্তিমান একটা ছবি মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখায় মনোনিবেশ করলাম।

www.pathagar.com

দু'পাশেই ঝাড়-জঙ্গল আর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী; তারি মাঝখান দিয়ে গাড়ী চলেছে উর্দ্ধশ্বাসে ধূয়া উদগীরণ করতে করতে। স্থানে স্থানে পর্বতের পাদদেশে বহু নিম্নে জঙ্গলাকীর্ণ এক-একটা উপত্যকাও নজরে পড়ে। এক একবার মনে হয়, বুঝিবা পথভ্রষ্ট হয়ে আমাদের সবাইকে বুকে করে নিয়ে গাড়ীখানা সুদূর নিম্নের সেই উপত্যকায় গিয়ে মাথা গুজতে চাইছে। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। পরক্ষণেই পর্ব্বত-শীর্ষে তুলা-পেশা সাদা মেঘের খেলা দেখে মন স্বতঃই বহু উর্দ্ধে সুদূর কল্পলোকে গিয়ে পৌঁছে।

দু'পাশের এই অপরূপ স্বভাব-শোভা দেখে এক-একবার মনে পড়ছিল, বাঙলা মায়ের শ্যামল আঁচলের স্মৃতি। বাঙলা দেশে রেল-গাড়ীতে চেপে কোথাও যেতে হলে দু'পাশে যেমন ঢেউ-খেলানো হরিৎ মাঠের শোভা দেখা যায়, তেমনটি কোথাও চোখে পড়ল না। "এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে" বাঙালী কবির এই উক্তি যে কতটা সত্য, গমু থেকে গয়া পর্যন্ত সারাটা পথেই তার পরিচয় পেলাম। রাস্তার দু'পাশে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও ঝাড়-জঙ্গল আর পাহাড় পর্বত ছাড়া শ্যামল একটু ভুখন্ড নজরে পড়ল না।

পশ্চিমাকাশে আগুন জ্বেলে দিয়ে সূর্য যখন এক দিনের সফর শেষ করে বিদায় নেবার উপক্রম করছিল, ঠিক সেই সময়ে গয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। গাড়ী থেকে নেমে সদয়-হৃদয় গার্ড সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইন্টার ক্লাশের যুগল বেয়ারিং যাত্রী আমরা প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের পথ ধরলাম। পথ চলতে চলতে ভাবছিলাম, হিন্দুরা আসে গয়ায় পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডি দিতে, কিন্তু আমরা এসেছি কার পিণ্ডি চটকাতে-নিজের, না অপর কারো?

www.pathagar.com

সপ্তম মঞ্জিল

গয়া হিন্দুদের পৌরানিক কেচ্ছাকাহিনীর অন্যতম লীলাক্ষেত্র। গয়া নামক কোন এক অসুরের পায়ের ছাপ নাকি এই স্থানে রক্ষিত আছে। এখানে এসে যে কেউ মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে, তার সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাকি নরক-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবে- হিন্দু সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মনেই এই ধরণের একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে বিরাজ করছে। তাই প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র হিন্দু এই কাল্পনিক অসুর পুঙ্গবের পায়ের তলে এসে পিতৃ-পুরুষের পাপভার লাঘবের প্রয়াস পেয়ে থাকে। তা'ছাড়া, ব্রহ্ম এবং চীন জাপান থেকে অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও প্রতি বৎসর এই তীর্থ ভূমিতে এসে সমবেত হয়। বুদ্ধদেব এই গায়েরই বোধি-বৃক্ষের তলে সাধনায় দিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস এবং এই জন্যেই তারা বুদ্ধ-গয়ায় এসে বুদ্ধদেবের সাধন ক্ষেত্রটা জেয়ারৎ করে যায়। তাই গয়া হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই উভয় জাতিরই তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুই জাতির তীর্থভূমি যে স্থানটা, সেখানে পা দিয়েই নানারূপ অপরূপ লীলার অভিনয় দেখতে পাব বলে পূর্ব থেকেই সন্দেহ করেছিলাম; কিন্তু কার্যকালে সেরূপ কিছু আদৌ দেখা গেল না। স্টেশনে পাণ্ডাদের জুলুমবাজী বা রাজপথের আশে-পাশে পুতুল-প্রতিমার ছড়াছড়ি এ সব কিছুই নজরে পড়ল না। স্টেশন থেকে সোজাসুজি আমরা শহরের জোমা মসজিদে গিয়ে পৌছলাম।

তখনও মগরেবের নামাজ শেষ হয়নি। সুতরাং মসজিদে পৌছেই সর্বপ্রথমে আমরা নামাজটা সেরে নিলাম। নামাজ-অন্তে মসজিদেরই গেটে অবস্থিত হোটেলে গিয়ে আহার করে দীর্ঘ ভ্রমণের পর উদর রাক্ষসীর কিঞ্চিৎ সন্তুষ্টি সাধন করলাম। তারপর এশার নামাজ সেরে নিয়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে মসজিদেরই বারান্দায় এলিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে মোয়াজ্জিনের আজান-ধ্বনিতে জেগে উঠে ফজরের নামাজ অন্তে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বলতে গেলে দেখবার মতো কিছুই নেই গয়ায়। যেখানে হিন্দুদের সব মন্দির অবস্থিত, সে জায়গাটা শহর থেকে বাইরে বল্লেই চলে- বৌদ্ধদের বুদ্ধ-গয়া আরো দূরে। কতকগুলি পুতুল প্রতিমূর্তি দেখবার জন্যে তকলিফ করে এতটা পথ যাওয়া আমরা আদৌ প্রয়োজন মনে করলাম না। সুতরাং বুদ্ধ গয়া বা হিন্দুদের "গয়াধাম" দেখা আমাদের আর হয়ে উঠল না। শহরের এ গলি সে-গলি, এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে বিকেল প্রায় তিনটের সময় মসজিদে ফিরে সেদিনই গয়া ত্যাগ করার সংকল্প করলাম।

www.pathagar.com

স্টেশনে গিয়ে এক বার্মিজ দম্পত্তির সাথে দেখা হলো। তাঁরা বুদ্ধগয়া দেখতে এসেছিলেন, দর্শন সমাপন এবং পূণ্যার্জন করে প্রয়াগ ধামে যাচ্ছেন। উর্দু, হিন্দি বা ইংরাজী কোন ভাষাই জানেন না তারা। টিকেট করতে গিয়ে বেজায় বিপদে পড়ে পুরুষটি এসে শেষে আমার শরণাপন্ন হলেন। আকার ইঙ্গিতে তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রয়াগে যাবার টিকেট কিনতে হবে তাঁদের; কিন্তু স্টেশন মাস্টার কিছুতেই তাঁর কথা বুঝতে পারছেন না। শুনে লোকটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দু'খানা ইন্টার ক্লাসের টিকেট কিনে দিলাম। দম্পতি চোখের ভঙ্গীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

প্লাটফর্মে ঢুকে সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই গাড়ী এলে সকল যাত্রীর সাথে আমরাও গাড়ীতে চেপে বসলাম এবং T.T.C বা অন্য কোন রকম আপদ-বালাইয়ের সম্মুখীন না হয়ে পরদিন প্রাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে মোগল সরাই জংশনে গিয়ে অবতরণ করলাম। গয়া থেকে মোগল-সরাই পর্যন্ত সমগ্রটা পথের মাঝে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য একমাত্র শোন-নদীর বিরাট পুল এবং সাসারামে পাঠান সম্রাট অদ্ভুতকর্ম্মা শের শার সমাধি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। শোনের পুলের মতো এত বড় পুল সারা পাক-ভারত উপমহাদেশে আর আছে কিনা সন্দেহ; কিন্তু তথাপি পুলটার বিরাটত্ব কিছুতেই হৃদয় আকর্ষণ করতে পারে না। দেখলাম, নদীর উপর পুল রয়েছে বটে, কিন্তু নদীর মধ্যে কেবলমাত্র বালুচর ছাড়া পানির নাম গন্ধও নেই-নদীর মাঝখান দিয়ে দস্তুর মতো গরুর গাড়ী চলছে। বর্ষার সময় এই নদীতেই দু'কূল ভাঙ্গা বান ডাকে বলে শোনা গেল। মরা নদীর এ বানডাকার দৃশ্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর হবে, সন্দেহ নেই।

সাসারামে সম্রাট শের শা'র সমাধি স্টেশনের অদূরেই অবস্থিত। এ সমাধি সৌধ বাস্ত বিকই একটা জীবন্ত প্রতিভার প্রতীক। অতি সামান্য অবস্থা থেকেও সাধনা বলে মানুষ কেমন করে উন্নতির সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে, শের শা'র সমাধি যেন মানুষকে যুগযুগান্তর ধরে তাই বুঝাবার চেষ্টা করছে। গাড়ীতে বসে সাসারাম অতিক্রম করার সময় শের শা'র এই জীবনের বাণীই যেন কর্ণে ধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। এ বাণী যেন সমগ্র জগতকে আহ্বান করে জানাচ্ছিল, "অসাধ্য বলে দুনিয়ায় কিছু নেই; মানুষ চেষ্টা করলে সবকিছুই করতে পারে। সাধনা বিমুখ আমাদের কুম্ভকর্ণ সমাজের কানে এ জীবনের বাণী যে কত দিনে গিয়ে পৌঁছবে, তা কে বলবে।

যখন মোগল-সরাইয়ে গিয়ে পৌঁছলাম, প্রভাতী সুর্যের সোনালী কিরনচ্ছটা তখন সবে মাত্র পৃথিবীকে ধুইয়ে দেওয়া শুরু করেছে। গাড়ী থেকে নেমেই প্লাটফর্মের বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য এদিক সেদিক ঘুরে জায়গাটা দেখে নিলাম। ছোট্ট শহর-দেখবার মতো বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হলো না। একটা চা খানায় বসে লোক জনের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম-বেনারসে যেতে হলো মোগল সরাই থেকেই নাকি যেতে

www.pathagar.com

হয়; আট মাইল পথ-রেলে যাওয়া যায়, আবার মোটর বা ঘোড়ার গাড়ীও আছে। ভাবতে লাগলাম, কি করি-বেনারসে গিয়ে হিন্দুদের "বাবা বিশ্বনাথের" মন্দির দর্শন করাই সঙ্গত, না যে পথ ধরে চলেছি, সোজা সে পথে এলাহাবাদ পর্যন্তই পাড়ি জমাব।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে শেষে বেনারস যাওয়াটাই আপাততঃ স্থগিত রেখে, পরবর্তী গাড়ীতে সোজা এলাহাবাদ যাওয়ারই মতলব করলাম। বাজার থেকে স্টেশনে ফিরে এসে সন্ধান করে জানতে পারলাম, এলাহাবাদের গাড়ীর নাকি আর বেশী দেরী নেই। সুতরাং প্ল্যাটফর্মে বসে সিগারেট ফুকতে ফুকতে গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এলে মফিজ এবং আমি দু'জনাই যাত্রীদের উঠা-নামার ভীড়ের মধ্যে একখানা থার্ড-ক্লাস কামরায় চেপে বসলাম।

গাড়ীতে চেপে একটা ফেরীওয়ালার কাছে যেরূপভাবে ঠকেছিলাম, আজো তা ভুলতে পারি নি। পান সিগারেটওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, রুটীওয়ালা প্রভৃতি নানান রকমের ফেরীওয়ালার মাঝে একটা লোক এক ঝুড়ি বড় বড় কুল নিয়ে "বাবু, কাশীর কুল- চাই কাশীর কুল" বলে চীৎকার করছিল। ছেলে বেলা থেকেই কাশীর কুলের তারিফ শুনেছিলাম; আর কুলগুলি দেখতেও ছিল বেশ বড় বড়। সুতরাং জিবের পানি সামলাতে না পেরে শেষে কুলওয়ালাকে কাছে ডেকে দাম দর ঠিক করে তার কাছ থেকে এক আনায় এক কুড়ি কুল কিনলাম। কুলগুলি গুনে নিয়ে যেই একটা সিকি ফেরীওয়ালার হাতে দিয়েছি, অমনি গাড়ী দিল ছেড়ে। বাকী তিন আনা পয়সা ফেরীওয়ালার কাছ থেকে আর নেওয়া হয়ে উঠল না। বোকা বনে গিয়ে শেষে মনকে এই বলেই প্রবোধ দিতে হলো যে, কাশীর কুল এক কুড়ি চার আনায়ই বিকায়।

মোগল-সরাই থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের মাঝে দ্রষ্টব্য স্থান প্রধানতঃ চূনার, মীর্জাপুর আর নাইনী। কিন্তু এসব জায়গার কোনটায়ই নামা হয়ে উঠল না। চুনার জায়গাটা দিনের বেলায় অতিক্রম করেছিলাম, কিন্তু বাকী দুটো শহর রাতের আঁধারের মাঝে কখন যে শোঁ করে গাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল, তা জানতেও পারি নি। চূনারে সম্রাট শের শা'র আমলের বহু পুরাতন ঐতিহাসিক কেল্লাটা এখনও অতীতের সাক্ষীরূপে অক্ষত দেহেই দাঁড়িয়ে আছে। এই কেল্লা দেখবার জন্যে সখের ভ্রমণকারীরা নানা দেশ থেকে দলে দলে চুনারে গিয়ে থাকেন। কিন্তু ছন্নছাড়া ভ্যাগাবণ্ড মুসাফির আমরা আমাদের ভাগ্য সখের ভ্রমণকারীদের মতো আদৌ নয়। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা যাদের পকেটে লালবাতি জ্বলছে, যাদের পেটে হয়ত একাদিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত এক মুষ্ঠি দানাও পড়ে না, রেলগাড়ীতে যারা বাধ্য হয়েই বেয়ারিং যাত্রী সেজে সুদূরের পথে পাড়ি জমায়, তাদের পক্ষে সখ মেটাবার জন্যে যেখানে-সেখানে নেমে পড়া আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং ইচছা থাকা সত্ত্বেও চুনারে নেমে সম্রাট শের শার কীর্তিটা দেখে যেতে পারলাম না।

www.pathagar.com

এলাহাবাদ পৌছেছিলাম-বোধ হয় শেষ রাত্তিরে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বাকী রাতটুকু সেখানেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকাল বেলা নাশতা করে শহরের দিকে পা বাড়ালাম। বেলা প্রায় আটটার সময় শহরের জোমা মসজিদে পৌছে দেখতে পেলাম-মসজিদের সঙ্গে বিরাট এক মাদ্রাসাও রয়েছে। মাদ্রাসার একটা ছেলের সঙ্গে ভাব করে দুপুর বেলার খাবারটা সেখানেই যোগাড় করে নিলাম। জোহর এবং আসরের নামাজটা জো'মা মসজিদে সেরে নিয়ে অতঃপর শহর দেখতে বেরুলাম।

এলাহাবাদ বিরাট শহর। ঘুরতে ঘুরতে মগরেবের সময় একটা বড় মসজিদ দেখে সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম, এমন বিরাটকায় মসজিদে দুটো ভুখা মুসাফিরের খাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অতি অনায়াসে হয়ে যাবে। কিন্তু নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েই সকল মুসুল্লীর নামাজের তরকীব দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো। দেখলাম, মুসুল্লীদের মধ্যে একজনও তহরিমা বাঁধলেন না এবং সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় নামাজ শেষ করলেন। ব্যাপার কি বুঝতে পেরে, নামাজ হয়ে গেলে পর জনৈক মুসল্লীকে তা জিজ্ঞাসা করলাম। মুসুল্লী সাহেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কোন জাতীয় লোক।" আমরা মুসলমান, এ কথা তাকে জানালে পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন জাতীয় মুসলমান-অর্থাৎ কোন মজহাবের লোক?" সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদিগকে নিজেদের মজহাবের সন্ধানটাও দিতে হলো। শুনে মুসুল্লী সাহেব মুখখানা বিকৃত করে জানালেন, তারা সব্বাই শিয়া মতাবলম্বী মুসলমান এবং তাঁদের মসজিদে অন্য কোন মজহাবের লোকের থাকার জায়গা হতে পারে না। সুতরাং রাত প্রায় আটটার সময় আমাদিগকে আবার অসহায় অবস্থায় পথে বেরিয়ে পড়তে হলো।

অপরিচিত শহরে এত রাত্তিরে যাই কোথায়, তাই ভেবে প্রথমতঃ বিব্রত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হতভাগ্য সমাজের মজহাবী দলাদলির কথাও ভাবছিলাম। সাম্য-মৈত্রী মন্ত্রের সাধক মুসলমান বলে আত্ম-পরিচয় দিয়েও যারা "শিয়া" নই বলে আমাদের মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, তারা জাতহীন ইসলামে জাতিভেদের আমদানী করে কিরূপে ধর্মের নামে ক্রমাগত অধর্মেরই প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, তাই ভেবে মন বেজায় ব্যথা বেজে উঠল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর রাত প্রায় ন'টার সময় আবার জোমা মসজিদেই ফিরে গেলাম এবং সেখানেই শুয়ে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার বেরুলাম শহর দেখতে। হাইকোর্ট, ইউনিভারসিটি এবং নানারূপ অফিস আদালত দেখে সারাদিন পথে-পথে ঘুরে কাটালাম। বিকালের দিকে শহরের পূর্ব প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত ক্ষুদ্র একটা মসজিদে উপস্থিত হয়ে সেখানেই মগরেবের নামাজ শেষ করলাম। অতঃপর জনৈক সহৃদয় মুসল্লীদের দাওয়াতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে খুব আচ্ছা করে গোশত

www.pathagar.com

রুটির সদ্ব্যবহার করতঃ মসজিদে ফিরে সেখানেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রেল-স্টেশনে গিয়ে আগ্রার গাড়ীতে চেপে বসলাম।

দু'দিন এলাহাবাদ থেকে যা কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখেছিলাম, তার মধ্যে রেলের বিরাট পুলটির স্মৃতি আজো ভুলতে পারি নি। সারা পাক-ভারতে বড়-বড় রেলওয়ে সেতু আরো অনেক আছে সত্যি; কিন্তু এলাহাবাদের এ পুলটির মত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটাও নয়। পুলটি দ্বিতল। উপরের তল দিয়ে রেলগাড়ী যাতায়াত করে; আর নিম্নতল দিয়ে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর এবং লোকজন যাতায়াত করে। রেলে চেপে পুলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নীচের দিকে চাইলে নদী-স্রোতের উপর ভাসমান নৌকা-স্টীমার, তার উপর পুলের নিম্নতলে পথিকদের আনা-গোনা এবং গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় বড় সুন্দর দেখায়।

দু'পাশের পার্বত্য ভূমি ভেদ করে ট্রেন অতি দ্রুত সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা দুই ভ্যাগাবণ্ড গাড়ীতে বসে বসে অতীত স্মৃতির ফিল্ম তৈরি করে যাচিছলাম। অতীতের শত ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের ছবি বায়স্কোপের ফিল্মের মতোই মনের পর্দায় একটার পর একটা করে ক্রমে প্রতিফলিত হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল, সুখ-নীড় বাড়ীর কথা, মায়ের স্নেহাঞ্চলের কথা, আবার বাৎসল্যের কথা, ভাই-বোনদের ভালবাসার কথা। সাময়িক উত্তোজনা বশে গৃহের সব সুখ-শান্তি ছেড়ে অজানা পথে বেরিয়ে পড়া যে কত বড় একটা বিরাট ভুল হয়েছিল তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এ ভুলের সংশোধনের কোনো উপায়ই তখন আর ছিল না। যে একবার ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে, তার পক্ষে সম্ভবপর হলেও আমার মতো বেদুঈন প্রকৃতির ছেলের পক্ষে তা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং অতীত স্মৃতির সকল ব্যথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখ বের করে বাইরের দৃশ্য দেখায়ই মনোনিবেশন করলাম।

এলাহাবাদ থেকে টুণ্ডলা জংশন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ একই গাড়ীতে বিনা বাধায় অতিক্রম করে পরদিন শেষ রাত্রে গিয়ে টুন্ডলায় নামলাম। এই দীর্ঘ পথের মাঝে কানপুর, ইটোয়া, শিকোহাবাদ-এই কয়টি জায়গাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কিন্তু রেল-কোম্পানীর বেয়ারিং যাত্রী বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো জায়গায়ই গাড়ী থেকে নামিনি। বিশেষতঃ কানপুর শহরটা অতিক্রম করতে হয়েছিল গভীর রাত্রে।

রাত প্রায় তিনটার সময় টুন্ডলায় পৌঁছে কাপড় বিছিয়ে প্লাটফর্মেই শুয়ে পড়লাম। আগ্রাগামী আরো অনেক যাত্রী আমাদের আশে-পাশে স্থান করে নিয়ে প্লাটফর্মটাকে দস্তুর মতো মুসাফিরখানায় পরিণত করে তুলেছিল। নানা রকম যাত্রীর এই ভীড়ের মধ্যে শুয়েও অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার আবেশ হলো এবং নবাবী চালে নাক ডাকতে শুরু করলাম। প্রভাতের দিকে প্রায় ছ'টার সময় কুলীদের হাঁক-ডাকে ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠে শুনতে পেলাম একটা কুলী চিৎকার করে বলছে, "এয়ো, আগরা জানেওয়ালা, ওঠো-গাড়ী তৈয়ার

www.pathagar.com

হ্যায়।" দাম্পত্য-প্রেমের অক্ষয় বিজয়স্তম্ভ "তাজমহলের" নগরী, মোগল বাদশাহদের বহুদিনের রাজধানী আগ্রার নামে হৃদয়ে যেন নবীন উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে গাড়ীতে গিয়ে চাপলাম।

প্রাতে প্রায় সাতটার সময় টুন্ডলা থেকে গাড়ী ছাড়লে আধ ঘন্টার মধ্যেই "যমুনা-ব্রীজ" স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রভাতী সূর্যের সোনালী কিরণচ্ছটা তখন সবেমাত্র দিগন্তের কোলে ঝিলিক মেরে উঠছে। যমুনার পুলের উপর গাড়ী উঠলে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম, নদীর অপর পাড়ে শাজাহানের প্রেমের স্বপ্ন মর্মরে মূর্ত হয়ে স্বপ্নের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর মধ্যে এই সময়ে অকস্মাৎ যেন অজানা কোন রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে নবীন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। যাত্রীরা একে অপরকে সম্বোধন করে নদী-পাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখাচ্ছিল, -ওই দেখা যায় "তাজমহল"। প্রাসাদ-রাণী "তাজ" সত্যিই মোর্দার প্রাণেও নব-জীবনের স্পন্দন জাগাতে পারে।

নদী পেরিয়ে সামান্য একটু দূরে গিয়ে "আগরা ফোর্ট" ষ্টেশন-শাহজাহানের কেল্লার পাশেই অবস্থিত। "ফোর্ট" স্টেশনে গাড়ী থামলে পর আমি আর মফিজ-দুই ভ্রাম্যমান পথিক-অন্যান্য সকল যাত্রীর সাথে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে প্রথমে কেল্লার সামনে গিয়ে দু'চার মিনিট পায়চারী করে সোজা তাজগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলাম। শহরের যে অংশে "তাজমহল" অবস্থিত, তার নাম "তাজগঞ্জ"।

স্টেশনের বাইরে অনেকগুলি ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী আর এক্কা যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এক এক্কাওয়ালা আমাদের সামনে এসে আবদার ধরল, তার গাড়ীতে করে আমাদের তাজাগঞ্জে যেতে হবে। যাতে আমরা ভাল করে "তাজ" দেখতে পারি, এক্কাওয়ালা তার ব্যবস্থা করে দেওয়ারও লোভ দেখাল। হাসি পেল। ছন্নছাড়া দু'টি বুভুক্ষু মুসাফিরের পক্ষে এক্কায় চেপে "তাজমহল" দেখতে যাওয়া যে কিছুতেই সম্ভবপর নয়, বেচারা এক্কাওয়ালাকে তা বুঝিয়ে বলে আমরা খোদার দেওয়া পা' দু'খানাকে সামনে বাড়ালাম। ভিক্টোরিয়া পার্কের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ তাজগঞ্জ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পার্কটি বেশ সুন্দর-মাঝখানে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক মর্মর মূর্তি দণ্ডায়মান। পথ চলতে চলতে পার্কের মাঝখানে এক জায়গায় একটা বেঞ্চিতে বসে আধঘন্টা খানেক বিশ্রাম করে নিলাম। তারপর আবার চলা শুরু করে বেলা প্রায় দশটার সময় তাজের দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট সিংহদ্বার। গুনে দেখলাম, মাথায় ছোট-ছোট এগারটা গম্বুজ ধারণ করে লাল রঙের Sand-stone-এ নির্মিত এই বিরাটকায় সিংহদ্বার তাজমহল বাগানের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করছে। এই দরজাটাই তাজমহলের প্রধান ফটক। ফটকের দুই পার্শ্বে পূর্ব ও পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত চকমিলান এমারত। বাগানের পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্ত সীমায়ও অনুরূপ লাল-পাথরের চকমিলান গৃহরাজি। মোটের উপর, মধ্যস্থলে চতুষ্কোনাকৃতি বাগান রেখে,

www.pathagar.com

তার তিন পাশ ঘিরেই চক-মিলান এমারত তৈরি করা হয়েছে। বাগানের উত্তর প্রান্তে প্রাসাদ-রাণী "তাজ" অবস্থিত। সিংহদ্বারের ভেতরে দাঁড়িয়ে সোজা উত্তর দিকে নজর করলে বিস্তীর্ণ বাগানের উত্তর প্রান্ত-সীমায় দণ্ডায়মান "তাজকে" একখানা ছবির মতোই মনে হয়।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করে বাগানের মাঝখান দিয়ে নির্মিত সুদৃশ্য পথে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। পথের দু'পাশে পানির নহরে কৃত্রিম ফোয়ারার খেলা বড় মনোরম। নহরের দু'পাশ দিয়ে আবার সারি সারি চন্দন গাছের কেয়ারী করা রয়েছে। মোটের উপর, বাগানটা এমন সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যে, তাজমহল দেখতে গিয়ে প্রথমে বাগানের শোভায়ই মুগ্ধ হতে হয়।

বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে শ্বেত মর্মরে নির্মিত অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি হাওজ বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাওজের কিনারায় রক্ষিত মার্বেলাসনে বসে কিছুক্ষণ পর্যন্ত নানারূপ মাছের খেলা দেখলাম। তারপর আবার দু'পাশের নহরের মাঝখান দিয়ে খানিকটা পথ চলার পর আসল "তাজের" ভিত্তি-ভূমির পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম।

রক্ত প্রস্তরে নির্মিত বিরাট চত্তরের উপর একতলা পরিমাণ উঁচু তাজের ভিত্তি। এই ভিত্তি-ভূমিতে উঠবার সিঁড়িটা বেশ কায়দা করে তৈরি হয়েছে। ভিত্তির ঠিক দক্ষিণ প্রান্তে কেন্দ্রস্থলে দু'পাশ থেকে সুড়ঙ্গের মতো করে সিঁড়ি নির্মিত। আমরা পূব পাশের সিঁড়ি দিয়ে উর্ধে উঠে উত্তর মুখ হয়ে দাঁড়াতেই প্রেমিক সম্রাট শাহজাহানের মর্মরীভূত স্বপ্ন তাজকে গরীয়ান অবস্থায় সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। মুগ্ধ হয়ে যেখানে ছিলাম সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পর চমক ভাঙলে আস্তে-আস্তে সামনে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ পাশের বিরাট দরজার মধ্য দিয়ে আমরা তাজের ভিতরে প্রবিষ্ট হলাম। প্রধান গম্বুজের নিম্নে অবস্থিত মধ্যবর্তী হলের ঠিক মাঝখানে শ্বেত-মর্মরে নির্মিত সুক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত জাফরীর মধ্যে সুদৃশ্য যুগল সমাধি-যেন শাহজাহান আর মমতাজ পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনন্ত নিদ্রায় বিভোর। শাহজাহানের সমাধি পশ্চিম পাশে মমতাজের পূবে। উভয় সমাধি নানারূপ বহুমূল্য

প্রস্তর ও হীরা-জহরতের কারুকার্য্য খচিত। সমাধি-যুগলের মার্বেল-বেষ্টনী ও অনুরূপ কারুকার্য ভূষিত। তা ছাড়া, গম্বুজের ভিতরের দিক এবং হলের চার পাশের দেওয়ালগুলির কারুকার্য্যও বিস্ময়কর। মাঝখানের বড় গম্বুজটা ছাড়া চার কোনের ছোট চারটা গম্বুজও নানারূপ সুক্ষ্ম কারুকার্য্যে শোভিত।

সমাধি যুগল দর্শনের পর চারদিক ঘুরে চার কোণের ছোট চারটি প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করে, আমরা আসল কবর দেখবার জন্যে একজন গাইড সঙ্গে করে একটা হারিকেন ল্যাম্পসহ সুড়ঙ্গ পথে নিম্নে অবতরণ করলাম। উপরের কবর যুগল যে নিম্নস্থ আসল কবরের ঠিক

www.pathagar.com

উপরে নকল প্রতিকৃতি মাত্র, নিম্নে গিয়েই আমরা তা বুঝতে পারলাম। একটা কারুকার্য্যবিহীন গোলাকার অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মাঝে আসল কবরদ্বয় অতি সাদাসিধাভাবে অবস্থিত। দেখলেই মনে হয়, জগতের সকল কল-কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাদশাহ বেগম নির্জন সমাধির বুকে গভীর সাধনায়ই যেন নিমগ্ন আছেন। আমরা সমাধি যুগলের পাশে দাঁড়িয়ে "ফাতেহা" পাঠ করে উপরে উঠে এলাম এবং পেটে দস্তুরমত আগুন জ্বলে উঠছে দেখে পুণরায় এসে তাজের বাকী অন্যান্য অংশ দেখব মনে করে খাবার সন্ধানে শহরের দিকে যাত্রা করলাম।

"তাজমহল" থেকে বেরিয়ে তাজের পূর্বদিকে সামান্য একটু দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার এক মসজিদে গিয়ে প্রথমে জোহরের নামাজটা শেষ করে নিলাম। অতঃপর বুভুক্ষু দুই মুসাফির অন্ন সমস্যার সমাধানের আশায় পথে বেরিয়ে পড়লাম।

"তাজগঞ্জের" এক সমৃদ্ধিশালী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিল সেদিন বিয়ে। প্রকাণ্ড বাড়িটা অতিথি অভ্যাগতদের কলরবে এবং উৎসবের আনন্দে একেবারে সরগরম হয়েছিল। আমরা বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়াতেই এক সুসজ্জিত যুবক এসে অতি সমাদরে আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে খানার মজলিসে বসিয়ে দিলেন। তারপর বিরিয়ানী পোলাও, জর্দা ও ফিন্নির ছড়াছড়ি। মাত্র কয় মিনিট পূর্বে যে দু'টি হতভাগা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে হ্যাংলা কুকুরের মতোই পথে পথে ঘুরে মরছিল, বিশ্ব-মালেক খোদা তাদের সামনে এনে হাজির করলেন একেবারে শাহী খানা। খেতে বসে রেজেকের মালিক খোদার অফুরন্ত করুণার কথা মনে করে স্বতঃই শোকরিয়ায় মাথা অবনত হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম, সত্যি কত করুণাময় খোদা-তিনি মানুষকে কিরূপ কৌশলেই না আহার যোগিয়ে আসছেন। খাওয়া শেষ হলে পর বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার "তাজমহল" বাগানে গিয়ে ঢুকলাম। খাস তাজের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ চারদিকে পায়চারী করে নিয়ে অতঃপর তাজের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মসজিদটি দেখার জন্যে গমন করলাম। দিল্লীর জোমা সমজিদের আদর্শেই এই মসজিদটিও রক্তবর্ণ Sand-stoneএ নির্মিত হয়েছে। বিরাট তিনটি গম্বুজে শোভিত প্রকাণ্ড মসজিদ। আজকাল এই মসজিদে নামাজ খুব কমই হয়ে থাকে; কিন্তু তথাপি মসজিদটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে দেখা গেলো।

মসজিদের উত্তর প্রান্ত-সীমায় একটি কুঠরী থেকে সুড়ঙ্গের মতো একটা পথ নিম্নদিকে চলে গিয়েছে দেখে তার ভেতরে কী আছে জানার জন্যে আমার বেজায় কৌতূহল হলো। কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা না করেই আমি ভেতরে যাওয়ার উপক্রম করলাম। মফিজ এ সময় বাধা দিয়ে বল্ল, সুড়ঙ্গের ভেতরে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়; কারণ সেখানে সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি নাকি থাকতে পারে। কিন্তু অজ্ঞাতের সন্ধানে যে অফুরন্ত আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দেরই প্রেরণায় অধীর হয়ে মফিজের কথা কানে না তুলে আমি সম্পূর্ণ বে-পরওয়াভাবে

www.pathagar.com

সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং মিনিট দুই পথ চলার পরই একটা কাষ্ঠ নির্মিত কপাটের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দুই-তিন আনা দামের একটা বাজে মার্কা তালা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করা রয়েছে। দরজা বন্ধ থাকলেও কপাটটা অনেক দিনের পুরানো বলে তার ফাঁক দিয়ে অপর পার্শ্বের সব কিছু বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখে বিস্মিত হলাম, সামনে বহুদূর পর্যন্ত বালুচর বিস্তৃত এবং যমুনার ঢেউগুলি এসে সেই বালুকারাশিতে আছড়ে পড়ছে। বুঝতে পারলাম, যমুনার নীল জলে ওজু করার জন্যেই সুড়ঙ্গের আকারে এই ঘাটটি নির্মিত হয়েছিল। এখন যমুনার গতিপথ "তাজমহল" থেকে একটু দূরে সরে যাওয়ায়ই সুড়ঙ্গ ঘাটটি অকেজো হয়ে গেছে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যেই তালা দিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রায় দশ মিনিট কাল রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে যমুনার নীল জলের খেলা দেখে সম্পূর্ণ নিরাপদে সুড়ঙ্গ পথে আবার উপরে উঠে এলাম-কোথাও সাপ-বিচ্ছু বা ও রকম কোনো কিছুর পাল্লায় পড়তে হলো না। সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে উপরে উঠতেই মফিজ চীৎকার করে বলে উঠল, "কী দূর্ধর্ষ ছেলে, বাবা। তুমি পাতাল-পুরীতে গিয়ে দিব্যি আরামে মজা লুটছিলে আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভেবে মরছি।" হেসে মফিজকে ব্যাপারটা সব খুলে বল্লাম এবং তাকে সঙ্গে করে আবার সুড়ঙ্গের ভেতরে গিয়ে যমুনার বালুচর দেখিয়ে উপরে ফিরে এলাম।

আসরের নামাজের সময় হয়ে এসেছে দেখে অতঃপর আমরা দুই মুসাফির মসজিদের মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজটা সেরে নিলাম। নামাজ পড়তে পড়তে মনে পড়ছিল, মসজিদের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমরা নামাজ পড়ছি, ঠিক সেইখানটায়ই হয়ত বা শাহানশাহ শাহজাহান ও আলমগীরের পদরেণু মিশে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে মুসলিম গৌরব-যুগের উজ্জ্বল ছবিটা মনের দর্পণে পূর্ণ প্রভায় প্রতিফলিত হয়ে উঠল। ভাবলাম, কী ছিলাম আমরা, আর আজ কী হয়েছি এবং ভবিষ্যতেই বা কী হতে চলেছি।

নামাজ সেরে নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে "তাজের" ঠিক পূব পাশে অবস্থিত-পশ্চিম পাশের মসজিদটির অবিকল প্রতিকৃতি রূপে নির্মিত তসবিহখানা দেখতে গেলাম। পশ্চিম পাশে মসজিদ তৈরি হওয়ার পর পূব পার্শ্বটি একেবারে খালি থাকলে দেখতে নেহায়েত অশোভন ঠেকবে বলেই, ঠিক মসজিদটির মতো করে এই তসবিহখানা মুসল্লীদের কোরআন তেলোয়াত ও অন্য রকম এবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। দেখলাম, এই গৃহেরও উত্তর প্রান্ত সীমায় এক কুঠরী থেকে একটা সুড়ঙ্গ পথ যমুনার বালুচরে গিয়ে মিশেছে।

তসবিহখানা দেখার পর রক্ত-প্রস্তর নির্মিত চত্তরটার উপর পায়চারী করতে করতে "তাজের" দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত মীনারটির পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, কোলকাতার অকটারলোনী মনুমেন্টের সিঁড়ির মতোই মীনারের ভেতরেও ঘুরানো সিঁড়ি

www.pathagar.com

উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। ইচ্ছা হলো, সুউচ্চ মীনারের উপরে উঠে চারদিকের প্রকৃতিটা একবার দেখেনি। এবারও মফিজ বাধা দিল। ভীরুপ্রকৃতির এই ছেলেটি আকাশ-চুম্বী মীনারের মাথায় চাপতে কিছুতেই রাজী হলো না। শেষে একা-একাই আমায় মীনারের সিঁড়িগুলি বেয়ে উপরে উঠতে হলো।

তেতলা মীনার। প্রায় শ'খানেক ধাপ বেয়ে মীনারের দ্বিতলে উঠেই দেখি আশ্চর্য ব্যাপার- "মান্না" ও "সলওয়ার" মতোই বেহেশতী খানা সামনে মউজুদ। বিরাট এক ঠোঙ্গাভরা নানা রকম মিঠাই দ্বিতলের বারান্দার রেলিঙের পার্শ্বে রক্ষিত ছিল। বুঝতে পারলাম, কোনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকই হয়ত মানত-করা মিঠাই এরূপভাবে রেখে গিয়ে থাকবে। অজানা সেই মানতকারী যে দেবতার উদ্দেশ্যেই মিঠাইগুলি রেখে গিয়ে থাকুক না কেন, সামনে তা দেখতে পেয়ে আমার আর জিবের পানি বাধ মানছিল না। সুতরাং আপাততঃ আমিই মানতকারীর উদ্দিষ্ট দেবতা সেজে ভোগের নৈবিদ্যি গোগ্রাসে উদরস্থ করতে লাগলাম। আশা মিটিয়ে কিছু মিঠাই খেয়ে নিয়ে অতঃপর রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে মফিজকে কাপড় পাততে বল্লাম এবং বাকী সবগুলি মিঠাই ঠোঙ্গাসহ নীচে তার কাপড়ে ফেলে দিলাম। মফিজও এই অপ্রত্যাশিত বেহেশতী খানা পেয়ে পরম আহ্লাদিত হলো।

অতঃপর মীনারের ত্রিতলে আরোহণ করলাম। মীনারের উপর থেকে বহুদূর পর্যন্ত আগ্রার চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম দেখায়। সবচেয়ে সুন্দর দেখায়-তাজমহল-বাগানের দৃশ্যটা। মনে হয়, একখানা সুন্দর কারুকার্য খচিত প্রকাণ্ড গালিচা যেন অনেকটা জায়গা জুড়ে পেতে রাখা হয়েছে। বৈকালিক সূর্যের রশ্মিচ্ছটায় ঝলসিত তাজের গম্বুজটির শোভাও বড় মনোরম। মীনারের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই অপরূপ শোভা দেখলাম। প্রেমিক সম্রাট শাহজাহানকে লক্ষ্য করে কবির ভাষায় তখন সত্যি বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল ঃ

"হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব-মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত।
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া।"

মীনার থেকে নেমে আবার আসল তাজের ভেতরে গেলাম এবং পুনরায় বাদশাহ বেগমের কবর জেয়ারত করে, ঘুরতে ঘুরতে তাজের উত্তর দিকে ভিত্তিভূমির উপরেই যমুনার কূলে গিয়ে দেখতে পেলাম নিম্নে একটা গুপ্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে; মুখের ঢাকনীটা খোলা থাকায়

www.pathagar.com

ভেতরটা বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম, "তাজের" চারদিক ঘিরে নাকি এরূপ আরো কয়েকটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। কোন উদ্দেশ্যে যে এ সব গুপ্ত গৃহ নির্মিত হয়েছিল, তা পরিষ্কার বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ বিপদের দিনের আশ্রয় স্থল হিসেবেই এ গুলি নির্মিত হয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসছিল। আর দেরী করা সঙ্গত নয় মনে করে মোমতাজ-শাহজাহানের প্রেমের পুরী "তাজ" থেকে বেরিয়ে তাজগঞ্জের দিনের বেলাকার সেই ছোট মসজিদটির দিকেই যাত্রা করলাম। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে আবার তাকালাম। অদূরে দণ্ডায়মান তাজের গম্বুজটি দেখে মনে পড়লো ঃ

"হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্র-ধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র-সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শাহজাহানের সাধের কেল্লাহ দেখতে গেলাম। কিন্তু ভ্যাগাবন্ড মুসাফিরের প্রবেশাধিকার নেই সেই কেল্লায়। সুতরাং কেল্লাহ দেখার আশা ত্যাগ করে আমরা স্টেশনের অপর পাশে অবস্থিত বিরাটকায় শাহী মসজিদটা দেখতেই গমন করলাম। আগ্রার এই শাহী মসজিদটি দিল্লীর জোমা মসজিদের মত বিরাটকার না হলেও অবিকল তারি আদর্শে নির্মিত। লাল রঙের Sand stone-এর উপর খোদাই করা যে-সব কারুকার্য মসজিদের গম্বুজ ও দেয়ালগুলির শোভা বর্ধন করছে, তা দেখে মোগল যুগের স্থপতি শিল্পীদের তারিফ না করে পারা যায় না। জোহরের নামাজের পর এই মসজিদেই শুয়ে কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা উপভোগ করলাম এবং সন্ধ্যার সময় শহরের মাঝখানে একটি মসজিদে গিয়ে রাতটা সেখানেই কাটালাম। আগ্রার অন্যতম দর্শনীয় স্থান ইতেমাদুদ্দৌলা দেখার সুযোগ আমাদের আর হয়ে উঠল না। শুনলাম সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নির্মিত তাঁর জনক-জননীর এ সমাধি-সৌধ নাকি তাজমহলের মতোই সুন্দর, অপূর্ব শোভা-সুষমার মণ্ডিত। পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় তাজমহলের নগরী-শাহজাহানের স্বপ্নপূরী আগ্রা ত্যাগ করে আবার টুণ্ডলার পথ ধরলাম।

www.pathagar.com

অষ্টম মঞ্জিল

প্রেমের স্বপ্নপুরী "তাজমহলের" নগরী ত্যাগ করতে মনের কোণে অতীতের কত সোনার স্বপ্নই না বারে বারে জেগে উঠছিল। মনে পড়ছিল, ভারতে মুসলিম গৌরব-যুগের কত কথা-শাহানশাহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর ও নূরজাহান, মোমতাজ, জেবুন্নিসার পূণ্যস্মৃতি।

যমুনার পুলের উপর গাড়ী উঠলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শেষ বারের মতো আবার তাজমহলের শোভা দেখে নিলাম। গাড়ীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে "তাজের" শুভ্র ছবিখানাও ক্রমেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছিল। রাস্তার একটা মোড় ঘুরে গাড়ীখানা সামনে একটু অগ্রসর হতেই কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে অকস্মাৎ "তাজ"কে হারিয়ে ফেল্লাম। বুক চিরে অজানিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রেমের মহিমায় গরীয়ান এমন দৃশ্য জীবনে আর দেখতে পাব কিনা, তা-ই ভাবছিলাম।

টুণ্ডলায় পৌঁছে সারাটা দিন সেখানেই ছিলাম। রাত প্রায় তিনটের সময় স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে সেখান থেকে দিল্লীর পথে যাত্রা করলাম। টুণ্ডলা থেকে দিল্লী প্রায় সোয়া শ'মাইল হবে। এই দীর্ঘ পথের মাঝে হাতরাস, আলীগড়, খুরজা ও গাজিয়াবাদ এই কয়টি জায়গায়ই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বিশেষথ: মহাত্মা সবার সৈয়রে পূন্য স্মৃতি বিজড়িত আলীগড় শহরটা দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন জায়গায়ই আর নামা হয়ে উঠল না।

পরদিন প্রাতে প্রায় ছটার সময় দিল্লী স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। আগ্রা ত্যাগ করে সাময়িকভাবে মনে যে ব্যথা দোল দিয়ে উঠছিল, দিল্লীতে পা দিয়েই যেন তা কোথায় মিলিয়ে গেলো। মোগল যুগের রাজধানী মহা শ্মশান দিল্লীর কীর্ত্তিরাজি দেখে নয়ন সার্থক করব, এই উৎসাহ নিয়েই গাড়ী থেকে নামলাম।

স্টেশনের বাইরে সামান্য একটু দূর থেকেই ট্রাম-লাইন শুরু হয়েছে। আমাদের চোখের সামনেই যাত্রীরা সব দলে দলে গিয়ে ট্রামে চাপছিল। কিন্তু হতভাগ্য ভ্যাগাবণ্ড দুইটি মুসাফিরের পক্ষে পকেটের পয়সা খরচ করে ট্রামের যাত্রী সাজা আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমরা পদব্রজেই জোমা মসজিদের পথ ধরলাম।

সোজা ট্রাম লাইন ধরে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে পূর্বদিকগামী একটা বড় রাস্তায় পড়লাম। রাস্তার দুপাশে বড় বড় অনেকগুলি দোকান পাট দেখা গেলো। এই রাস্তা ধরেই কিছুদূর পর্যন্ত পূব দিকে অগ্রসর হয়ে সামনে রাস্তার মাঝখানে বিরাট একটা স্তম্ভ দেখতে পেলাম। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি বিরাজমান। Clock Tower নামেই স্তম্ভটি

www.pathagar.com

সাধারণ্যে পরিচিত।
Clock Tower থেকে একটু সামনে অগ্রসর হলেই মোগল বাদশাহদের সাধের চাঁদনী চক এবং এই চাঁদনী চকেই শাহজাহানের অন্যতম অমর কীর্তি জোমা মসজিদ ও কেল্লা অবস্থিত। চাঁদনী চকে পৌছেই আমরা সর্বপ্রথমে একটা হোটেলে প্রবেশ করে সামান্য কিছু নাশতা খেয়ে নিলাম এবং অতঃপর জোমা মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দ্বিতলের মতো উঁচু প্রকাণ্ড চত্তরের উপর মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা ফটকের ভিতর প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, একদল খাদেম দর্শকদের জুতা, ছাতি প্রভৃতির খবরদারী করার জন্য সেখানে হাজির রয়েছে। ইউরোপীয় দর্শকগণ যাতে জুতা না খুলেই মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন, তদজন্য খাদেমদের কাছে ক্যানভাস নির্মিত মোজার মতো এক প্রকার থলে রক্ষিত আছে। জুতোর উপর এ-সব থলে পরে মসজিদে প্রবেশ করলে রাস্তার ধুলা কাদা প্রভৃতি ময়লায় মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আর কোন ভয়ই থাকে না।
মসজিদের চত্তরের মাঝে প্রবেশ করেই ডাইনে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম। যেমন প্রকাণ্ড মসজিদ তার সামনের চত্তরটাও তেমনি প্রকাণ্ড। চত্তর-সহ সমগ্র মসজিদে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোক এক জামাতে নামাজ পড়তে পারবে বলে মনে হলো।
নামাজীদের সুবিধার জন্য চত্তরের মাঝে-মাঝে বক্ষ পরিমিত উঁচু কতকগুলি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই সব স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে নামাজের সময় কতকগুলি লোক তকবীর উচ্চারণ করে।
প্রথমে চত্তরের এদিক-ওদিক ঘুরে অতঃপর আমরা আসল মসজিদে প্রবেশ করলাম। লাল রঙের Sand-stone-এ নির্মিত তিন গম্বুজওয়ালা বিরাট মসজিদ। এত বড় মসজিদ লাহোরের শাহী মসজিদ ছাড়া এ উপ-মহাদেশে আর নেই, সমগ্র জগতেও অপর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মসজিদের প্রবেশ দ্বার এবং গম্বুজগুলির মধ্যে পাথর কেটে কোরআন মজীদের বহু আয়েত উৎকীর্ণ করা হয়েছে দেখা গেলো। কঠিন প্রস্তরের উপর এই সব খোদাই কাজ করা যে খুবই কঠিন ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়, মোগল-যুগের স্থপতি-শিল্পীদের অসাধারণ ধৈর্য দেখে। পাথর কেটে কেমন করে যে তারা অতি ধৈর্যের সাথে কোরআনের আয়াতগুলি খোদাই করেছেন, তা ভাবতে গেলে বাস্তবিকই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।
মসজিদের মাঝখানের গম্বুজটা দু'পাশের দুটো গম্বুজ থেকে আকারে অনেক বড়। মসজিদের সামনের প্রান্ত সীমায় দু'টো সুউচ্চ মীনার দণ্ডায়মান। পশ্চাদ্দিকেও অবিশ্যি দু'টো মীনার আছে, কিন্তু সেগুলি খুবই ছোট। মসজিদের ভিতরে কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক পায়চারী

www.pathagar.com

করে অতঃপর আমরা দক্ষিণ পাশের মীনারটির উপর চাপলাম। তাজমহলের মীনারের মতোই জোমা মসজিদের এই মীনারও ত্রিতল। মীনারের সর্বোচ্চ তলের বারান্দায় দাঁড়ালে পুরানো দিল্লীর "মহা-শ্মশান" এবং কুতব-মীনার প্রভৃতি সবই দেখা যায়।

মীনারের ত্রিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরানো দিল্লীর ভগ্নস্তূপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মহীয়ান বিশ্ব-শিল্পীর ভাঙ্গাগড়া অদ্ভুত লীলার কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মোয়াজ্জিনের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম, মোয়াজ্জিন জোহরের নামাজের আজান দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি মীনার থেকে নেমে আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণের হাওজে ওজু করে মসজিদের ভিতরে গিয়ে নামাজে দাঁড়ালাম। নামাজে দাঁড়িয়ে মসজিদের বিরাটত্বের অনুভূতি আরো ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারলাম। আমরা একটা কাতারের বা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম; ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম, কাতারের দক্ষিণ সীমা-বড় কষ্টেই নজরে পড়ছে। শাহজাহানের অমর কীর্তি দিল্লীর জোমা মসজিদ যেমনি বিরাট তেমনি প্রকাণ্ড।

নামাজ শেষে আমরা জোমা মসজিদের পূর্ব পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সম্মুখবর্তী কেল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। কেল্লা ও মসজিদের মাঝে ছোট্ট একটা বৃক্ষের নিম্নে প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ সরমদ সাহেবের মাজার অবস্থিত। দরবেশ সাহেব শরীয়তের বিধান অমান্য করে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন বলে শাহানশাহ আলমগীর নাকি তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। মাজারের নিকট উপস্থিত হয়ে আমরা কয়েক মিনিট কাল সেখানে দাঁড়িয়ে "ফাতেহা" পাঠ করলাম এবং অতঃপর কেল্লার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দিল্লীর এই কেল্লার ব্যবস্থাও আগ্রার কেল্লার মতোই-বিনা পাশে কারো এর ভেতর প্রবেশ করার অধিকার নেই। সুতরাং আমাদের বাধ্য হয়েই আপাততঃ কেল্লার মধ্যস্থ "দেওয়ানে আম", "দেওয়ানে খাস", "মতি মসজিদ" প্রভৃতি বাদশা-বেগমের লীলাক্ষেত্রগুলি দেখার আশা ত্যাগ করতে হলো। বেলাও তখন প্রায় দুটো হয় হয়; ক্ষিদে খুবই পেয়েছিল। সুতরাং কেল্লার বন্ধ দুয়ারের সামনে থেকে পশ্চাৎ ফিরে আমরা খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ফতেপুরী মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম।

ছোট-ছোট অনেকগুলি গলি-কুচার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ফতেপুরী মসজিদে গিয়ে পৌঁছলাম। ফতেহপুরী বেগমের অমর কীর্তি এই মসজিদ। মসজিদখানা আকারে জোমা মসজিদের মতো বিরাট না হলেও একেবারে নেহায়েত ছোট নহে-অনেকাংশে আগ্রার শাহী মসজিদেরই মতো হবে। বিরাট একটা মাদ্রাসা এই মসজিদে অবস্থিত। মসজিদের সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড চত্তরের চারপাশ ঘিরে চকমিলান এমারতের আকারে অসংখ্য হোজরা নির্মিত হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা এই সব হোজরায় বাস করে। ছাত্রদের আহার, বাসস্থান-এমন কি কেতাব ও বস্ত্রাদি ক্রয়ের সমুদয় ব্যয়ভার পর্যন্ত মাদ্রাসার ফান্ড

www.pathagar.com

থেকেই বহন করা হয়। ফতেহপুরী মসজিদের এই মাদ্রাসাই দিল্লী-নগরীর সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা। একমাত্র দেওবন্দ, রামপুর এবং সাহারানপুর ছাড়া আর কোথাও এত বড়ো মাদ্রাসা নাকি নেই।

মসজিদে পৌঁছে সর্বপ্রথমেই আমরা আসরের নামাজ শেষ করে নিলাম। নামাজ অন্তে মসজিদের বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় মাথায় লম্বা জোলফওয়ালা এক মৌলবী সাহেব এসে আমাদের সামনে উপবেশন করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা বাঙালী-এই পরিচয় পেয়েই মৌলবী সাহেব অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং জানালেন যে তিনিও বাঙালী, ফতেহপুরী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে থাকেন। আমরা মৌলবী সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জানালেন- নাম তাঁর ফকীর আহমদ, নোয়াখালী জেলার হাতীয়ার অধিবাসী। এ সুদূর দিল্লী নগরীতে তাঁর পড়ার খরচ কেমন করে চলছে, তা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম মৌলবী সাহেব ভাগ্যগুণে মাদ্রাসার হোজরায় থাকবার অধিকার পেয়েছেন; কাজেই খরচের ভাবনা তাঁকে আদৌ ভাবতে হয় না।

বিদেশ বিভুঁইয়ে দেশের কাক দেখলেও নাকি অতি আপনার জন বলে মনে হয়। সুতরাং সুদূর দিল্লী-নগরীতে হাতীয়ার মৌলবী ফকীর আহমদকে পেয়ে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছিলাম, তা না বল্লেও চলে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা মৌলবী সাহেবের সাথে বেশ ভাব করে নিলাম এবং তাঁর ঘাড়ে সওয়ার হয়েই খাবারের ব্যবস্থাটাও করে নিলাম। খাওয়ার পর মৌলবী সাহেবের সাথে বেড়াতে বেরুলাম। ঘুরতে ঘুরতে মৌলবী সাহেব আমাদের সঙ্গে করে শহরের অপর এক মহল্লায় একটা ছোট মসজিদে উপস্থিত হয়ে তথাকার ইমাম সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেবের নাম নূর আহমদ, রাজশাহী জেলার অধিবাসী তিনি ফতেহপুরী মাদ্রাসায় হাদিস পড়ছেন। নূর আহম্মদ সাহেবও আমাদের স্বদেশের "কাকের" মতোই সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সেদির রাত্তিরে তাঁর ওখানেই আমাদের খাওয়া হলো এবং তাঁরই মসজিদে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মৌলবী নূর আহমদ সাহেবের ওখানে কিঞ্চিৎ নাশতা করে নিয়ে আমরা পুরানো দিল্লীর মহাশ্মশান দেখবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মোগল যুগের দিল্লীর দক্ষিণ দিকেই পাঠান দিল্লীর যোজন-ব্যাপী মহাশ্মশান। শহরের দক্ষিণ দিকের ফটক পেরিয়ে সামনে সামান্য একটু দূর অগ্রসর হলেই রাস্তার দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন অট্টালিকাদির অসংখ্য ভগ্নাবশেষ এবং তারি আশে-পাশে দিগন্তব্যাপী কবররাজী নজরে পড়ে। কেবল কবরের পর কবর যেন বিরাট একটা মোদ্দারই রাজ্য। পথ চলতে চলতে ভাবছিলাম, দু'পাশের সহস্র সহস্র কবরে শায়িত অসংখ্য বাদশাহ-বেগম, শাহজাদা-শাহজাদী আমীর ওমরাহ, সব্বাই যদি এক সঙ্গে প্রাণ পেয়ে আবার

www.pathagar.com

জেগে উঠেন-তবে।

রাস্তার ডান পাশে অদূরে দণ্ডায়মান ভগ্নোমূখ জীর্ণ কেল্লাখানা দেখে স্বপ্নলোকে বিচরণকারী মন আবার মাটির দুনিয়ায় ফিরে এল। রাস্তা ছেড়ে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে কেল্লার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু চারপাশের গভীর জঙ্গল এবং কেল্লার জীর্ণ অবস্থা দেখে ভেতরে প্রবেশের সাহস আর হলো না। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এই ভাঙ্গা কেল্লাটা কি আবার কোনো কালে কাজে লাগতে পারে না? অকস্মাৎ ছেলে-মানুষী একটা বুদ্ধি জেগে উঠল। এই ভাঙ্গা কেল্লাটাকে আশ্রয় করে গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠন করে আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করা সম্ভবপর কিনা, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলাম। আজ থেকে প্রায় তিন যুগ আগেকার একদিন তরুণ কৈশোরে-দিল্লীর এই ভাঙ্গা কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে এই যে বিপ্লবী আইডিয়ার স্বপ্নজাল বুনেছিলাম, তা আমার নিজের কাছেই আজ অতি হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন বাস্তবিকই প্রাণ দিয়ে এ কল্পনাকে রূপ দিয়েছিলাম। ভাঙা কেল্লার ভেতরে গুপ্তভাবে নির্মিত বহু সংখ্যক বড় বড় কামান সঙ্গে করে নিয়ে, সহস্র সহস্র বিপ্লবী সেনার পুরোভাগে একটা তুর্কী তাজীতে সওয়ার হয়ে দর্পভরে বিজয়ী বেশে শাহজাহানের কেল্লায় প্রবেশ করে শেষ মোগল-সম্রাট বাহাদুর শা'র শেষ বংশ-প্রদীপকে রেঙ্গুন থেকে খুঁজে এনে সিংহাসনে অভিষেক করার দৃশ্য মনের দর্পণে প্রতিফলিত করে সেদিন বাস্তবিকই আনন্দের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিলাম। এ ছেলে মানুষী স্বপ্নই আজ পাকিস্তানের রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। শোকর আল্লাহর।

প্রায় পনেরো মিনিট কাল কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে সেখান থেকে আবার রাস্তায় ফিরে এলাম এবং কেমন করে বিপ্লবী আইডিয়াটাকে রূপ দেওয়া যেতে পারে, মনে মনে তারি প্লান আঁকতে আঁকতে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। পাশ দিয়ে একটা উটের গাড়ী চলে যেতে দেখে মফিজ আমাকে ডেকে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষন করাল। বিজয়ী বিপ্লবী সেনানী হওয়ার কল্পনায় অকস্মাৎ বাধা দেওয়ায়, মফিজের প্রতি সাময়িকভাবে তখন বেজায় রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু অভিনব উটের গাড়ী দেখে আনন্দের আতিশয্যে মনের সে রাগটা অঙ্কুরেই ধামাচাপা পড়ে গেলো। উটের গাড়ী দেখা, এমন কি উট দেখা আমার জীবনে এই প্রথম। গাড়ীখানা অনেকাংশে আমাদের দেশের গো-যানেরই মতো; দু'পাশে দু'টো লম্বা বাঁশ বেঁধে তাকে উটের সুউচ্চ গলাটার সাথে বেধে দেওয়া হয়েছে এবং গাড়োয়ান বা কোচোয়ান যাই বলুন-যে লোকটা গাড়ী চালাচ্ছিল, সে উটের পিঠে সওয়ার হয়েই উষ্ট্র পুঙ্গবের নাসিকা-রুজুর সাহায্যে গাড়ীর গতি নির্দেশ করছিল। দেখে আমরা বাস্তবিকই বেজায় আনন্দ পেয়েছিলাম।

উটের গাড়ীর পেছন-পেছন সামনে আর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার ডান পাশে একটা ক্ষুদ্র কুড়েঘরে চার-পাঁচ জন লোককে একত্রে বসে একটা মেটে ফর্শী হুকায় তামাক খেতে

www.pathagar.com

দেখতে পেলাম। দেখেই মফিজের ধুমপানের ইচ্ছা প্রবলতর হয়ে উঠল। সে আবদার ধরে বসল- "চল যাই, সেখান থেকে তামাক খেয়ে আসিগে।" ধূমপানের ইচ্ছা যদিও আমার ছিল না, তথাপি কেবলমাত্র মফিজের আবদার রক্ষার্থই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকেও সেই পথিপার্শ্বস্থ কুড়েখানায় গিয়ে "আসসালামু আলায়কুম" বলে দাঁড়াতে হলো। তামাকখোর লোকগুলি আমাদের সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে তাদের পাশে চাটাইখানার উপর বসতে ইঙ্গিত করল এবং হুকোর নলটা মফিজের সামনে বাড়িয়ে ধরল। বসেই মফিজ নেহায়েত দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের মতোই হুকোয় নলটা মুখে পুরে দিয়ে একাদিক্রমে প্রায় ডজন খানেক টান দিয়ে পাশ্ববর্তী লোকটার প্রতি নলটা বাড়িয়ে দিল। অদূরে বসে আমি লক্ষ্য করছিলাম, মফিজের এই রাক্ষুসে ধূমপান দেখে লোকগুলির মধ্যে বেশ একটু অস্বস্তির ভাব জেগে উঠছিল। তা'র ধুমপান শেষ হলেই একজন জিজ্ঞাসা করল, "তোমহারা মুল্লুক কাঁহা হ্যায়?" উত্তরে মফিজ জানাল, বাঙলা দেশে আমাদের জন্মভূমি। শুনেই কয়েকজন এক সঙ্গে বোলে উঠল, "ও, ওসি লিয়ে। শরাফৎ তোম লোগ কাঁহাসে শিখোগে। তাম্বাকু পিনেকা তরকীব ক্যা এ্যা হ্যায়? বুঝতে পারলাম না, তাম্বাকু পানের তরকীবে মফিজের কি গলদ ধরা পড়েছিল। পরে লোকগুলির সাথে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, একাদিক্রমে একেবারে ডজন খানেক টান দেওয়াই নাকি মস্তবড় বেয়াদবীর কাজ হয়ে গিয়েছিল। যাক, লোকগুলির দিল্লীওয়ালা আদব-কায়দার পায়ে গড় কোরে আমার মানে-মানে কুড়ে থেকে বেড়িয়ে আবার পথ ধরলাম।

আর সামান্য কয়েক পদ। তার পরেই শাহানশাহ হুমায়ুনের সুদৃশ্য সমাধি সৌধ। হুমায়ূনের এই সমাধি মোগল স্থপতি-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাস্তার বা পাশে সামান্য একটু দূরেই এই সৌধটি অবস্থিত। রাস্তা থেকে সমাধি পর্যন্ত সুদৃশ্য বাঁধানো পথ চলে গিয়েছে- দুপাশে তার মনোরম উদ্যান। আমরা উদ্যান মধ্যস্থ এই পথ ধরে সমাধির দিকে অগ্রসর হলাম এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমাধি-চত্তরের নিম্নে গিয়ে পৌছলাম।

হুমায়ূনের এই সমাধি দেখতে অবিকল "তাজমহলেরই" মতো-পার্থক্যের মধ্যে শুধু "তাজমহল" শ্বেত-মর্মরে তৈরি, আর হুমায়ূনের সমাধি-মন্দিরের সবটা এমারত রক্ত প্রস্ত রে তৈরি করে তার মাথায় শুধুমাত্র শ্বেত-মর্মরের গম্বুজ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে চত্তরের উপর উঠে সমাধিসৌধের ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং বাদশার কবর জেয়ারত করে চারপাশে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে আরো কয়েকটা কবর আছে, দেখা গেলো। এই কবরগুলি নাকি রাজ-পরিবারেরই কারো-কারো এবং বাদশার উজীরদের মধ্যেও নাকি একজন এখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

অধ্যবসায় ও সাধনার জীবন্ত প্রতীক রাজর্ষি হুমায়ূনের এই পবিত্র সমাধিসৌধ দেখতে গিয়ে অতীতের কতো ব্যথাভরা স্মৃতিই না মনের কোণে দোল দিয়ে উঠল। বিশেষ করে মনে

www.pathagar.com

পড়ল, সিপাহী বিদ্রোহ যুগের করুণ বিষাদময় স্মৃতি। বিদ্রোহের অবসানে বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য দিল্লীর কেল্লাহ দখল করে নিলে পর, হতভাগ্য সম্রাট বাহাদুর শাহ কেল্লা থেকে পলায়ন করে সপরিবারে শান্তি-নিকেতন হুমায়ুনের এই কবরের পাশেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়োন্মত্ত গোরা সেপাইর দল হতভাগ্য বাদশাকে এখানেও রেহাই দেয়নি। তারা খুজতে খুজতে পলায়িত বাহাদুর শাহকে এখানে এসেই সপরিবারে গ্রেফতার করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেছিলেন। বন্দী সম্রাট বাহাদুর শার প্রতি শ্বেতাঙ্গ সেপাইর দল সেদিন যে নির্দয় ব্যবহার করেছিল, চোখের সামনে তাই যেন দেদীপ্যমান হয়ে উঠছিল। ছোট-ছোট শাহজাদা-শাহজাদীদের ঘাড়ে বড়-বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, তাদের পশু যুথের মতোই তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ-বাহিনী সেদিন যে পৈশাচিক আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেছিল, তা মনে করে আমার কিশোর প্রাণেও সত্যি-সত্যি হাবিয়া দোজখের জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল।

হুমায়ূনের সমাধির সামান্য একটু দক্ষিণে ভাঙ্গা একটা মসজিদ। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে আমরা এই মসজিদে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। দেখলাম ছোট্ট একটা মক্তব-খানাও সেখানে বিদ্যমান। এক বছর ষাটেকের সোফেদ-দাড়িওয়ালা মৌলবী সাহেব তখন আট-দশটি ছোট-ছোট ছেলের মাঝে বসে কোরআন তালিম দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই মৌলবী সাহেব বেশ সমাদরে তাঁর পাশে বসালেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা ভ্রাম্যমান মুসাফির, এ কথা জানতে পেরে মৌলবী সাহেব আমাদের উপদেশ দিলেন-নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দরগায় গিয়ে আশ্রয় নেবার। সেখানে গেলে খাওয়া-দাওয়ার বেশ ভালো ব্যবস্থা হবে, কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাও আমাদের জানিয়ে দিলেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কিছুক্ষণ সেখানে বসে বিশ্রাম করলাম এবং অতপর সেখান থেকে বেরিয়ে নিজামুদ্দীনের পথ ধরলাম।

কতকগুলি ভাঙ্গা কবরের পাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ নিজামুদ্দীন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পথ চলতে চলতে এক-একবার আমরা অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির বশে পথি-পার্শ্বস্থ ভাঙ্গা কবরগুলির কোন-কোনটার শিয়রে যে সব শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল, তারি নিকটে গিয়ে অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। কিন্তু আরবী ও ফার্সী ভাষায় আমাদের বিদ্যের দৌড় আমপারা এবং পহেলী কেতাব পেরিয়ে না যাওয়ায়, শত চেষ্টা করেও কোনো শিলালিপির মর্মই আমরা উদ্ধার করতে সমর্থ হইনি। অবশেষে এই ব্যর্থ প্রয়াসে বিরত হয়ে চলতে চলতে নিজামুদ্দীনের সমাধির প্রাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একশো টা খুন করে যে পাপী পাপের পঙ্কিল ডোবায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং পরে আর একটা খুন করে যে ডাকাত সর্দার নিজাম মহা-সাধক নিজামুদ্দীন আওলিয়া হতে পেরেছিলেন, তার সমাধির পাশে গিয়ে হৃদয়ে যে একটা ভাব জেগে উঠল বাস্তবিকই তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমাধি-সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে আমরা ভেতরে

www.pathagar.com

প্রবেশ করলাম।

মার্বেল পাথরে নির্মিত এক-গম্বুজওয়ালা ছোট্ট একটি গৃহে; তারি মাঝে সুদৃশ্য মখমলের গেলাফে আস্তৃত আওলিয়ার সমাধি। এই কবরের পাশেই আর একটি কবরও দেখা গেলো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম- সেটা হচ্ছে কবি আমীর খসরুর মাজার। আওলিয়া আর কবি- এ দু'জনে ছিল গভীর প্রেম। মৃত্যুর পরও বুঝি তাই তাঁরা একত্রে শয়ান রয়েছেন। কবর দু'খানার ঠিক মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ফাতেহা পাঠ করলাম এবং অর্থগৃধ্নু খাদেমের সর্বপ্রকার ফন্দী ফিকিরকে উপেক্ষা করে কোন নজর নেয়াজ না দিয়েই পশ্চিম পাশের দরজা দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে এলাম।

নিজামুদ্দীনের মকবেরার গা' ঘেষেই পশ্চিম দিকের উঠানের মাঝে তাপসী শাহজাদী জাহানারার পবিত্র সমাধি-ঘাসের গালিচায় শোভিত হয়ে বিরাজ করছে। নিজামুদ্দীনের আড়ম্বর-পূর্ণ সুদৃশ্য সমাধি দেখে হৃদয়ে যে ভাব জাগে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি ভক্তির উদয় হয়-শাহজাদী জাহানারার এই অনাড়ম্বর সমাধি দেখলে। কোনো সাজ-সজ্জা নেই, সাদাসিধা ধরণের তৃণাস্তৃত সমাধি; একটা মার্বেল বেষ্টনী উপর একখানা শিলালিপিতে জাহানারার স্বরচিত কবিতা উৎকীর্ণ। তাপসী শাহজাদী এই কবিতায় নিজের অন্তরের পরিপূর্ণ কামনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন- "তোমরা আমার কবর বহুমূল্য আস্তরণে আস্তৃত করো না। যদিও রাজকন্য আমি, তবু নিজামুদ্দীনের শিষ্যা-দীনা। দুনিয়ার সম্পদ আমি চাইনা-তৃণ শয্যাই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ শয্যা। তাপসী শাহজাদীর এই অন্তরের বাণী সত্যিই যেন জড়বাদী জগতকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সর্বপ্রকার ঐহিক সম্পদের অনিত্যতা বুঝিয়ে দেয়। শান্তিনিকেতন জাহানারার এই সমাধির পাশে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুগ্ধপ্রাণে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আস্তে-আস্তে নিকটস্থ মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম। এই মসজিদের গায়ে-গম্বুজের ভেতরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ইংরাজ সৈনিকদের গোলাগুলির চিহ্ন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

বেলা তখন প্রায় দু'টো হবে। মসজিদের নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, কোনও বড়লোক ফকীর-মিসকীনকে সেখানে খাওয়াচ্ছেন। আমরাও ফকীর-মিসকীনেরই পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোনরূপ দ্বিধা না করেই মসজিদের প্রাঙ্গনে বসে পড়লাম এবং দু'জনে দু'টো মেটে রেকাবীতে দু'বাসন বিরিয়ানী পোলাও উড়িয়ে দিয়ে, অতঃপর হাত ধোবার জন্যে দরগার উত্তর পার্শ্বস্থ ডোবাটির দিকে অগ্রসর হলাম।

অদ্ভুদ ডোবা এটি। দেখলেই মনে, প্রস্তরময় ভুমি খোদাই করেই যেন ডোবাটি নির্মিত হয়েছে। শুনতে পেলাম, দরবেশ নাকি বাদশার সাথে প্রতিযোগিতা করেই এই জলধারটি খনন করেছিলেন। আরো আশ্চর্য, নিকটস্থ সবগুলি কূপের পানি লবনাক্ত হলেও এই ডোবার পানি অতি সুমিষ্ট। লোকে বলে নিজামুদ্দীনে কারামতেই নাকি ডোবার পানি এত সুমিষ্ট হয়েছে। এই পানি পান করে নানা রকম রোগ আরোগ্য হয় বলে সমাগত ভক্তদল অতি সমাদরে তা সংগ্রহ

www.pathagar.com

করে তবার্রুক রূপে দেশে নিয়ে যায়। ডোবায় হাত ধুয়ে তার সর্ব রোগের সুমিষ্ট পানি পান করে আমরা অতি তৃপ্ত হলাম।

নিজামুদ্দীন এবং তার আশে-পাশের সবগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখা শেষ করতে করতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সুতরাং সেদিনকার মত আমরা নিজামুদ্দীন মসজিদে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর কুতুব-মীনার দেখার আশায় আরো দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম।

দুর্ভাগ্য আমাদের। প্রায় ঘন্টাখানেক পথ চলার পর কুতুবের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, উপরে উঠবার সিঁড়ির দরজা বন্ধ; তখন নাকি মীনারের ভেতরটা মেরামত হচ্ছিল। সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দরজা থেকেই আমাদের ফিরতে হলো। কুতুবের পাশেই পৃথ্বীরাজের বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ। আমরা নিকটে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গগনচুম্বী কুতুব ও লৌহ-স্তম্ভের শোভা নয়ন ভরে দেখে নিলাম। কিরূপ আশ্চর্য কৌশলে যে উভয় স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে, তা ভাবতে গেলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে।

শুনতে পেলাম, নিকটেই নাকি হজরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর মাজার শরীফ এবং সম্রাট আলতুৎমীস ও সম্রাজ্ঞী রেজিয়ার সমাধি অবস্থিত। কিন্তু তা দেখতে যাবার সৌভাগ্য আমাদের আর হয়ে উঠল না। রেল রাস্তা ধরে সোজা শহরে ফিরে জোমা মসজিদে মগরেবের নামাজ পড়ে নিয়ে, রাতের গাড়ীতেই আমরা ভারতে হিন্দু-শাসনের মহাশ্মশান হস্তিনাপুর, পাঠান ও মোগল শাসন-যুগের শাহী গোরস্থান দিল্লী নগরী ত্যাগ করে ব্যথাহত হৃদয়ে আজমীরের পথ ধরলাম।

www.pathagar.com

নবম মঞ্জিল

পাঠন ও মোগল গৌরবের ধ্বংস-কঙ্কাল দিল্লী-নগরী ত্যাগ করে গরীবেনেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন আজমীরীর পবিত্র সমাধির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে ভেবেছিলাম অতঃপর হয়ত বা দিল্লীর ব্যথাভরা স্মৃতি মনকে আর পীড়িয়ে তুলবে না। কিন্তু গাড়ীতে চাপার পর দিল্লীর মহা-গোরস্থানের ভূত যেন আরো বেশি করেই ঘাড়ে চেপে বসলো। বেহালার কান মোচড়ানোর মতো মনের চিন্তা-ধারার গতি যতই অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম, ততই যেন সহস্র-সহস্র কবর আর প্রাচীর-মীনার চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ভেসে উঠছিল। ভাঙ্গা কেল্লা ও মসজিদ মীনারের প্রত্যেকটা পাথরের মুখেও যেন ভাষা ফুটে উঠছিল-সব্বাই যেন অতীত দিনের শত ব্যথা-বেদনা সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনবার জন্যে মনের সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়াচ্ছিল। এক একবার মনে হচ্ছিল, মোর্দাপুরীর প্রত্যেকটা কবরের বুক থেকেই যেন এক সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে কাতর ফরিয়াদ ফেটে বেরুচ্ছে,- "ওগো মুসাফির। ওগো পান্থ। ওগো বিদেশী বন্ধু। ক্ষণেক দাঁড়াও, শুনে যাও মোদের করুণ কাহিনী।"

ব্যথা-কাতর আমার কিশোর মন মোর্দা-দিল্লীর অতীত দিনের সহস্র কণ্ঠে বিঘোষিত সে কাহিনী শোনায় সত্যিই মশগুল হয়ে পড়েছিল। অকস্মাৎ গাড়ীর ঝাঁকুনীর সাথে-সাথে একটা কুলীর কণ্ঠে উচ্চারিত "গুড়গাঁও" চীৎকারে মনের সে স্বপ্নজাল ছিন্ন হয়ে গেলো। থতমত খেয়ে উঠে জানালা দিয়ে মুখে বাড়িয়ে দেখতে পেলাম গাড়ীখানা "গুড়াগাঁও" নামক একটা বেশ বড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের উঠা-নামার ভীড় আর ফেরীওয়ালা ও কুলীদের হাঁক-ডাক চীৎকারে প্লাটফর্মটা তখন দস্তুরমতো একটা গেঁয়ো হাটে রূপান্তরিত হয়ে উঠছিলো। বেজায় পিপাসা পাওয়ায় গাড়ী থেকে নেমে প্লাটফর্মের উপর "পানিপাড়ের" কাছ থেকে অঞ্জলী পুরে পানি খেয়ে নিয়ে আবার গাড়ীতে চাপলাম।

অবাধ একটানা গতি-একদম "ফুলেরা" জংশন পর্যন্ত। রেলগাড়ীতে বেয়ারিং যাত্রীদের স্বভাব-শত্রু যারা, সেই সব মহাপুরুষদের চোখে ধুলী নিক্ষেপ করে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে বিকেল প্রায় ৫টার সময় আমরা "ফুলেরা" জংশনে নেমে পড়লাম। এই দীর্ঘ পথের মাঝে মিনিট দশ-পনেরোর জন্যে একবার মাত্র "রেওয়াড়ী" জংশনে নেমেছিলাম বটে, কিন্তু প্লাটফর্মের সীমানা পেরিয়ে এক কদমও বাইরে যাওয়ার সাহস হয়নি-কি জানি, যদি গাড়ী ছেড়ে দেয়। "রেওয়াড়ী" জায়গাটা বেশ বড় বলেই মনে হলো, কিন্তু রেলকোম্পানীর রেলিংঘেরা স্টেশন-কারার বাইরে মাথা গলিয়ে শহর দেখা আমাদের ভাগ্যে আর হয়ে

www.pathagar.com

উঠেনি।
"ফুলেরা" জংশনে গাড়ী থেকে নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়েই আমরা শহরের একটা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। স্টেশনটা বেশ বড় হলেও শহরটা আদৌ বড় নয় একটা মহকুমা-টাউনের মতো। নবাব উপাধিধারী একজন মুসলিম সামন্ত-নৃপতির রাজধানী এটা। মাগরেবের নামাজের পর এক সহৃদয় মুসল্লীর সাথে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে অড়হড় ডাল আর প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু মোটা যবের রুটীর সাহায্যে উদর পূর্তি করে মসজিদে ফিরে এসে খোদার ঘরে খোদারই এবাদতের বিছানায় শুয়ে দিব্যি আরামে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সারা দিন ফুলেরা টাউনেই কাটিয়ে বিকেল প্রায় ৪টার সময় আবার গেলাম স্টেশনে।
স্টেশন পৌঁছে একখানা গাড়ী দেখে মনে জেগে উঠল-স্বদেশের স্মৃতি- বাঙলা মায়ের শ্যামল আঁচলের স্মৃতি-শান্তি নীড় পল্লীর একখানা ক্ষুদ্র কুটীরের স্মৃতি-স্নেহময়ী মায়ের কথা, আদরের দুলাল ভাই-বোনদের কথা, আব্বার বাৎসল্যের কথা। দেখলাম আসাম-বেঙ্গল রেলের তৃতীয় শ্রেণীর এক খানা বগী গাড়ী এনে A.B.R অক্ষর তিনটীর মাঝা-মাঝি একটা সাদা রঙের রেখা টেনে দিয়ে, তার নিচে J.B.R অক্ষরত্রয় লিখে গাড়ীখানাকে যোধপুর বিকানীর রেলের সম্পত্তি করে নেওয়া হয়েছে। স্বদেশের এই গাড়ীখানার কাঠ-লোহা দিয়ে তৈরি কঠোর অঙ্গেও যেন মায়ের-ভায়ের স্নেহের আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে গাড়ীখানার সামনে দু'তিনবার পায়চারী করে বাইরে থেকে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম এবং একটা দরজা খুলে ক্ষণেকের জন্যে ভেতরে গিয়ে আর এক দরজা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলাম। বুকের ভেতর তখন দস্তুরমতো ঝড় বইছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, সেখানে-সেই প্লাটফর্মের উপরেই-আছড়ে পড়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে বুকের সে ব্যথার বোঝাটাকে পানি করে বইয়ে দি। কিন্তু প্রকাশ্য প্লাটফর্মের উপর সহস্র লোকের চোখের সামনে অবলা নারীর মতো ক্রন্দন শোভা পায় কেমন করে। সুতরাং কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতেই আজমীরের গাড়ীতে চেপে বসলাম।
সারাটা রাত কাটলো গাড়ীতেই। ব্যথাহত হৃদয় নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনার মাঝেও রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত জেগেই ছিলাম। কিন্তু তারপর কখন যে চোখের পাতা বুজে এসেছিল, তা জানতেও পারিনি। পরদিন সকাল বেলা যাত্রীদের কোলাহলে জেগে উঠে দেখি গাড়ী "কিষেণগড়" নামক একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে। পার্শ্ববর্তী যাত্রীটির কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, আজমীর শরীফ নাকি আর বেশি দূর নয়। সুতরাং প্লাটফর্মে নেমে হাত মুখ ধুয়ে আবার গাড়ীতে চেপে গাঁঠরী-বোচকা সব গুছিয়ে নিয়ে ঠিক হয়ে বসলাম।
প্রাতে প্রায় সাতটার সময় গাড়ীখানা আজমীর স্টেশনে গিয়ে থামল। অন্যান্য সকল যাত্রীর সাথে তাড়াহুড়া করে আমরাও গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু শহরে যাওয়ার রাস্তা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কারো কাছে কোন রকম এনকোয়ারী না করে ভীষম একটা ভুল করে বসলাম। দূরে মরুভূমির মাঝে অবস্থিত Princes' College-এর গম্বুজওয়ালা বাড়ীখানাকে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর দরগা মনে করে আমরা মরুভূমির মাঝখান দিয়ে চলে-যাওয়া আঁকা-বাঁকা পথে সেদিকেই রওয়ানা হলাম। যদিও স্টেশন থেকে Princes' College-এর সেই বাড়ীখানাকে খুব কাছে বলেই মনে হচ্ছিল তথাপি প্রায় একঘন্টা সময় লাগল আমাদের সেখানে পৌছতে। কলেজের গেটে গিয়ে দেখতে পেলাম বন্দুক সঙ্গীন উচিয়ে একটা শান্ত্রী সেখানে পাহারায় মোতায়েন। তাঁর কাছে আমরা খাজা সাহেবের দরগা সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে আমাদের নেহায়েত অজ-মুর্খ মনে করে সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে সে জানাল, আমরা নাকি পথ ভুল করে একদম উল্টা দিকে চলে এসেছি; শহরে যেতে হলে আবার স্টেশনে ফিরে গিয়ে, তারপর সেখান থেকে আরো মাইল দেড়েক পথ যেতে হবে।

শান্ত্রীর এই কথায় আমাদের চৈতন্য ফিরে এলো। কারো কাছে জিজ্ঞাসা না করে আপন মনে পথ চলায় কী মারাত্মক ভুলই যে করে বসেছি, তা বুঝতে পেরে বাস্তবিকই বেজায় দুঃখ হলো। বেলা তখন প্রায় নটা হয় হয়। পূর্ব দিন সন্ধ্যের সময় "ফুলেরায়" সামান্য যা কিছু খেয়েছিলাম, তার এক কণাও সম্ভবতঃ তখন আর পেটের ভেতর অবশিষ্ট ছিল না; ক্ষিদের জ্বালায় উভয়েরই পেট তখন দস্তুরমতো চোঁ-চোঁ করছিল। শান্ত্রী মহাশয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, নিকটে কোথাও কোনরূপ দোকান-পাট বা হোটেলাদি আছে কিনা। উত্তরে হেসে শান্ত্রী জানাল, আজমীর শহরে না গেলে কোনো দোকানাদির সন্ধান পাওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়; কারণ Princes' College-টা মরুভূমির মাঝখানেই নিরিবিলি জায়গায় তৈরি হয়েছে। রাজ-রাজড়ার ছেলেরা সাধারণের সঙ্গে মিশে যাতে "ছোট লোক" বনে না যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করেই অবশ্য শহরের বাইরে মরুভূমির মাঝে নিরিবিলি জায়গায় কলেজটি নির্মাণ করা হয়েছে। সামন্ত-রাজ্যের শাসকদের মেন্টালিটি কী, আজমীরের এই রাজন্য কলেজের অবস্থান থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাক, নেহায়েত নিরুপায় হয়েই আমরা ভুখা-পিয়াসা দুই মুসাফির রাজন্য কলেজের দ্বার থেকে ফিরে মরুভূমির মাঝখান দিয়ে স্টেশন লক্ষ্য করে আবার আজমীরের দিকে চল্লাম। বিস্তীর্ণ মরুভূমি, মাঝে-মাঝে দু'একটা বাবলা গাছ, গাছের শাখায়-শাখায় ঝাঁকে-ঝাঁকে ময়ূরের নৃত্য, আর দূরে বৃক্ষান্তরালে দলে দলে সম্বর-হরিণের বিচরণ-প্রকৃতির এই রুদ্র-মধুর দৃশ্য দু'পাশে দেখতে-দেখতেই আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম। রাজপূতানা মরুভূমির শোভা-এই হরিণ আর ময়ুর। আমরা দেখে বিস্মিত হলাম, রুদ্র প্রকৃতির মাঝেও বিশ্ব-স্রষ্টা সৌন্দর্যের নন্দন-কানন কেমন করে সৃষ্টি করতে পারেন। অনুর্বর মরুর মাঝে অবাধ-বিচরণশীল নির্ভীক হরিণদলের চপল নৃত্য, আর বাবলা গাছের শাখায় শাখায় শিখি-কণ্ঠের কেকাধ্বনি সত্যিই

www.pathagar.com

দর্শকের মনকে এ মাটির দুনিয়া থেকে টেনে বহু ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়। স্বভাবের এই নয়নাভিরাম শোভা দেখত-দেখতে এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, সোজা পথে না গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পর একটা ক্ষুদ্র মরুদ্যানে পৌঁছলাম। দেখলাম, দুই তিনটা বাবলা গাছের নিচে ছোট্ট একটা ডোবা পানিতে সয়লাব হয়ে বিরাজ করছে এবং তারি কিনারায় আর এক বাবলা কুঞ্জের মাঝে ক্ষুদ্র একখানা কুড়ে ঘর। কুড়েখানার দাওয়ায় একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর উপবেশন করে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ছোট্ট একটা ডাবা-হুকায় তামাক টানছিলেন। বৃদ্ধের চুল-দাঁড়ি সবই শনের মত সাদা হয়ে গেছে, এমন কি ভ্রু-যুগল পর্যন্ত সাদা। অকূল মরুর মাঝে এই সামান্য আশ্রয়টুকু পেয়ে আমাদের হৃদয় যেন আনন্দে নেচে উঠল। কুড়েখানার নিকটস্থ হয়ে "আস্সালামু আলায়কুম" বলে আমরা বৃদ্ধের সামনে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ বোধ হয় তামাক খেতে খেতে কোনো চিন্তায় মশগুল হয়ে সমাদরে আমাদের তাঁর পাশে বসবার জন্যে আহ্বান করলেন, যেন তাঁর কত আপনার জন আমরা। নির্জন সে মরুকুটীরে আমাদের দেখতে পেয়ে বৃদ্ধের মুখে চোখে যে আনন্দের আভা ফুটে উঠেছিল, বাস্তবিকই তা স্বর্গীয়, এ দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই তার তুলনা হতে পারে না।

বৃদ্ধের নির্দেশ মত আমরা তাঁর পাশে বসে আমাদের পথ-ভোলা দুর্ভোগের কাহিনী বর্ণনা করে পানি খেতে চাইলাম। বৃদ্ধ তাঁর হাতের হুকোটা মফিজের হাতে তুলে দিয়ে উঠে গৃহের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং একটা মাটির পেয়ালায় করে পানি এনে আমাদের সামনে রাখলেন। পেয়ালাটা হাতে করে মুখে তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা। বাধ্য হয়েই উত্তর দিতে হলো, পূর্ব রাত থেকেই আমাদের ভাগ্যে খাবার বলে কোন জিনিষ জুটে উঠেনি। শুনে বৃদ্ধ অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং খালি পেটে পানি খেতে বারণ করে আবার গৃহাভ্যান্তরে প্রবেশ করলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভেবেছিলাম; বৃদ্ধ বুঝি একাই সে নির্জন মরু কুটীরে বাস করেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার গৃহে প্রবেশ করলে পর আমাদের সেই ধারণা বদলে গেলো। গৃহে প্রবেশ করেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রুটি হ্যায়?" মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর হলো, "হাঁ, দু'রুটী হ্যায়, রাতকা লিয়ে রাখখা।" –বৃদ্ধ বল্লেন, "দুবেচারা মুসাফির আয়া, দে'দো দু'নো রুটী।" দ্বিতীয় কণ্ঠে ঝাঁজাল সুরে উত্তর হলো, -"হ্যা, দুনো রুটী দে' দেগা তো রাতকো হামলোগ ক্যায়া খায়েগা?" বুঝতে পারলাম, বৃদ্ধ তাঁর বৃদ্ধাকে নিয়েই সেই মরু-কুটীরে নীড় বেঁধে আছেন। বৃদ্ধার কথা শুনে বৃদ্ধের রাগ চেপে বসল। তিনি রাগতঃস্বরে বল্লেন- "হাম লোগ ত দিনকো খায়া, রাতকো নেহি খায়েগা তো ক্যায়া হোগা? খোদা কাল জরুর রুজী মিলা দে, গা। দেও রুটী, বেচারা মুসাফির লোগোঁকো খিলাদোঁ।" কিন্তু বৃদ্ধার হৃদয়খানা বৃদ্ধের সম্পূর্ন বিপরীত উপাদানেই সম্ভবতঃ গঠিত ছিল। তিনি কিছুতেই তাঁদের

www.pathagar.com

রাতের সম্বল দু'টুকরো রুটী মুসাফিরকে দান করতে সম্মত হলেন না। বৃদ্ধও নাছোড়বান্দা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত গৃহের ভেতরে ঝগড়া-ঝাটি করে অবশেষে একখানা রুটী একটা মাটির শানকীতে করে নিয়ে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন।

শুকনো খবুজ রুটীর টুকরাটুকু আমাদের সামনে রক্ষিত হলো। সামান্য দু'টুকরা রুটীই যাদের একমাত্র সম্বল, তাঁদের সেই সম্বলটুকু মুখে তুলতে কিছুতেই আমাদের প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। স্তম্ভিত হয়ে মাথা নিচু করে ভাবছিলাম, মরুর ফেরেশতা এই বৃদ্ধের বিরাট হৃদয়খানার কথা। নিজের মুখের গ্রাসটুকুও যিনি নিঃশেষে পরের তরে বিলিয়ে দিতে পারেন, তার বিরাট হৃদয়খানা কোন স্বর্গীয় উপাদানে তৈরি, তারি সন্ধানে মাথা তুলে বৃদ্ধের মুখের পানে চাইলাম। দেখলাম, তাঁর মুখমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে তিনি রুটিখানা খাবার জন্যে আমাদের আবার অনুরোধ করলেন। সে স্বর্গীয় মুখের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে এমন শক্তি কোন মানুষেরই নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই মাথা নত করে রুটীখানা আমাদের উদরস্মাৎ করতে হলো।

খাওয়া হয়ে গেলে পর পেট ভরে পানি খেয়ে নিয়ে আমরা মরুর ফেরেশতা সেই বৃদ্ধের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। পথ চলতে চলতে ভাবছিলাম, মাটির মানুষের মাঝেও খোদা কেমন করে সঙ্গোপনে স্থানে স্থানে একদল ফেরেশতা নাজেল করে রেখেছেন।

বেলা প্রায় বারোটার সময় স্টেশনে পৌঁছে নিকটস্থ দোতলা মসজিদটীতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এবং জোহরের নামাজ পড়ে নিয়ে সেখানেই শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। বিকেলের দিকে আসরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে দরগার দিকে যাত্রা করলাম।

মোগল যুগের প্রায় সবগুলি শহরের মতোই আজমীর শহরটাও কতকাংশে প্রাচীর-ঘেরা। শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দু'পাশে তারাগড় পর্বত মালা সমুন্নত বুকে দণ্ডায়মান। সুতরাং আর দু'দিকেই মাত্র প্রাচীর তুলতে হয়েছে। আমরা উত্তর দিকের বিরাট ফটকের মধ্য দিয়ে শহরে প্রবশে করে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলাম। রাস্তার দু'পাশে দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকারাজি প্রায় সব্ই প্রাচীর ফ্যাশানে পাথর দিয়ে নির্মিত। দেখলেই ভাবতে মুসলিম শাসন-যুগের স্মৃতি মনে জেগে উঠে।

সন্ধ্যার কিঞ্চিত পূর্বে আমরা দরগার উত্তর দিকস্থ বিরাট ফটকের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, লোকের ভীড়ে জায়গাটা একদম সর গরম হয়ে আছে। একদল পথবাসী ছোকরা দরজার দুপাশে বসে সমাগত যাত্রীদের জুতার খবরদারী করছিল এবং তার বিনিময়ে দু'চার পয়সা বখ্শীশ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, খাজা সাহেবের বার্ষিক ওরস নাকি পরদিন থেকেই শুরু হবে এবং দীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত তা অবিরত চলতে থাকবে। ওরসের সময় বোলেই দরগায় যাত্রীদের এত ভীড় দেখা যাচ্ছিল। পা' থেকে জুতো খুলে গাঁঠরী-বোচকার সাথে বগল-দাবা করে নিয়ে "বিসমিল্লাহ" বলে

www.pathagar.com

আমরা ধীরে ধীরে ফটকের ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, ফটকের পার্শ্বেই দু'টি বিরাট ডেগ পাকা চুল্লীর উপর স্থাপিত। পশ্চিম পাশের ডেগটিতে ১০০মণ এবং পূর্ব পাশেরটিতে ৮০ মণ চালের পায়েশ পাক করা যায়। ওরসের সময় দুদিন এই উভয় ডেগেই পায়েশ পাকিয়ে সমাগত যাত্রীদের মধ্যে তবররুক রূপে বিতরণ করা হয়। কেমন করে এই বিরাট ডেগদ্বয়ে পায়েশ পাকানো হয় পরে তা আমরা দেখেছিলাম এবং দেখে প্রকৃতই বিস্মিত হয়েছিলাম। যেদিন পায়েশ পাকানো হয়, তার পূর্বদিন খাজা সাহেবের ভক্তমণ্ডলী বস্তা-বস্তা চাল, গম, যব,বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, চিনি প্রভৃতি এবং কলসী-কলসী দুধ এনে ডেগদ্বয়ের ভেতরে অবিরত নিক্ষেপ করতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এরূপভাবে বোঝাই করার কাজ চলে এবং সন্ধ্যার পর চুল্লীতে বড় বড় কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে দুইটি আস্ত শালবৃক্ষ এনে বহু লোক ধরাধরি করে ডেগদ্বয়ের মাঝে গোড়ার দিকটা নিক্ষেপ করে এবং মাথার দিকে মোটা দড়ি বেধে কয়জন লোক পালাক্রমে তা ধরে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। এরূপভাবে প্রকান্ড দুইটী বৃক্ষ-কাণ্ড দ্বারাই পায়েশ-ঘোটা "চামচের" কার্য আঞ্জাম দেওয়া হয়। রাত আটটা নটা পর্যন্ত পায়েশ পাক সম্পন্ন হয় এবং তখন শালবৃক্ষদ্বয় অপসারিত করে সাদা থান কাপড় দ্বারা ডেগের মুখ বেধে দেওয়া হয়। সারা রাত পাকানো পায়েশ ডেগের মধ্যেই থাকে এবং পরদিন ফজরের নামাজের পর একটা ঘন্টা ধ্বনির ইঙ্গিত মতো একদল লোক তা লুঠ করে।

এই পায়েশ লুটের ব্যাপারটা আরো রহস্যময় কাণ্ড। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক তাদের সর্ব শরীর মোটা চট দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করে নিয়ে অনেক গুলি বালতি সহ পূর্ব থেকেই লুটের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। ফজরের নামাজের পর ঘন্টা ধ্বনির ইঙ্গিত হলেই এই সব লোক দৌড়ে ডেগদ্বয়ের চারপাশ থেকে চুল্লীর পাকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে নাগাল পাওয়া যায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই বালতী ভ'রে পায়েশ নিম্নে নামায়। যখন আর হাতে নাগাল পাওয়া যায় না, তখন দুইটী মই নামিয়ে দু'জন লোক তা' বেয়ে ডেগের ভেতরে নামে এবং বালতী বোঝাই করে সেখান থেকে তা উপরে দাড়ানো সহযোগীদের হাতে পৌছায়। এরূপভাবে প্রাতে সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যেই লুটের পর্ব শেষ হয়। তারপর এই লুটেরার দল ছোট ছোট মালসায় করে এক আনা, দু'আনা দরে যাত্রীদের কাছে পায়েস বিক্রি করে। প্রায় সকল বিদেশী যাত্রীই অতি সমাদরে এই পায়েশ ক্রয় করে এবং অনেকে খাজা সাহেবের তবররুক রূপে তা দেশেও নিয়ে যায়। ওরসের মউসুমে দু'দিন এ পায়েস লুটের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে আমরা বাস্তবিকই আনন্দ পেয়েছিলাম।

পায়েস পাকানো রাক্ষুসে ডেগদ্বয় যে চত্বরটার মাঝে অবস্থিত, তারই পশ্চিম পাশে বাদশাহ শাহজাহানের আমলে নির্মিত শ্বেত মর্মরের প্রকাণ্ড মাদ্রাসা গৃহটি বিদ্যমান। চত্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে মহামান্য নিজাম বাহাদুরের নির্মিত এবং তারি অর্থে পরিচালিত "লঙ্গরখানা"। এই

www.pathagar.com

লঙ্গরখানা থেকে দরিদ্র যাত্রীদের বিনামূল্যে অদ্ভুৎ এক প্রকার "জলবৎ তরলং" খাদ্য বিতরণ করা হয়। জেলখাটা কোন কোন বন্ধুর মুখে জেলখানার নিয়ামৎ "লপসীর" যে বর্ণনা শুনেছি, নিজামী লঙ্গরখানা থেকে বিতরিত বিনা মূল্যের খাদ্যটিও অবিকল তা-ই। বাদশাহ শাহজাহানের মাদ্রাসার পশ্চিম দিকে অন্য আর একটি চত্বরের মাঝে সম্রাট আকবরের নির্মিত একটি রক্ত-প্রস্তরের মসজিদ রয়েছে এবং তার দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেষে একটি প্রাচীর পেরিয়েই প্রকাণ্ড আর একটি চত্তরের মাঝে খাজা সাহেবের সমাধি নজরে পড়ে। শ্বেত মর্ম্মরে নির্মিত সুদৃশ্য সমাধি-সৌধ-গম্বুজের মাথায় প্রকাণ্ড একটি স্বর্ণ-কলস ধারণ করে গম্ভীরভাবে বিরাজ করছে। আমরা চত্তরে প্রবেশ করে সমাধি-সৌধের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং কবরের ঠিক শিয়রে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করে উপস্থিত খাদেম সাহেবের কাছ থেকে কতকগুলি শুকনো ফুল তবররুক রূপে গ্রহণ করে পূর্ব পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

খাজা সাহেবের সমাধি-সৌধের গা ঘেষেই পশ্চিম দিকে 'বেহেশতী দরওয়াজা' নামে পরিচিত ফটকের পার্শ্বে মার্বেল নির্মিত কারুকার্যময় বেষ্টনীর মাঝে শাহজাদী দৌলত-আরার সমাধি বিদ্যমান। শুনতে পেলাম শাহজাদী খাজা বাবার বিশেষ ভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে। সমাধি-সৌধের উত্তর ধারে বাদশাহ আলমগীরের নির্মিত অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত ছোট্ট একটি মসজিদ রয়েছে এবং তারি সামনে উন্মুক্ত চত্বরের মাঝে 'তিন দিনের বাদশাহ' ভিশতী নিজামের কবর। আমরা দরগাহ থেকে বেরিয়ে পশ্চিম পার্শ্বস্থ শ্বেত মর্ম্মরে নির্মিত প্রকাণ্ড মসজিদে প্রবেশ করলাম। এই মসজিদখানাও বাদশাহ শাহজাহানেরই অমর কীর্তি। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে মুসল্লীদের ওজু করার প্রকাণ্ড হাওজ এবং তারি গা ঘেষে দক্ষিণ দিকে ঠিক তাড়াগড় পর্বতের পাদদেশে প্রকৃতির খেয়ালে গঠিত প্রকাণ্ড এক সরোবর। এই সরোবরের পানি এত সুমিষ্ট এবং স্বাস্থ্যপ্রদ যে বহু দূর-দূরান্তের থেকে আগত যাত্রীরা টীনের নানা রকম পাত্র বোঝাই করে তা'দেশে নিয়ে যায়।

মসজিদে এশার নামাজ পড়ে নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আমরা দরগা প্রাঙ্গণের চার দিকে নানা স্থানে পায়চারী করে কাটালাম এবং অতঃপর অসংখ্য যাত্রীর মাঝে এক জায়গায় কাপড় বিছিয়ে শুয়ে বেশ শান্তিতে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

আজমীরে ছিলাম মোট পনর দিন-ওরসের পূর্বে এক দিন, ওরসের সাত দিন এবং তার পরে আরো সাত দিন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শহরের সকল অঞ্চল ঘুরে সবগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখার সুযোগই আমাদের হয়েছিল। সম্বর হ্রদটা যদিও আজমীর থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত, তথাপি সেখানে গিয়ে তা'দেখার সুযোগ আমাদের হয়ে উঠেনি। আজমীরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারাগড় পাহাড়। একদিন

www.pathagar.com

সকাল বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আরো কতকগুলি যাত্রীর সাথে আমরা পর্বতশীর্ষে উঠবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রায় অর্ধমাইল পরিমাণ উচু পাহাড়। আঁকা বাঁকা পার্বত্য পথ সর্পিল গতিতে ক্রমে উর্ধে উঠেছে। পথ চলতে চলতে নিচের দিকে চেয়ে এক একবার মনে হচ্ছিল, মহাভারতের কেচ্ছার পঞ্চ-পাণ্ডবের মতোই বুঝি আমরাও এ বিশ্বের হিসাব-নিকাশ শেষ করে "মহাপ্রস্থান" যাত্রায়ই পাড়ি জমিয়েছি। পান্ডবদের "মহাপ্রস্থানে" তাঁদের সঙ্গে নাকি ছিল স্বয়ং দ্রৌপদী ঠাকরুন এবং একটা কুকুর। আমাদের সঙ্গে এ দু'টোর কোনোটাই অবিশ্যি ছিল না তথাপি পাণ্ডবদের কথা মনে পড়তেই একবার অজ্ঞাত সারেই পেছন ফিরে চাইলাম। কুকুরের অভাবটা মনে বিশেষ করে না বাজলেও, দ্রৌপদীর অভাব সত্যি ক্ষণেকের জন্যে মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। ভাবছিলাম, বিদেশ-বিভুইয়ে ভ্রাম্যমান জীবনের সুন্দর সাথীরূপে সত্যি যদি একটা দ্রৌপদী সঙ্গে থাকতো। কল্পলোকের অজ্ঞাত সুন্দরী নাম-না-জানা সে মানসীর সান্নিধ্য মনের পরতে পরতে অনুভব করে সত্যি তখন ক্ষণকালের জন্য হৃদয়খানা ফিরদৌসের সুখকুঞ্জে গিয়ে পৌছেছিল। মনে হচ্ছিল, পথশ্রমে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত একখানা সুকোমল তনু যেন সত্যি আমার কাঁধে ভর দিয়ে বুকের অতি কাছে-কাছে এগিয়ে চলেছে।

বন্ধু মফিজের বিরাট একটা ঝাকুনীতে সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। থতমত খেয়ে আত্মস্থ হয়ে দেখতে পেলাম পর্বতশীর্ষে এসে পৌছেছি; আর সঙ্গের দ্রৌপদী-মানসীকে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীর মতোই বহু পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে। যাক, কল্পনার দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে না পারলেও, সামনেই এক পাল রক্ত-মাংসের দ্রৌপদীকে হাজীর দেখে মনটা কতকটা আশ্বস্থ হলো। দেখলাম, খাজা সাহেবের দরগায় আগত একদল পুরুষ ও নারী যাত্রী পর্বত শীর্ষে হজরত বড়পীর সাহেবের তথাকথিত মাজার জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক পূর্ব থেকেই এসে সেখানে উপস্থিত আছেন। হযরত বড়পীরের এই মাজার যে কোন বড়পীরের, অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোন রহস্যই আবিষ্কার করতে পারলাম না। পাহাড়ের উপরেই আর একটু দূরে রয়েছে অনেকগুলি শহীদের মাজার। পৃথ্বিরাজের সাথে মোহাম্মদ ঘোরীর যুদ্ধে নাকি এঁরা সব্বাই শহীদ হয়েছিলেন।

আমরা পর্বত শীর্ষে চার পাশে অনেক দূর পর্যন্ত পায়চারী করে নয়ন-মন-মুগ্ধকর স্বভাব-শোভা দেখে তৃপ্ত হলাম। পর্বতের উপর থেকে আজমীর শহরটা, বিশেষতঃ খাজা সাহেবের দরগাকে একটা সুন্দর ছবির মতোই মনে হয়। সারাদিন পর্বতের উপরে কাটিয়ে বিকেল বেলা আমরা নিচে নেমে এলাম এবং "আড়াই দিনকা ঝোপরা" দেখতে গেলাম। পর্বতের পাদদেশেই এই ঐতিহাসিক সৌধটি দন্ডায়মান। রক্ত-প্রস্তরে নির্মিত এই বিরাট অট্টালিকার নির্মানকার্য্য প্রকৃতপক্ষে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কথিত আছে যে, মূলতঃ মন্দির হিসাবেই

www.pathagar.com

পৃথ্বিরাজ এই সৌধটি নির্মাণ করাচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় মোহাম্মদ ঘোরী যুদ্ধ জয়ের শোকরিয়া স্বরূপ সেখানে নামাজ পড়েন। আড়াই দিনে যুদ্ধ জয় হয়েছিল বলেই নাকি সৌধটির এই অদ্ভুত নাম দেওয়া হয়েছে।

তারাগড় পর্বতের পরেই আজমীরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে "আনা সাগর" নামক সুদৃশ্য হ্রদটির নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। চারদিকে পর্বত বেষ্টিত একটা উপত্যকার মাঝে এই প্রাকৃতিক হ্রদটি অবস্থিত। একদিন দুপুর বেলা এই হ্রদ দেখতে গিয়ে তার সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। হ্রদের কিনারায় সুন্দর মার্বেল পাথরে নির্মিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি 'হাওয়াখানা' সত্যি অপরূপ। এরই অদূরে পর্বতের এক গুহায় রয়েছে হজরত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকীর পবিত্র সাধন-ক্ষেত্র বা 'চিলা'। হ্রদের সুন্দর স্বচ্ছ পানিতে নেমে সাঁতরিয়ে গোসল করে বেলা প্রায় দু'টোর সময় আমরা সেখান থেকে বিদায় হয়ে শহরের দিকে ফিরলাম।

"আনাসাগর" থেকে শহরে ফেরার পথে একটা পাহাড়ের উপর মহারাজা পৃথ্বিরাজের পুরোহিতের সমাধি দেখবার উদ্দেশ্যে পার্বত্য পথ বেয়ে কতক দূর অগ্রসর হয়েও আমরা শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম। বোৎপোরস্ত কাফেরের দেশে এসে খাজা সাহেব যখন প্রথম আজমীরে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন নাকি রাজার এই পুরোহিত এসে তাঁর এবাদতে বাধা জন্মাত। শেষে খাজা সাহেব এই রাজগুরুকে এমন ভাবে জব্দ করেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি দরবেশের ভক্ত হয়ে পড়েন।

আজমীরের আর একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার হচ্ছে-ওরসের সময়ের জো'মার নামাজ। এত বড় নামাজের জামাত জীবনে আর কখনো আমি দেখিনি এবং আমার বিশ্বাস, হজ্জের সময় একমাত্র আরাফাতের ময়দান ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও সম্ভবতঃ এত বড় জামাত হয় না। একমাত্র দরগার মসজিদ ছাড়া শহরের আর কোন মসজিদেই জো'মার নামাজ হয় না। ওরসের সময় বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আজমীরে এসে সমবেত হয়। কাজেই জো'মায় জামাতটা যে কত বড় বিরাট ধরণের হয়, তা সহজেই অনুমেয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক যে এ বিরাট জামাতে শরীক হয়ে বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশ্যে এক সাথে মাথা লুটিয়ে দেয়, তা হিসাব করে বলা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শুধুমাত্র এ থেকেই ব্যাপারটার বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, নামাজের সময় তকবির ধ্বনির সাথে সাথে কামান দেগে পশ্চাদবর্তী লোকদের রুকু-সেজদার ইঙ্গিত করা হয়। দুই জো'মায় এ বিরাট মহীয়ান জামাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল এবং এত বড় জামাতে নামাজ পড়তে পেরে আমরা নিজেদের প্রকৃতই ধন্য মনে করেছিলাম।

যে কয়দিন আজমীরে ছিলাম, ওরসের মউসুম বলে সে কয়দিন খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে আমাদের বিশেষ অসুবিধা না হলেও দু'একদিন যে একদম উপবাসেও কাটাতে হয়নি

www.pathagar.com

এমন নয়। একদিন সারাদিন উপোস থাকার পর বিকেল প্রায় চারটার সময় যোধপুরের মহারাজার আজমীরস্থ বাটীতে গিয়ে প্রায় এক সহস্র কাঙালীর সাথে উঠানের মাঝে বসে তিলক কাটা চৈতন-চুটকীধারী বামুনের হাতে পরিবেশিত ভাত-ঘি আর সামান্য কিছু চিনি দ্বারা বুভুক্ষার জ্বালা নিবারণ করতে হয়েছিল। আরেক বার সারা দিন খোদার বিনামূল্যের দান হাওয়া আর পানি দ্বারা চালিয়ে দিয়ে রাত প্রায় ন'টার সময় যখন খাওয়া সম্পর্কে প্রায় নিরাশ হয়ে "রেজকের মালিক" খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে শোবার আয়োজন করছিলাম, এমন সময় এক চৌদ্দ পনের বছরের ছোকরা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল একটা বাড়ির দ্বিতলে। সেখানে এক বর্ষীয়সী বিধবা আমাদের সামনে বসে বিরিয়ানী পোলাও, জর্দা, ফির্নী, নানা রকম গোশত ও কাবাব প্রভৃতি প্রায় বার-চৌদ্দ রকম উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা মায়ের মতো স্নেহে আমাদের খাওয়ালেন। খাওয়ার পর তাঁর মৃত পুত্রের রূহ নাজাতের জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করে চোখ মুছতে মুছতে নারী আমাদের বিদায় দিলেন। আর একদিন কলকাতার চাঁদনী অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন সাহেব রাত প্রায় ৮টার সময় দরগার পূব দিকের চত্বরের মাঝে আমাদের দেখতে পেয়ে দু'জনকে দু'টো টাকা আর দু'খানা মার্কিন কাপড়ের লুঙ্গী দান করে ছিলেন। বিদেশ-বিভূঁইয়ে স্বদেশের এ দাতার দান আমরা সেদিন সত্যিই মাথায়-করে নিয়েছিলাম।

দীর্ঘ পনর দিন আজমীরে কাটিয়ে একদিন সকাল বেলা স্টেশনে গিয়ে দেখতে পেলাম বেজায় কড়াকড়ি ব্যবস্থা। সুতরাং পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যাব মনে করে রেলপথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলাম। গরীবুন্নোয়াজ খাজা আজমীরীর পূণ্য স্মৃতি পড়ে রইল পশ্চাতে। সোঁতের স্যাওলার মতোই ভেসে চল্লাম আমরা এক ঘাট ছেড়ে আর এক ঘাটের পানে। চলতে চলতে ভাবছিলাম, এ যাত্রার শেষ কোথায়-কত দিনে আমাদের বাঁধন হারা তরি তার বাঞ্ছিত ঘাটে গিয়ে ভিড়বে।

www.pathagar.com

দশম মঞ্জিল

ডান দিকে তারাগড় পর্বত-মালা আর বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরই মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা রেলপথ চলে গেছে একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করেই যেন। পথ চলতে কচিৎ কদাচিৎ লোক-জনের সাক্ষাত মিলে। মনে হয়, সত্যি বুঝি স্বপ্নলোকের দেশ এ, তাই মানুষের আনাগোনা নেই এখানে। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশাখে শিখি-কণ্ঠের কেকাধ্বনি, আর বামে অদূরে মরুর মাঝে বাবলা বনে হরিণ-শিশুর নর্তন-সত্যি মনকে উদাস-পাগল করে তুলে। ইচ্ছে হয়, কল-কোলাহলময় মানব সমাজ ছেড়ে এই-জন-মানবহীন মরুর মাঝেই কোথাও একখানা শান্তি-নীড় রচনা করে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে। মরুর নির্জনতা কত সুন্দর, কত মধুর-আজমীর থেকে রওয়ানা হয়ে পরবর্তী স্টেশন "তাবিজী" পর্যন্ত সারা পথে তাই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম।

বেলা তখন প্রায় তিনটে হবে-যখন আমরা "তাবিজী" স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। ছোট্ট গেঁয়ো স্টেশন-একটা টীনের চালার আধখানায় অফিস-ঘর, আর আধখানায় ওয়েটিং রুম। কপালজোরা রক্ত চন্দনের তিলক কেটে, মাথার পশ্চাদিকে দোদুল্যমান তরমুজের বোঁটা সদৃশ প্রকাণ্ড টিকিটি নাচাতে-নাচাতে "ট্যাশন মাস্টার" (স্থানীয় লোকদের ভাষা) মশায় স্টেশনের বারান্দায়ই পায়চারী করে ফিরছিলেন। দুইটি বিদেশী "মুসাফিরকে" স্টেশনে ঢুকতে দেখে তিনি আমাদের নিকটস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব আমরা। আপাততঃ আহমদবাদই আমাদের গন্তব্য স্থান। মাস্টার মশায়কে তা জানালে তিনি মাথা নেড়ে বল্লেন, -"গাডটি আভি নাহি মিলেগা, রাতকো দশ বাজে আও।" নিকটে কোথাও মুসলমানের বাস আছে কি না, মাস্টার মশায়কে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি হস্তাঙ্গিতে স্টেশনের পশ্চাদিকস্থ একটা ক্ষুদ্র পাড়া দেখিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলেন। গাড়ী যখন শিগগীর পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আর মিছামিছি স্টেশনে বসে থেকে কোন লাভই নেই মনে করে আমরাও অগত্যা মাস্টারের উদ্দিষ্ট পাড়াটির দিকেই পা বাড়ালাম।

স্টেশন থেকে সামান্য একটু দূরেই পাড়াটি অবস্থিত। সবশুদ্ধ ত্রিশ-চল্লিশ ঘর লোক এ-পাড়ায় থাকে এবং আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। পাড়ায় একটা গম্বুজবিহীন ছোট্ট পাকা মসজিদও রয়েছে। গৃহহীনের একমাত্র আশ্রয় এই খোদার ঘরেই গিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম। তখন আসরের নামাজের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোন নামাজীকেই মসজিদে আসতে দেখা গেলো না। কাজেই আমরা নিজেরাই আজান দিয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের নামাজ

www.pathagar.com

পড়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় তের-চৌদ্দ বছর বয়সের একটি বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলে মাথায় গোলাপী রঙের পাগড়ী বেঁধে মসজিদে এসে ঢুকল এবং আমাদের পাশেই এক স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া আরম্ভ করল।

নামাজ শেষ করে নিয়ে আমরা মসজিদের বাইরে পাকা চত্তরটায় বসে ছেলেটির নামাজ পড়ার তরকীবের প্রতি লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, পাড়ার লোকগুলি শিয়া-মতাবলম্বী। এলাহাবাদে একদিন রাত্তিরে শিয়াদের মসজিদ থেকে যেরূপ অসহায় অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলাম, ক্ষণকালের জন্যে সে স্মৃতিটা মনে জেগে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত রাজপুতানার এই গেঁয়ো শিয়া মসজিদেও না জানি কিরূপ আচরণ পাই, তাই ভেবে একটু অস্বস্থিও বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নামাজ শেষ করে নিয়ে ছেলেটি আমাদের পাশে এসে বসল এবং অতি বনধুভাবে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করে আমাদের মনের সকল সন্দেহ নিমিষে দুর করে দিল। তাঁর সহিত আলাপ-আলোচনায় জানতে পারলাম পাড়ার সকল মুসলমানই "জাঠ" জাতীয়। মসজিদে ওজু করার মত যথেষ্ট পানি না থাকায় আমরা ছেলেটির কাছে কিছু পানির ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলে সে হেসে উত্তর দিল, রাজপুতানায় পানি এত সুলভ নয় যে মসজিদেও স্বতন্ত্রভাবে পানি সঞ্চিত রাখা যেতে পারে। সে আরো জানাল যে, গাঁয়ের মেয়েরা প্রায় দুমাইল দূরবর্তী কুয়োয় পানি আনতে গিয়েছে, সন্ধ্যায় তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও পানি পাওয়া যেতে পারে না। শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। যে দেশে পানি এত দুর্লভ, সেখানে মানুষ থাকে কেমন করে, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙলা-মায়ের সন্তান আমরা-আমাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা বাস্তবিকই কষ্টকর।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর ছেলেটি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলে মসজিদের চত্তরে বসে দিগন্ত-ব্যাপী মরুর পানে উদাসভাবে চেয়ে চেয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম, কত পার্থক্য সোনার বাঙলায় আর মরু রাজপুতানায়। "এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়, বাতাস কাহার দেশে"- বাঙালী কবির এ কথাটা যে কত বড় সত্যি, তা বাস্তবিকই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলাম।

মগরেবের সময়ও শুধুমাত্র জাঠ কিশোরটিই নামাজ পড়তে এল এবং আমাদের সাথে এক জামাতেই নামাজ শেষ করল। আমরা যে শিয়া নই, দিনের বেলায়ই কথায় কথায় তার কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম; সুতরাং আমাদের নামাজের তরকীব দেখে সে আদৌ বিস্মিত হলো না। নামাজ হয়ে গেলে পর আমাদিগকে অপেক্ষা করতে বলে সে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল এবং প্রায় অর্ধ ঘন্টা পর বিরাট দু'টি থালায় করে দু'থালা খাবার এনে আমাদের সামনে হাজীর করল। আমরা দেখে বিস্মিত হলাম, প্রায় আটজন লোকের খাদ্য থালা দু'টোয় রক্ষিত আছে। খাদ্যের পাঁচ-মিশালী রূপ দেখে এ-ও বুঝতে পারলাম যে,

www.pathagar.com

পাড়ার সবগুলি বাড়ী থেকেই কিছু কিছু করে তা সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। কোন বাড়ী থেকে হয়ত এক টুকরা রুটি আর একটু শাক, কোন বাড়ী থেকে সামান্য কিছু ভাত আর দুটুকরা গোশত, আবার কোন বাড়ী থেকে হয়ত বা একটু ডাল আর আধখানা চাপাতি-এরূপভাবেই সবগুলি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে আমাদের বিদেশী বালক-বন্ধু দুথালা খাবার এনে উপস্থিত করল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত খাবার কেন? হেসে সে উত্তর দিল, লোকেরা যা দিয়েছে তা-ই সে নিয়ে এসেছে। সুতরাং কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে সবগুলি রুটির টুকরা বেছে স্বতন্ত্র করে ভবিষ্যতের সম্বলরূপে আমরা তা গাঠরীতে বেঁধে নিলাম এবং ভাত-তরকারীগুলি যা পারি দুজনে মিলে গোগ্রাসে উদরস্থ করতে লাগলাম। জাঠ বন্ধু আমাদের পাশে বসে নানারূপ গল্প করতে লাগল।

খাওয়া হয়ে গেলে পর বালক থালাদ্বয় নিয়ে ক্ষণকালের জন্য বেরিয়ে গেল এবং কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল- দুধ খাওয়ার অভ্যেস আমাদের আছে কিনা। বাঙালিরা অতি সাগ্রহে দুধ খেয়ে থাকে, উত্তরে আমাদের কাছ থেকে তা জানতে পেরে আবার সে বেরিয়ে গেলো এবং সামান্য কিছুক্ষণ পরেই একটা মাটির কলসীতে করে প্রায় সের-চারেক গো দুগ্ধ নিয়ে এসে হাজির হলো। এত দুধ দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলাম। হাসতে হাসতে সে জানাল, তারা কেউ দুধ খায় না; কাজেই তাদের বাড়িতে যা দুধ হয়, সবই নিয়ে এসেছে। বিস্মিত ভাবে দুধের কলসীটা হাতে নিয়ে আমরা তা থেকে যা পারি দু'জনে মিলে পান করলাম এবং বাকীটুকুর সৎকার পরে করা যাবে মনে করে কলসীটা সযতনে মসজিদের এক কোণে রেখে দিলাম।

বালক-বন্ধুর সঙ্গে এক সাথে এশার নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ যাবত নানারূপ গল্প করে কাটালাম এবং মসজিদে শুয়েই বেশ শান্তিতে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে গাঠরী থেকে বের করে কয়েক টুকরা রুটি আর রাতের রক্ষিত দুধটুকু দ্বারা নাশতা সম্পন্ন করলাম। অতঃপর বিদেশের মাত্র এক রাতের বন্ধু সে জাঠ-কিশোরটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে "সারাধ্যা" নামক পরবর্তী স্টেশনের দিকে রেলপথ ধরে হেঁটেই রওয়ানা হলাম।

আবার মরুর পথ। উর্দ্ধ আকাশে কাঠফাটা রোদ, আর নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের কুচিতে পূর্ণ রেল-পথের পার্শ্বস্থ বালুকাময় একটুখানি পথের রেখা। এই পথ-রেখাটুকুও আবার রোদের তাপে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতোই হয়ে উঠেছিল। তারই উপর দিয়ে চলতে চলতে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় আমরা "সারাধ্যা" স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম।

বড্ড পিপাসা পেয়েছিল। তাই "সারাধ্যায়" পৌছেই সর্বপ্রথমে পানির সন্ধান করলাম। এক দয়ালু মাড়োয়ারী স্টেশনের কাছেই একটা "জলছত্র" প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। সেখানে গেলে এক মুষ্ঠি ভাজা ছোলা আর পেট পুরে পানি খেতে পাওয়া যায়। পিপাসাতুর দুই মুসাফির

www.pathagar.com

আমরা-অচেনা সে মরুর দেশে-সর্ব প্রথমেই গিয়ে দাঁড়ালাম মাড়োয়ারীর সেই "জলছত্রের" দ্বারে। দু'জনে দু'মুষ্ঠি ছোলা নিয়ম মতোই পেলাম এবং অতঃপর একটা চোঙার মুখে অঞ্জলি পেতে অপর পার্শ্ব থেকে ঢেলে দেওয়া পানির ধারা ঢক ঢক করে পান করে বাস্তবিকই তৃপ্ত হলাম।

অতঃপর আশ্রয়ের সন্ধান। "সারাধ্মা" জায়গাটা বেশ একটা বড় বাজারের মতো হলেও কোন মুসলমানেরই বাস সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, একটি মাত্র মুসলমান সেখানে আছেন এবং তিনি রেলের এক অতি-বৃদ্ধ কুলী। আমরা এই একমাত্র মুসলমান ভাইয়ের সন্ধানে স্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একটা কুলী নিকটস্থ একখানা কুড়ে-ঘর দেখিয়ে দিল এবং আমরাও তার নির্দেশ মতো সেই কুড়ের দিকেই পা বাড়ালাম। মুসলিম বর্জিত সে দেশে একমাত্র মুসলমানটি কেমন, তা জানবার জন্যে আমাদের বাস্ত বিকই বেজায় কৌতুহল হয়েছিল।

কুড়েখানার দরজায় গিয়েই আমরা আমাদের বাঞ্ছিত বন্ধুর সাক্ষাত পেলাম। প্রায় সত্তর বছর বয়সের এক বুড়ো- তাঁর চুল দাড়ি সবই শনের মতো সাদা-আমাদের অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কত যুগ ধরে যে তিনি কোনোও মুসলমানের সাক্ষাত পাননি এবং আমাদের পেয়ে যে তিনি প্রকৃতই অতি-মাত্রায় আনন্দিত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখের হাবভাবেই প্রকাশ পেল। আমাদের সালামের জওয়াব দিয়েই তিনি একখানা মাদুর বিছিয়ে আমাদের তাঁর নিকটে বসতে দিলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা ভ্রাম্যমান মুসাফির, আহমদাবাদের পথে গাড়ীর আশায় "সারাধ্মায়" এসেছি, জানতে পেরে তিনি জানালেন, সেদিন গভীর রাত্রে একখানা গাড়ী পাওয়া যাবে, আর একখানা পরদিন সকালে। রাতের গাড়ীর চেয়ে সকালের গাড়ীতে যাওয়াই ভাল বলে তিনি সে রাতটা তাঁর ওখানেই থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। গরীব বেচারা সে বৃদ্ধ রেল-কুলীর এ আতিথেয়তা ও স্বজাতি-প্রীতি দেখে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত না হয়ে পারিনি। যাক, সেদিন তাঁর কুড়েখানায় থেকে যাওয়াই আমরা মনস্থ করলাম এবং গাঠরী-বোচকা সব তাঁর জিম্মায় রেখে কাপড়াদি পরিবর্তন করে তাঁর সাথে বসে গল্প আরম্ভ করলাম।

বৃদ্ধের ইতিহাস বড় করুণ। কথায়-কথায় ব্যথা কাতর স্বরে তিনি জানালেন-আঠার বছর বয়সে তরুণ যৌবনে একদিন "সারাধ্মায়" এসে রেলের কুলীর কাজে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন; তার পর থেকে এ দীর্ঘ কাল এখানেই তাঁর কেটেছে। বে-শাদি জীবনে তিনি করেন নি; সুতরাং পুত্র কন্যা বা আত্নীয় স্বজনের কোন আপদ-বালাই তাঁর নেই। যতদিন যৌবন ছিল, দেহে তাকৎ ছিল, কুলীর কাজ ততদিন তাঁর চাইতে আর কেও যে ভালো করতে পারেনি, তা বর্ণনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বল্লেন, -"আভি কাম করনা মুঝে ন্যাহি আতা হায়; মগর বাবুলোগ আভি তক মেরা রুটি জারী রাখা। কোম্পানী কা তরফসে মুঝে দশ রুপেয়া

www.pathagar.com

মাহোয়ার মিলতা হ্যায়।" কথাটা বলেই বৃদ্ধ চোখ মুদে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করলেন। বুঝি সুদূর অতীতের যৌবনের সোনার দিনগুলির সুখকর স্মৃতিই তাঁর মনে জেগে উঠছিল।
কোন দারুণ ব্যথার অভিশাপে যে বৃদ্ধ তাঁর সমগ্রটা জীবন এমনতরো স্বেচ্ছায় ব্যর্থ করে দিলেন এবং তাঁর জীবন-ভোর প্রায়শ্চিত্তের মূলেই বা কোন রহস্য লুক্কায়িত ছিল, অনেক চেষ্টা করেও বৃদ্ধের কাছ থেকে তৎসম্বন্ধে কোন-কিছুই জানতে পারিনি। তাঁর জীবনের এই ব্যর্থতার কাহিনী শুনে মনটা এতই ব্যথিয়ে উঠেছিল যে, সন্ধ্যায় নিজে মুদির দোকান থেকে আটা কিনে এনে বৃদ্ধের সামনে বসে নিজ হাতে রুটি পাকিয়েও খেতে বসে রাত্তিরে বিশেষ কিছুই খেতে পারিনি। বৃদ্ধের ছেঁড়া একখানা কম্বলের সাথে আমাদের দু'জনের দু'খানা কাপড় বিছিয়ে শুয়ে একথা সে কথা আলোচনা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা জানতেও পারিনি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের অনেক আগে থেকেই উঠে বৃদ্ধ চুল্লী জ্বালিয়ে রুটি পাকাতে বসে গেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাড়াতাড়ি চারখানা রুটি পাকিয়ে দু'খানা বৃদ্ধের জন্যে রেখে, আর দু'খানা আমাদের পথের সম্বলরূপে গাঠরীতে বেঁধে নিয়ে তাড়াহুড়া করে গাড়ী ধরার জন্যে স্টেশনের দিকে দৌড়ালাম। বিদায় বেলায় বৃদ্ধ আমাদের উভয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে অসহায় শিশুর মতোই হাউ-মাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যর্থ-জীবনে মাত্র একদিনের জন্য যে স্বজাতীয় দু'টি অতি-আপনার জন তাঁর দ্বারে এসেছিল, তাদের বিদায় দিতে সত্যি ব্যথায় তাঁর হৃদয়খানা যে ভেঙে পড়ছিল, তার চোখের জলে তারই আভাষ ফুটে উঠেছিল।
কিন্তু হায়, এ হতভাগ্য বৃদ্ধের জন্যে কিছু করার ক্ষমতাই আমাদের ছিল না। সুতরাং ব্যথিত হৃদয়েই এসে আমরা গাড়ীতে চেপে বসলাম এবং সারাদিন গাড়ীতে কাটিয়ে রাত প্রায় আটটার সময় "আবু-রোড" স্টেশনে নেমে পড়লাম। পথে "বেওয়ার" এবং "মাড়োয়ার জংশন" এ দু'টো বড় স্টেশন পড়লেও ইচ্ছা করেই এ-সব জায়গায় নামিনি। কারণ, পকেটে কানাকড়ি সম্বল না নিয়েও নবাবী হালে রেলে ভ্রমণ করতে গেলে যথেচ্ছভাবে এখানে সেখানে নামা অনেক সময় নানা কারণেই সম্ভব হয়ে উঠে না।
ছেলে-বেলায় স্কুলে ভুগোল পড়তে গিয়ে বিখ্যাত স্বাস্থ্য-নিবাস "মাউন্ট আবু" নাম মুখস্থ করেছিলাম। তা স্বচক্ষে দেখার মতলবেই "আবু রোড" মসজিদে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। কিন্তু মসজিদে গিয়ে জানতে পারলাম, স্টেশনে নামলাম এবং রাতটুকু কাটাবার জন্য আপাততঃ নিকটস্থ একটা আবু-পাহাড়ে যেতে হলে নাকি সেখান থেকেও অনেক দূর পথ হেটে যেতে হয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আবু-পর্বতের স্বাস্থ্য-নিবাস দেখার সংকল্প ত্যাগ করতে হলো। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে নিকটস্থ পার্বত্য নদীটিতে গিয়ে তার দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হলাম। দেখলাম, নদীর কোথাও এক কাৎরা পানি নেই-কেবল

www.pathagar.com

বালুচর ধূ-ধূ করছে। উঁচু কিনারা বেয়ে অতি কষ্টে আমরা নদীর সে বালুকাপূর্ণ বক্ষে অবতরণ করলাম এবং একস্থানে হাত দিয়ে কিছু বালি সরিয়ে নীচে পানি দেখে আরো বিস্মিত হলাম। অন্তঃসলিলা নদীর কথা এতদিন কেবল বইয়েই পড়েছিলাম; আবু-পাহাড়ের পাদদেশে এসে তা-ই স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হলো। নদীর উপর দিয়ে অনায়াসে জুতো পায়ে দিয়ে চলা যায়, অথচ বালির নীচে পানির অফুরন্ত ধারা। দেখলে বিশ্ব-শিল্পী খোদার মহিমার কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে এবং সে মহীয়ান শিল্পীর মহিমার তলে মাথা লুটিয়ে দিবার ইচ্ছা হয়। সত্যি, খোদার কুদরতের সীমা নেই।

নদীর এক স্থানে বালি সরিয়ে সঞ্চিত পানিতে আমরা দুজনে প্রাণ ভরে অতি শান্তিতে গোসল করলাম এবং সেখান থেকে উঠে এসে সারাটা দিন স্টেশনের পার্শ্ববর্তী মসজিদটাতেই শুয়ে কাটালাম। অতঃপর রাত্রে সাড়ে আটটার সময় স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে আহমদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

পালনপুর, মেহসানা, কালোল, সবরমতি প্রভৃতি বড় বড় স্টেশনগুলি পেরিয়ে বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা আহমদাবাদ গিয়ে পৌঁছলাম। গান্ধীজীর আশ্রমের জন্যে "সবরমতি" জায়গাটা যদিও জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছে, তথাপি যে-সময়ে আমরা আহমদাবাদ গিয়েছিলাম তখন পর্যন্ত তা অনেকাংশে অজ্ঞাতেই ছিল। সুতরাং গান্ধীজীর এক সময়ের বাসস্থান "সবরমতি" কোনো আকর্ষনেই আমাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি' এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা আহমদাবাদ স্টেশনে পৌঁছে গাড়ী থেকে অবতরণ করলাম।

স্টেশন থেকে সামান্য একটু দূরেই শহর। আমরা স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে শহরের প্রান্ত দেশে পা দিয়েই চারদিকে বন্দুকধারী মিলিটারী পাহারার বাড়াবাড়ি দেখে বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, রাউলাট-আইনের প্রতিবাদ ব্যাপারেই সম্ভবতঃ শহরে কোনো গোলযোগ হয়েছে এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যেই গোরা-সিপাহীদের পাহারার বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। যাক, আপাততঃ কোনো মুসাফিরখানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারলেই বাঁচা যায় ভেবে, আমরা লোককে জিজ্ঞাসা করে করে প্রায় মগরেবের সময়ে গিয়ে একটা মুসাফির খানায় উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মুখে শহরের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে একেবারেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কর্মচারীটা বেশ বন্ধুভাবে আমাদের জানালেন, শহরে সাঁঝ-বাতির আইন জারী আছে এবং কোনো বিদেশী লোককেই যাতে মুসাফিরখানায় আশ্রয় দেওয়া না হয়, তজ্জন্য সরকারের তরফ থেকে কঠোরভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে; কাজেই মুসাফিরখানায় আমাদের স্থান হতে পারে না।

চরম বিপদে পড়লাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত পথে বের হওয়া নিষিদ্ধ; সাড়ে সাতটা বাজারও আর আধ ঘন্টার বেশি সময় নেই। সুতরাং কি যে করব, প্রথমতঃ কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। অবশেষে নেহায়েত নিরুপায় হয়েই

www.pathagar.com

মুসাফিরখানা থেকে বেরিয়ে নিকটস্থ জোমা মসজিদে গেলাম। কিন্তু "অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।" জুমা মসজিদের দ্বার থেকেও ফিরতে হলো আমাদের নিরাশ হয়েই- সেখানেও নাকি কর্তৃপক্ষের একই হুকুম জারী হয়েছে।

ক্ষণকালের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মনে হলো, এমন বিপদে বুঝি জীবনে আর কখনো পড়তে হয়নি। শহরের প্রতি রাস্তায় বন্দুকে সঙ্গীন উঁচিয়ে লালমুখো গোরা সেপাইগুলান টহল দিয়ে ফিরছিল। চারিদিকেই যেন বিভীষিকার ঘনঘটা। এর-ই মধ্যে বিপন্ন যুগল মুসাফির আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে বিরাট বিপদকে মাথায় করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

সাড়ে সাতটা বাজবার আর দশ মিনিট বাকী। একটা বাড়ির দরজায় দণ্ডায়মান এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক কাছে ডেকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন এবং সমুদয় অবগত হয়ে পরামর্শ দিলেন, আর একটা মিনিটও বৃথা নষ্ট না করে সোজা স্টেশনের দিকে পালাবার জন্যে। তিনি বল্লেন, শহরে কোথাও আমাদের আশ্রয় পাওয়ার তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই; সুতরাং শহরের সীমানা ছাড়িয়ে স্টেশনে গিয়ে আত্মরক্ষা করাই উচিত। সদয়-হৃদয় এ ভদ্রলোকের পরামর্শের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে আমাদের আদৌ বেগ পেতে হলো না। সুতরাং আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সোজা স্টেশনের দিকেই দৌড়ালাম।

শহরের সীমানার বাইরে স্টেশনের সম্মুখস্থ ধর্মশালাটিতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, আমাদের মতো আরো শত শত হতভাগা ভাগ্য-বিতাড়িত হয়ে এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। প্রকাণ্ড আটচালা ঘরটির কোথাও তিল-ধারণেরও আর ঠাঁই ছিল না। অনেক কষ্টে এক কোণে একটু জায়গা আবিষ্কার করে নিয়ে আমরা কোনো রকমে সেখানেই কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং মস্ত বড় একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রকৃতই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নানা-রকম ভাষাভাষী শত-শত নর-নারী বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতিতে পূর্ণ হয়ে ধর্মশালাটা যেন একটা আজব চিড়িয়াখানায়ই পরিনত হয়েছিল। কেউ দল-পাকিয়ে বসে গল্প করছিল, কেউ গুড় দিয়ে ছাতুর মণ্ড তৈরি করে উদর-জ্বালা নিবারণের ব্যবস্থা করছিল, আবার কেউ হয়ত বা সেই বিরাট ভীড়ের মাঝেই এক পাশে চুল্লী জ্বালিয়ে খানা পাকাতে বসে গেছিল। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত চল্ল এরূপ ধরণের অবিরত হল্লা। তারপর স্বভাবতঃই সব নীরব নিঝুম হয়ে এল।

কিন্তু এ নীরবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কিছুক্ষণ পরেই ধর্মশালার চৌকিদারের হাঁকডাকে আমরা উঠে বসলাম এবং চোখের সামনে যা দেখলাম, তাতে বাস্তবিকই বিস্মিত ও লজ্জিত না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, আমাদের বিছানা থেকে হাত-দশেক দূরে এক জায়গায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত এক জোড়া নর ও নারীকে (রাজপুত হিন্দু বলেই মনে হলো) চৌকিদার তার হাতের লাঠির গুঁতো দিয়ে উঠে বসিয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য করে যথেচ্ছ ভাবে অশ্লীল

www.pathagar.com

কতকগুলি কথার আবৃত্তি করে যাচ্ছে। চৌকিদারের এ-সব কথা থেকে বুঝা গেল, সে এসে নর ও নারী উভয়কে এমন আপত্তিজনক অবস্থায় পাকড়াও করেছে, যা নাকি ধর্মশালার প্রকাশ্য স্থানে অনুষ্ঠিত না হয়ে গোপন বাসর-ঘরে অনুষ্ঠিত হওয়াই উচিত ছিল। নর ও নারী তখন শত শত লোকের মাঝে মাথা নিচু করে বসে চারদিক থেকে অবিরত উচ্চারিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপরাশি নীরবে হজম করে যাচ্ছিল। বেহায়া চৌকিদারটা এর উপর আবার তার হস্তস্থিত লাঠিটা দিয়ে লজ্জাবনতা নারীটির গায়ে একটা মৃদু আঘাত হেনে জিজ্ঞাসা করল, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে সহস্র লোকের চোখের সামনে কেমন করে সে কামনার গন্ধম-ফলটা তার সঙ্গী পুরুষটিকে অবাধে পরিবেশন করতে পারল? নারী মাথা নীচু করে ছোট্ট একটা কথায় উত্তর দিল, -"মেরা খশম হ্যায়।" বুঝতে পারলাম, আগুনের পাশে ঘি রাখলে কেমন করে তা আপনা আপনিই দ্রবীভূত হয় এবং নারী-মাংসের গন্ধই বা কেমন করে পুরুষের ভেতরের পশুটাকে পাগল করে তুলে। কবির কথায় মনে পড়িল, সত্যি ঃ

"এ মানুষ-সেও পশু হয় মাটির পরশে।"

যাক, অপরাধী নর ও নারীকে সব্বাই মিলে ধিক্কার দিতে দিতে ঘর থেকে বের করে দিল এবং আমরাও অতঃপর শুয়ে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দুর্ভোগের দেশ আহমদাবাদ ত্যাগ করে প্রথম ট্রেনেই বরোদার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

www.pathagar.com

একাদশ মঞ্জিল

নাদিয়াদ, আনন্দ প্রভৃতি বড় বড় কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে বিকেল প্রায় চারটের সময় বরোদা স্টেশনে এসে গাড়ী থেকে নামলাম। শহর স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দু'য়েক দূরে। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়েই আমরা সোজা শহরের পথ ধরলাম। সুরকী দিয়ে পাকা সুন্দর রাস্তা দু'পাশে সারি সারি বৃক্ষে গাছের শাখায় শাখায় ডারুইনের পূর্ব পুরুষ, রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযানের প্রধান সহায় বানর-দলের আস্তানা। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্বে পরিচালিত একটা শহরে এত বাঁদর কেমন করে অবাধে আস্তানা করে থাকতে পারছে, তাই ভেবে প্রথমে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, হনুমান-ভক্ত হিন্দু রাজ-কর্তপক্ষের তরফ থেকে নাকি আইন করে এসব বানরকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ একটা বানরকেও বধ করে এবং যদি তা রাজ-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নাকি আইন করে এস-সব বানরকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ কটা বানরকেও বধ করে এবং যদি তা রাজ-কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন, তবে কঠোর সাজার ব্যবস্থা আছে। রাজকীয় আইনের এই সংরক্ষণী ব্যবস্থায় বানরদলের সাহস যে কত বেড়ে গিয়েছে, পথ চলতে চলতে তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম। প্রকাশ্য রাজপথে অবাধে বিচরণ করতে করতে যথেচ্ছভাবে বাঁদরামীর অনুষ্ঠান করতঃ লোক-জনকে বিব্রত করে বানর-বাহিনী যেন সত্যি আনন্দ পাচ্ছিল। এ-সব কাণ্ড দেখে এক-একবার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন রামায়ণের কিস্কিন্ধা রাজ্যেরই কোনো পথ বেয়ে চলেছি। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ী-ঘোড়া ও মোটরের আওয়াজে বুঝতে পারছিলাম-আমরা দু'হাজার বছর আগেকার রামায়ণের যুগে নই, বরং বর্তমান বিংশতি শতাব্দীরই একটা উন্নত নগরীর বুকের উপর দিয়ে পথ বেয়ে চলেছি।

স্টেশন থেকে আধ মাইল খানেক পথ সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তার বাঁ পাশে কিয়দ্দুরে একটা মসজিদ দেখতে পেয়ে আমরা রাস্তা ছেড়ে সে দিকেই অগ্রসর হলাম। কুমোর-পাড়ার মাঝখান দিয়ে গেঁয়ো পথ চলে গিয়েছে মসজিদের কাছ পর্যন্ত। গোরস্থানের মসজিদ। মসজিদের চারপাশে বিরাট বাগানের মাঝে সারি সারি কবরই কেবল দেখা যাচ্ছিল। মসজিদে ঢুকে ওজু করে আমরা প্রথমে আসরের নামাজটা সেরে নিলাম এবং অতঃপর কি করা যায় তাই পরামর্শ করতে বসলাম। মোর্দ্দা রাজ্যের এই মসজিদে রাত্রি-যাপন করার মতো সাহস আমার কিছুতেই হচ্ছিল না। কিন্তু সঙ্গী বন্ধু মফিজ বসল বেঁকে।

www.pathagar.com

গত ক'মাসের মুসাফির জীবন তার স্বাস্থ্যটাকে একেবারেই নাজেহাল করে তুলেছিল; আর পথ-চলতে কিছুতেই সে রাজী হলো না। সুতরাং সাহসে না কুলালেও বাধ্য হয়েই সে রাতের জন্যে আমাদের গোরস্থানের সেই মসজিদেই আস্তানা জমাতে হলো।

মগরেব ও এশার নামাজ শেষ করলাম দু'জনায় একা-একাই। গোরস্থানের সে নিরিবিলি মসজিদে নামাজ পড়তে কেই বা আসে। এশার নামাজের পর বিসমিল্লাহ বলে দু'জনেই মসজিদের বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। শোবার সময় তিনবার "কুলহুআল্লাহ" পড়ে বুকে তিনটা ফুঁ দিয়ে নিতে ভুললাম না। কিন্তু চোখের সামনে কেবলি নানা রকম ভূত-প্রেতের ছবি ক্রমে-ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। এক-একবার মনে হচ্ছিল, চার পাশের কবরগুলি থেকে যেন যত-রাজ্যের সব মোর্দা উঠে এসে আমাদের ঘিরে বিরাট একটা কনফারেন্সের আয়োজন করছে। আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে মফিজকে বল্লাম, "চল, ভাই শীগগীর, এ মোর্দার রাজ্যে আর বেশিক্ষণ থাকলে বুঝি আমাদেরও তাদেরি সামিল হতে হয়।"

মফিজেরও ভয় কম হয়নি, সেও আমারি মতো ভয়ে কাঁপছিল। সুতরাং মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়তে আমাদের এক মিনিটও দেরী হলো না। বেরিয়ে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে দু'জনায় মিলে সোজা সামনের দিকে দিলাম দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে এক-একবার মনে হচ্ছিল, পেছন পেছন কে যেন দুপদাপ করে ছুটে আমাদের পাকড়াও করতে আসছে। ফিরে তাকাবার সাহস হলো না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুমোড়-পাড়াটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিয়েছি। বড় রাস্তায় এসে একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে এলো না; দূরে কুমোর-পাড়ায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ চীৎকার করছিল, তাই শুনতে পেলাম।

স্থির করলাম, স্টেশনে গিয়ে সেখানেই শুয়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবো। সুতরাং আবার স্টেশনের পথেই ফিরে চল্লাম। কিছুদূর গিয়ে স্টেশনের সামান্য একটু দূরে একটা গাছতলায় একদল ভিখেরীকে শুয়ে থাকতে দেখে আমরাও তাঁদেরই মাঝে এক জায়গায় কাপড় বিছিয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ পর বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্টেশনে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিকটস্থ এক দোকান থেকে মুড়ি কিনতে গিয়ে বরোদা-রাজের নিজস্ব পয়সার সঙ্গে পরিচিত হলাম। পয়সাগুলির একপাশে বরোদা-রাজের মুর্তি এবং অপর পাশে একটা গরুর ক্ষুরের নীচে একখানা উন্মুক্ত তরবারির ছবি অঙ্কিত। বরোদা-সরকারের নিজস্ব টাকা-পয়সা, এমন কি নোট পর্যন্ত আছে।

মুড়ি কিনে নাশতা করে অতঃপর শহরের পথ ধরলাম। বেলা প্রায় ন'টার সময় শহরে পৌছে জোমা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বরোদার এই জোমা মসজিদটা বাস্তবিকই দেখবার মতো। খাটি মার্বেল পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড মসজিদ পাক-ভারতের আর কোথাও

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ নেই। মসজিদখানা তৈরি করতে যে কমসে কম চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, তা দেখেই বুঝা যায়।

জোহরের নামাজের পর শহর দেখতে বেরুলাম। বরোদায় দেখবার মতো জিনিষ রাজ-প্রাসাদ, রাস্তার মাঝখানের কয়েকটা তোরণ-দ্বার, আর প্রকান্ড একটা দীঘি। এত বড় দীঘি পরে একমাত্র নাগপুর শহরেই একটা দেখেছিলাম। তাছাড়া পাক-ভারতের আর কোথাও এমন প্রকাণ্ড দীঘি নজর পড়েনি।

সারা দিন পথে পথে টো-টো করে ঘুরে সন্ধ্যার পর আবার জোমা মসজিদেই ফিরে এলাম, এবং রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনেই সুরাটের পথে পাড়ি দিলাম। বেলা প্রায় চারটের সময় "ব্রোচ" নামক একটা স্টেশনে এসে গাড়ী থামল। স্টেশনটা বেশ বড় দেখে পূর্ব-সংকল্প না থাকলেও সম্পূর্ণ কৌতুহল-পরবশ হয়েই আমরা সেখানে নেমে পড়লাম। ইচ্ছা ছিল, নেমে স্টেশনের এদিক-সেদিক দেখে নিয়ে আবার গাড়ীতে চেপে বসব। কিন্তু স্টেশন থেকে বেরিয়ে নিকটস্থ একটা দোকানে বসে আমরা চা খাচ্ছি-এমন সময় দিল গাড়ী ছেড়ে। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদিগকে সেদিনের মতো ব্রোচেই কোথাও একটা থাকবার জায়গা আবিষ্কার করে নেবার চেষ্টায় বেরুতে হলো।

পাহাড়ে জায়গা হলেও শহরটা একেবারে নেহায়েত ছোট নয়-বাঙলার একটা মহকুমা টাউনের মতো হবে। বাজারের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা বেশ বড় মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মসজিদের পাশেই সুন্দর একটা পাকা এমারতের ভেতর এক শাহ সাহেবের মাজার। শাহ সাহেবের নামটা আজ আর আমার মনে পড়ছে না; কিন্তু দরগাটা বেশ প্রভাব-সম্পন্ন বলেই মনে হলো। দেখতে পেলাম, নানা দেশ থেকে বহু ভক্ত এসে দরগার প্রাঙ্গনটাকে সরগরম করে রেখেছে। আমরাও এই বিরাট ভক্তবাহিনীর মধ্যেই এক পার্শ্বে একটু স্থান করে নিয়ে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালের কথা। ফজরের নামাজের পর দরগার দাওয়ায় বসে আছি এমন সময় সম্মুখবর্তী একটা ঘরে একদল ভীষণ-দর্শন কাফ্রীকে মাদল বাজিয়ে নৃত্য করতে দেখতে পেলাম। সাদা থান কাপড়ের আধখানা লুঙ্গির মতো কোমরে জড়ানো, আর আধখানা চাঁদরের মতো গলায় ঝুলানো-এই অপরূপ বেশে সজ্জিত বিশ-পঁচিশটি কাফ্রী এক সাথে মিলে মাদল বাজিয়ে বাজিয়ে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করেছিল। কী ভীষণ তাদের সে জংলী নাচ। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের লাল-লাল চোখগুলি অঙ্গারের মতোই জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে পিষে মারবার জন্যিই যেন তারা ক্ষেপে উঠেছে!

প্রায় এক ঘন্টা এরূপভাবে নেচে-কুদে অবশেষে দরগার চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে, কাফ্রীদল পুণরায় নিজেদের ঘরে গিয়ে বসল। এতক্ষণ পর্যন্ত দরগার বারান্দায় বসে বসে আমরা এদের এ তাণ্ডবলীলা দেখে সত্যিই অনেকটা ভীতি-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

www.pathagar.com

এক্ষণে এই তাণ্ডবের অবসানে যেন কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সারাদিন দরগায়ই কাটিয়ে বিকেলের দিকে স্টেশনে ফিরে গিয়ে সুরাট যাত্রার উদ্দেশ্যে আমরা গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ীতে বসে কাত্রীদের সে পৈশাচিক নৃত্যের ছবিটাই বারে-বারে চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। এই অসভ্য জংলী জাতটার প্রকৃতি যে কত ভীষণ হতে পারে, তা-ই ভাবছিলাম।

রাত প্রায় একটার সময় সুরাট স্টেশনে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম এবং বাকী রাতটুকু স্টেশনে শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা করে অতঃপর শহরে প্রবেশ করলাম। শহরটা বেশ উন্নতিশীল জায়গা বলেই মনে হলো। রাস্তায় দু'পাশে বড় বড় দালান-এমারত এবং অসংখ্য দোকান পাট দেখে শহরের সমৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বেলা প্রায় দশটার সময় জোমা মসজিদে পৌঁছে আমরা সেখানেই আস্তানা জমালাম এবং দু'একজন সমৃদ্ধিশালী মুসল্লীর আতিথেয়তার কল্যাণে সে দিনটা আমাদের বেশ নির্ভাবনায়ই কেটে গেলো।

পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পর আরো কয়েকজন মুসাফিরের সাথে আমরা মসজিদের বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় এক প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক এসে আমি, মফিজ এবং আরও দু'জনকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর সাথে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করলে পর, ভদ্রলোক একটি ভেড়া এনে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং সম্মুখস্থ উদ্যানে তাকে জবাই করে সমুদয় মাংস নিয়ে গিয়ে মসজিদ সংলগ্ন মুসাফিরখানায় পাকিয়ে খাবার ব্যবস্থা করতে বল্লেন। শুনতে পেলাম, ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলের ভীষণ অসুখ হওয়ায়ই "সাদকা" স্বরূপ ভেড়া কোরবানীর এই ব্যবস্থা হয়েছে। গোশত পাকাবার মসলাদি ক্রয় করবার জন্যে ভদ্রলোক আমাদের হাতে নগদ চারটি টাকাও দিলেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদিগকে ভেড়া জবাই করে তার গোশত পাকিয়ে খাবার গোলমেলে কাজে হাত দিতে হলো।

ভেড়া জবাই করে বেলা প্রায় দশটার মধ্যে আমরা গোশত কেটে তৈরি করলাম এবং ভদ্রলোকের উদ্যান-বাটিকা থেকে তা একটি ডেগে করে মসজিদে নিয়ে এলাম। সেখানে এসে মুসাফিরখানার রসুইঘরে সব্বাই মিলে গোশত ও খিচুড়ী পাকিয়ে রাত্তিরে বেশ তৃপ্তির সাথেই আহার করলাম। আনাড়ি হাতের পাক হলেও মসজিদে উপস্থিত আমরা প্রায় এক ডজন মুসাফির সেদিন বেশ তৃপ্তির সাথেই ভেড়ার গোশত আর সেই অপরূপ খিচুড়ী খানা উপভোগ করেছিলাম।

প্রায় এক ডজন মুসাফির মিলে আহার করলেও ভেড়ার সবটা গোশত রাত্রিরেই খেয়ে শেষ করা সম্ভবপর হলো না। যা কিছু বাকী ছিল, পরদিন সকালে সব্বাই মিলে তারও দফা রফা করে দিলাম এবং অতঃপর যার যার পথে পাড়ি জমালাম। সুরাট থেকে মাইল তিনেক

www.pathagar.com

দূরে “নান্দেল” নামে একটা অতি সমৃদ্ধিশালী গাঁও আছে শুনে, আমি আর মফিজ সেদিকেই অগ্রসর হলাম।

মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে-যাওয়া লাল কাঁকরের বাঁধানো পথ ধরে চলতে চলতে বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা “নান্দেল” গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম এবং চার দিকে লক্ষ্য করে প্রকৃতই বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। মিউনিসিপ্যাল সম্পর্ক শূন্য একটা সত্যিকার পাড়াগাঁ যে এতটা সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে, আগে তা কল্পনা করতে পারিনি। চার দিকেই প্রাসাদতুল্য বড় বড় পাঁচতলা-ছয়তলা অট্টালিকা; বাঁধানো রাস্তাঘাট পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করছে-সুন্দর জায়গা। সমগ্র ভারতে এমন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আর নেই, একথা সুরাটে থাকতেই শুনেছিলাম। কথাটা যে কত সত্যি, গাঁয়ে পা দিয়েই তা বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম।

গাঁয়ের বাসিন্দাদের সব্বাই মুসলমান। বিদেশী মুসাফির-মিসকীনদের জন্যে তাঁরা একটা “মুসাফিরখানা” খুলে রেখেছেন। যে-কেও সেখানে গিয়ে সাত দিন পর্যন্ত থেকে বিনা-খরচায় দু'বেলা খেতে পায়। সুতরাং গাঁয়ে পৌঁছেই আমরা সর্ব প্রথমে এই মুসাফিরখানায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

মুসাফিরখানার নিকটস্থ একটা মসজিদে জোহর ও আসরের নামাজ শেষ করে নিয়ে অতঃপর আমরা এদিক সেদিক ঘুরে গ্রামখানা ভালো করে দেখে নেবার মতলবে পথে বেরিয়ে পড়লাম। সারাটা গ্রামে সবশুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বেশী হবে না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ-রি মধ্যে মসজিদ প্রায় ডজনখানেক নির্মাণ করা হয়েছে। এ-বাড়ী সে-বাড়ী প্রতিযোগিতায়ই যে এসব মসজিদ গড়ে উঠেছে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তা বুঝতে পারলাম। বাসিন্দাদের সব্বাই যথেষ্ট ধন-দৌলতের অধিকারী হওয়ায় পরস্পর প্রতিযোগিতায়ই তাঁরা এতগুলি খোদার-ঘর তৈরি করে পূণ্য সঞ্চয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। সব কটা মসজিদই অপরূপ; -কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর যে মসজিদটা, তা তৈরি করতে কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে মনে হলো। মসজিদটী ত্রিতল-মাটির নীচে একতল এবং উপরে দ্বিতল। বহুমূল্য সব মার্বেল পাথর দিয়ে এমারতটা তৈরি করে তাতে সোনারূপা ও জওহেরাতের কারুকার্য্য করা হয়েছে। গাঁয়ে বিজলীবাতির কোন ব্যবস্থা না থাকলেও, শুধু এই মসজিদে আলোক সরবরাহের জন্যিই বিশেষভাবে একটা বিদ্যুত-শক্তি উৎপাদক প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। মসজিদখানা দেখতে গিয়ে এই সব শান-শওকৎ দেখে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

সমগ্রটা গ্রাম পরিদর্শন করে মগরেবের পর আমরা মুসাফিরখানায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই দুইটি কনেষ্টবল এসে হাজীর হলো। তারা আমাদের জানাল, দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিদেশী মুসাফির মাত্রকেই রোজ দু'বেলা থানায় হাজীরা দিতে হয়; সুতরাং আমাদেরও

www.pathagar.com

তাদের সাথে অবিলম্বে থানায় যেতে হবে। পুলিশ প্রভুদের কথার অবাধ্য হলে আর রক্ষা নেই জেনে, আমরা তাদের কথামত নেহায়েত শান্ত-শিষ্ট ভেড়া কান্তের মতোই থানার দিকে রওয়ানা হলাম।

থানা মুসাফিরখানা থেকে আধ-মাইলের বেশি দূর হবে না। সুতরাং অল্পক্ষনের মধ্যেই সেখানে পৌছে গুজরাটি বামুন দারোগার সামনে আমাদের দাঁড়াতে হলো। দারোগা পুঙ্গব আমাদের চৌদ্দ পুরুষের কুর্সীনামা জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করলেন দেখে মনে হলো, বুঝি বা তিনি আমরা দুইটি তরুণ কিশোরের শাদী মোবারকেরই আয়োজন করছেন। কিন্তু সওয়ালের পালা শেষ করে তিনি যখন আমাদের নিকটে এসে ডাক্তারের মতোই শরীর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, তখন শাদী মোবারকের রঙীন কল্পনা ত্যাগ করে কতকটা বিব্রত হয়েই পড়তে হলো। শরীরের প্রায় সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দারোগা মহাশয় অবশেষে অনেক কষ্টের পর আমার চোয়ালের ডান দিকে ছেলে-বেলার এক ফোঁড়ার দাগ আবিষ্কার করে তাঁর খাতায় তার বিবরণ লিখে নিলেন। এইরূপভাবে মফিজের বিষয়েও সবকিছু লিখে নিয়ে শরীর পরীক্ষা শেষ করে আমাদিগকে বিদায় দেওয়া হলো। বিদায় বেলায় দারোগা মশায় আমাদের বলে দিলেন যে, যতদিন আমরা "নান্দেলে" থাকি, রোজই যেন দু'বেলা থানায় হাজিরা দিতে না ভুলি।

মুসাফিরখানায় বিনি-পয়সার খানা পেয়ে আমরা চারদিন পর্যন্ত "নান্দেল" থেকে নড়বার নামটিও করলাম না। বলা বাহুল্য, এই চারদিন প্রত্যহই আমাদিগকে থানায় গিয়ে দু'বার করে দারোগা মশায়ের বদন-মণ্ডল জেয়ারত করে আসতে হয়েছিল।

পঞ্চম দিন দুপুরের খাওয়ার পর আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা সুরাটের পথে রওয়ানা হলাম এবং সেদিন রাতটুকু সুরাটের সেই জো'মা মসজিদেই কাটিয়ে পরদিন সকালে বোম্বাইর গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ী দুলে দুলে চলতে লাগলো, আর আমরা তার মধ্যে বসে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করতে লাগলাম। ক্ষণিকের উত্তেজনায় গৃহত্যাগ করে এ তরুণ বয়সে বিবাগী সেজে জন্মভূমি থেকে কত দূরেই না চলে এসেছি, তা ভাবতে গিয়ে মনের মাঝে বঙ্গ-পল্লীর একখানা ক্ষুদ্র কুটীরের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। কবির কথায় বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল ঃ

> "ঘরছাড়া এ পাগলটাকে
> এমন ক'রে কেগো ডাকে-
> করুণ গুঞ্জরি।"

www.pathagar.com

দ্বাদশ মঞ্জিল

অনেকগুলি স্টেশন পেরিয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় বোম্বাই শহরতলির "বান্দরা" স্টেশনে পৌছে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। "বান্দরা" জায়গাটা অনেকটা ঢাকার তেজগাঁও বা গেন্ডারিয়ারই মতো। মিউনিসিপ্যালিটির Slaughter House এখানে আছে বলে এটা কশাইদের একটা মস্তবড় আড্ডা। চর্ম ব্যবসায়ী একদল মুসলমানও এখানে কারবার ফেঁদে বসে আছে দেখা গেল। স্টেশনে নেমেই আমরা বাজারের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা বেশ বড় মসজিদে গিয়ে ঢুকলাম এবং গাঁঠরী বোচকা সব নামিয়ে রেখে সেদিনকার মতো সেখানেই আস্তানা বসাবার ব্যবস্থা করলাম।

মগরেবের নামাজের সময় মোয়াজ্জিন সাহেবের সাথে পরিচয় হলো। তাঁর জন্মভূমি চাটগাঁয়ে-কয়েকবার হজ্জ করে এসে তিনি "বান্দরায়ই" বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করছেন। ভদ্রলোকের নামটা আজ আর আমার মনে পড়ছে না; কিন্তু স্বদেশের দু'টি মুসাফিরকে তিনি যে যত্ন করেছিলেন, আজো তা ভুলতে পারিনি।' সেদিন রাত্রিতে এবং পরদিন দুপুরে মোয়াজ্জিন সাহেবের দেওয়া খাবার খেয়ে বিকেলের দিকে আমরা "বান্দরা" থেকে পায়ে হেঁটেই বোম্বাইর দিকে যাত্রা করলাম।

"বান্দরা" থেকে বোম্বাই যেতে হলে "বান্দরা" ছাড়িয়েই একটা জলাভূমি পাওয়া যায়। এ-টা সমুদ্রেরই একটা খাঁড়ি। ভাটার সময় এতে পানি আদৌ থাকেনা; কিন্তু জোয়ারের সময় ভরে একেবারে সয়লাব হয়ে যায়। এই জলাভুমির মাঝখান দিয়েই মিউনিসিপ্যালিটির উঁচু সড়ক চলে গিয়েছে, মাঝে দু'তিনটা পুল। এই রাস্তা ধরেই চলতে চলতে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা "মহীম" নামক একটা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম।

"মহীম" বোম্বাই শহরতলির একটা বিশিষ্ট স্থান। এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে অনেকটা। এখানে ঠিক সমুদ্রের উপর মুসলিম শাসন-যুগের একটা পাথরে তৈরি কেল্লাহ এখনও ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করছে। "বান্দরা" থেকে "মহীম" যাবার পথে রাস্তার ডানদিকে এই কেল্লাটা পড়ে এবং তারি আর খানিকটা সামনে "মহীমের" বিখ্যাত দরগাহ।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা দরগায় গিয়ে পৌছলাম এবং সেখানকার মসজিদেই রাতটুকু কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। রাত্রিরে শুয়ে মফিজের এল বেজায় জ্বর। গত কয় মাসের ভ্যাগাবণ্ড জীবনের নানা রকম অনিয়মের ফলে তার স্বাস্থ্যটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। জ্বরটা দেখা দিল অনেকটা টাইফয়েডেরই মতো। জ্বরের যাতনায় কাৎরাতে কাৎরাতে সে জানাল, যেমন করে হোক তাকে দেশে নিয়ে গিয়ে পৌছাতে হবেই-নইলে সে আর বাঁচবে

www.pathagar.com

না। হতভাগ্য ভ্যাগাবণ্ড জীবন যে কত দুঃখ ও নিরাশার জীবন-মফিজের অবস্থা দেখে তা আবার নতুন করে বুঝতে পারলাম। তাকে প্রবোধ দিয়ে বুঝালাম, পরদিনই তাকে নিয়ে কোলকাতা রওয়ানা হব।

কার্যতঃও করলাম তা-ই। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে-করে মফিজের রোগশীর্ণ দেহখানাকে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে জি-আই-পির "দাদার" স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম এবং বেলা প্রায় ১১ টার সময় কোলকাতার ট্রেনে চেপে বাঙলার দিকে যাত্রা করলাম। আরব-আফগানিস্তানে যাওয়ার স্বপ্ন-কল্পনা-এমনকি বোম্বাই শহর দেখার ইচ্ছাটাও আপাততঃ সমাধিস্থ করে দিয়ে মায়ের হারানো ছেলে আবার মায়ের কোলের দিকে চল্লাম।

অনেকক্ষণ গাড়ী চলার পর বিকেলে "নাসিক রোড" স্টেশনে গিয়ে ঘন্টা খানিকের জন্যে গাড়ী থেকে নেমে পরবর্তী প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরলাম। এই নাসিকেই নাকি রামায়ণের লক্ষণ-ঠাকুর তাঁর রাক্ষস-প্রেমিকা শূর্পনখার নাক কেটে দিয়েছিলেন। সে রাক্ষসীর নাকের কোন চিহ্ন অবশ্য এখন সেখানে নেই, কিন্তু হিন্দুদের এ-টা একটা বড় তীর্থস্থান। দেখলাম স্টেশন থেকে শহরে যাবার জন্যে সেখানে পুরানো দিনের কোলকাতার মতোই "ঘোড়ার ট্রাম" রয়েছে।

নাসিক থেকে রওয়ানা হয়ে "আমগাঁও" নামক স্টেশনে নেমে এক রাত তথাকার বাঙালী স্টেশন মাস্টারের অতিথি হয়ে বেশ আদর যত্ন পেয়েছিলাম। পরদিন সেখান থেকে যাত্রা করে একেবারে মধ্য-প্রদেশের "ওয়ার্দ্ধায়" গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। এই ওয়ার্দ্ধা জায়গাটা পরে মহাত্মা গান্ধীর কর্মকেন্দ্র হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও, তখন পর্যন্তও তা একটি সাধারণ শহরই মাত্র ছিল। এখানে "মুসাফিরখানায়" থেকেও "নান্দেলের" মতোই পুলিশের জ্বালায় অস্থির হতে হয়েছিল। ওয়ার্দ্ধা থেকে নাগপুর, নাগপুর থেকে রায়পুর, রায়পুর থেকে বিলাশপুর এবং বিলাশপুর থেকে সরাসরি একেবারে কোলকাতায় পৌছে, প্রথম দিন সিন্দু রিয়াপটীতে হাফেজ জামালুদ্দীন সাহেবের মসজিদেই শুয়ে কাটালাম এবং পরদিন সকালে ক্যাম্বেল হাসপাতালে মফিজকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যেন কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

যেদিন কোলকাতায় পৌছলাম, সেদিন কি তার পরদিন রমজানের চাঁদ দেখা গেল। সুতরাং মফিজকে হাসপাতালে ভর্তি করে এসেই আমায় রোজা রাখা শুরু করতে হলো। সারাদিন শহরের এ-অঞ্চল সে-অঞ্চল টু-টু করে ঘুরে রোজ সন্ধ্যায় সিন্দুরিয়া পটীর মসজিদে ফিরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী মহল্লাগুলির বড়লোকদের কারো-না-কারো দয়ায় ইফতার করে দু'টো খাবার ব্যবস্থা করে নিতাম। এরূপভাবেই চলছিল আমার দিনগুলি অতি কষ্টে।

www.pathagar.com

তিন-চারটি রোজা রাখার পরই আমার শরীরেও ক্রমে জ্বরের ভাব প্রকাশ পেল। কিন্তু জ্বরো শরীরেও রোজা না রেখে উপায় ছিল না। ধর্মভাবের প্রেরণায় না হলেও, শুধু মাত্র অভাবের ঠেলায়ই রোগ-শীর্ণ দেহেও আমায় উপবাস বনাম রোজা রাখার অভিনয় করতে হলো। এরূপ অবস্থায় আটটা রোজা বা উপবাসের দিন কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যায় শ্যামবাজারের নিকট আপার-সার্কুলার রোডের একটা মসজিদে গিয়ে ইফতার করলাম। ইফতারের পর মগরেবের নামাজ পড়ে বৃথা অপেক্ষায় প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কাটালেও দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দয়াবান মুসল্লীই এ রোজাদার রুগ্ন মুসাফিরের জন্যে এক মুষ্ঠি খাবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক বিবেচনা করলেন না। সুতরাং বাধ্য হয়ে উপোস অবস্থায়ই আমায় এশার নামাজে দাঁড়াতে হলো।

একে রুগ্ন শরীর, তায় আবার সারাদিনের উপোস। কত আর সয়। মাত্র এক রাকাৎ নামাজ পড়ে দ্বিতীয় রাকাৎ পড়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি মাথাঘুরে জামাতের মাঝখানেই গেলাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এর পর কি হল জানিনে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল, তখন বুঝতে পারলাম, মসজিদের সামনের পাকা প্রাঙ্গনটায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছি, আর চারপাশ ঘিরে একদল লোক দাঁড়িয়ে। একজন লোক আমার মাথায় এক টুকরো বরফ ঘসছিল। শুনলাম আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বলছে, "এ্যা লাড়কা নেহি বাঁচেগা। দেখো না, উস্‌কা মুহ হর্‌রা হো গিয়া।"

"আর বাঁচবনা"-অপরের মুখ থেকে এ অভিমত শুনলে মনটা কেমন হয়, তা সহজেই অনুমেয়। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবেই যে, বিদেশ-বিভূইয়ে এ অপমৃত্যুর সংবাদটাও হয়ত আমার বাড়ীতে গিয়ে পৌছবেনা। যাক, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত না মরে এ কাহিনী লিখার জন্যে আমায় আজ পর্যন্তও বেঁচে থাকতে হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবে চুপ করে থেকে অবশেষে ধীরে-ধীরে উঠে বসলাম এবং মসজিদের ইমাম সাহেবের দান কিছু গরম দুধ আর কয়খানা বিস্কুট খেয়ে সে রাতটা মসজিদেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে রোগশীর্ণ দেহখানাকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে পৌছলাম এবং রেসিডেন্ট সার্জনকে ধরে অনেক কষ্টে সেখানে ভর্তি হলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লেন, টাইফয়েড ফিভার। কাজেই অনেকটা জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আপাততঃ হাসপাতালের আশ্রয় নিলাম।

হাসপাতালের জীবন আমার দীর্ঘ একমাস চার দিনের জীবন। ছার পোকার মৌরশী আড্ডা স্বরূপ হাসপাতালের খাটিয়ায় শুয়ে এই মাসাধিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি নারীর সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। এদের উভয়েই নার্স; কিন্তু একজন সত্যিকার

www.pathagar.com

মায়ের দরদ দিয়ে সেবা করতেন, আর একজন ছিল চরিত্রহীনা Flirt এক ছুকরী। মাতৃরূপা সে বৃদ্ধা নার্সের ডিউটির সময় ছিল দিনের বেলায়। তিনি যখনই ডিউটিতে আসতেন, কোন সময়ই খালি হাতে আসতেন না। কখনও হয়ত বা একটা আপেল, কখনও একটা কলা, আবার কখনও বা আধখানা ডালিম হাতে করে নিয়ে এসে তিনি স্নেহমাখা স্বরে দূরে থেকেই আমায় আহবান করে বলতেন, "খোকা, এই দ্যাখ, খাবি? তাঁর এ আহবানই সত্যি আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। মনে হতো সত্যি যেন মায়ের আহবানই বাতাসে ভেসে আসছে। নিকটে এসে কত আদরেই না তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতেন, আমায় সান্তনা দিতেন। ঈদের দিনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাড়ীর স্মৃতি মনে করে নীরবে কাঁদছিলাম। কিন্তু মাতৃরূপা সে মহিয়সী নারীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি তা। তিনি আমার নিকটে এসে সেদিন কতরূপেই না আমায় প্রবোধ দিয়েছিলেন। আজ এত বছর পর, এখনো সে-সব কথা ভুলতে পারিনি। দিনে এ মহিয়সী নারীর কাছ থেকে মায়ের মতো আদর যত্ন পেয়ে রাত্তিরে যার পাল্লায় পড়তাম, সে এক আঠারো-উনিশ বছরের অতি-প্রেমিকা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়ী। রাত এগারোটা সাড়ে-এগারটার সময় আবার বারান্দায় এসে উদয় হতো তার এক খোঁড়া নাগরের। তার আগমনের ইঙ্গিত পেয়েই সব রোগীর কথা ভুলে নার্স দৌড়ে পালাত বারান্দার দিকে। এর সামান্য কিছুক্ষণ পরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম- বারান্দা থেকে মধুর চুম্বনের ধ্বনি ভেসে আসছে। শুয়ে শুয়ে আমার বেজায় হিংসে হতো।

এক দিনের কথা। শ্রীমতি প্রেমিকা নার্স তার প্রণয়ীর সঙ্কেতানুসারে বারান্দায় গিয়ে প্রণয়-রসে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে দুষ্টুমী করে আমি "দুধ খাব" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। অসময়ে এরূপভাবে রসভঙ্গ হওয়ায় শ্রীমতি রেগে একেবারে চামুণ্ডা মুর্তি ধারণ করে ইংরাজি অভিধানের প্রায় সবগুলি গালি উচ্চারণ করতে করতে দৌড়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "Why do you cry, you donkey?" নেহায়েত সুবোধ ছেলেটির মতোই আমি দুধ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, শ্রীমতি পেয়ালায় দুধ ঢেলে, রাগের চোটে তাতে চিনির পরিবর্তে মিশিয়ে দিলেন খানিকটা নেমক। সুতরাং সে দুধ মুখে তুলেই পেয়ালা শুদ্ধ তা মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা অঘটনের সৃষ্টি করেই আমায় সেদিন প্রেমিক-প্রেমিকার অভিশাপ কুড়োতে হয়েছিলো। এর পর হাসপাতালে বাকী যে কটা দিন ছিলাম, সে কদিন বেশ সুবোধ ছেলের মতোই দিনগুলি কাটিয়ে এসেছি; কোনো দিনই প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-পথে আর বাধা জন্মাতে যাইনি।

অন্ন-পথ্যি করার তিন চারদিন পর একদিন প্রাতে হাউস সার্জন এসে জানালেন, আমার নাকি রোগ সেরে গেছে, কাজেই হাসপাতাল থেকে বিদায় নিতে হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি তখন রোগীদের লাইব্রেরীর একখানা বই পড়ছিলাম। সার্জনের কথায় অকস্মাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুর্বল শরীরখানা নিয়ে অসহায় অবস্থায় যে যাব

www.pathagar.com

কোথায় তা-ই ভেবে অস্থির হয়ে পড়লাম। যাক, সার্জনকে বলে আর এক দিনের সময় নিলাম এবং পরদিন দুপুরে বিদায় নেব বলে তাঁকে জানালাম।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়ার পর মেথর আবদুলকে ডেকে হাসপাতালের ভাণ্ডারে জমা-দেওয়া আমার ছিন্ন মলিন কাপড়গুলি চেয়ে নিলাম এবং পরিচিত সকল রোগী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছন্নছাড়া পথবাসী মুসাফির আবার পথেই বেরিয়ে পড়লাম। বিদায় বেলায় বেচারা আবদুল আর কতিপয় রোগী-বন্ধু যেরূপ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমায় বিদায় দিয়েছিল, সত্যি তা ভুলবার নয়। নীচ-মেথরের কাজ করলেও আবদুলের হৃদয়খানা যে প্রকৃতই দরদী একটি ভাইয়েরই হৃদয় ছিল, হাসপাতালের দীর্ঘ এক মাসের জীবনে প্রত্যহই তার সহৃদয়তার মধ্য দিয়ে এর পরিচয় পেয়েছিলাম। কাজেই, বিদায় বেলায় তার কাছে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুললাম না।

হাসপাতালের গেট পেরিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে নেমেই নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে হলো। বিশাল কোলকাতা শহরে আমার মতো রোগজীর্ণ বুভুক্ষু একটা হতভাগ্যের স্থান কোথায়, তাই ভেবে কিছুক্ষণ পর্যন্ত দিশেহারার মতোই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে মীর্জাপুর ষ্ট্রীট ধরে পূর্ব দিকেই অনির্দিষ্টভাবে পা বাড়ালাম। কোথায় যাব, কি করব তার কোনও স্থিরতা অবিশ্যি ছিলনা; কিন্তু জানিনা কি জানি কেন, সিন্দুরিয়া পটির দিকে না গিয়ে শিয়ালদার দিকেই যাওয়ার ইচ্ছে হলো। দুর্বল শরীর পা আর চলেনা। কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে দেহখানাকে বয়ে নিয়ে অবশেষে রিপন কলেজের সম্মুখস্থ মসজিদটাতেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম এবং সারাটা দুপুর সেখানে শুয়ে কাটালাম।

আসরের নামাজের আজান হলে পর উঠে ওজু কররার মতলবে হাওজের কাছে বসলাম। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আমার চাঁদপুরের অন্যতম পরিচিত বন্ধু আবদুল বারী মিঞা মসজিদে ঢুকছেন দেখতে পেলাম। চাঁদপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি তখন কোলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ছিলেন। আমার ছিন্ন-মলিন বসন আর রোগশীর্ণ দেহ দেখে প্রথমতঃ বোধ হয় তিনি চিনতেই পারেন নি। তাই, সন্দেহ-মিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতেই তিনি আমার পানে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে আমার সাথে কথা বলার সুযোগ আমি দিলাম না। ওজু শেষ করেই উঠে দাঁড়ালাম এবং বারী মিঞাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে দিলাম পিঠটান। আমার তৎকালীন পলায়নের দৃশ্যটা দেখলে মনোবিজ্ঞানবিদ পন্ডিতেরা যে আমার মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর পলাতক Criminal এরই সন্ধান পেতেন এবং খুনে-বদমাশ মনে করে পুলিশ ডেকে যে আমায় ধরিয়ে দেওয়ারই হয়ত চেষ্টা পেতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না।

যাক, বারী মিঞার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে মনের অবস্থায় বিরাট একটা বিপর্যয়ই দেখা দিল। আর অধিক দিন কোলকাতায় থাকলে এরূপভাবে আরো অনেক পরিচিত লোকের সাথে

www.pathagar.com

দেখা হওয়ারই যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা ভেবে অনতিবিলম্বে কোলকাতা ত্যাগ করারই সংকল্প করলাম এবং হ্যারিসন রোড ধরে সোজা হাওড়ার পথে পা বাড়ালাম।

সন্ধ্যার পর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে কিছুক্ষণ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে এদিক সেদিক পায়চারী করে কাটালাম এবং রাত আটটায় বোম্বাই-মেল ট্রেনে চেপে আবার অকূলের পথে পাড়ি জমালাম। প্রথম বার মফিজের সাথে পশ্চিমের সফরে যাত্রার সময় অবশ্য সামান্য কিছু সম্বল আমাদের সঙ্গে ছিল; কিন্তু এবার একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়ই আমায় গাড়িতে চাপতে হলো। পকেটে একটি পয়সাও নেই, তার উপর আবার রোগজীর্ণ দেহ। সুসজ্জিত অসংখ্য যাত্রীর মাঝে ছিন্ন-মলিন বসনে নেহায়েত অস্পৃশ্য পারিয়ার মতোই গিয়ে বসলাম অতি সঙ্গোপনে গাড়ীর এক কোণে। মনের পর্দায় বায়স্কোপের ফিলমের মতোই অতীতের কত সুখ-স্মৃতি একটার পর একটা ভেসে উঠতে লাগল। এ বাঁধন হারা জীবন-তরি যেরূপভাবে পথের স্রোতে কেবল ভাসিয়েই চলেছি, তার শেষ কোথায়, তা ভাবতে গিয়ে পারস্যের ছন্নছাড়া কবি খৈয়ামের কথা মনে পড়ল ঃ

"কাল-স্রোতে ভেসে ভেসে যাই অনিবার
কোথায় বা যাব পুনঃ কিবা স্থির তার।
লক্ষ্যহীন চলিয়াছি সমীরণ ভরে,
কোথা কোন দেশে, কোন মরুর উপরে।"

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ মঞ্জিল

আবার খড়গপুর। ঘন্টা দু'এক পরই খড়গপুরে গিয়ে পৌঁছলাম এবং গাড়ী থেকে নেমে গতবারের চেনা জো'মা মসজিদটাতে গিয়েই আশ্রয় নিলাম। রাত তখন অনেক হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে রাত্তিরে কোথাও আর খাবার ব্যবস্থা হলো না। সুতরাং খোদার নাম নিয়ে সবর এখতিয়ার করেই কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে হলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর দয়ালু এক মুসল্লীর অনুগ্রহে কিঞ্চিৎ নাশতা ভাগ্যে জুটলো। দীর্ঘ প্রায় দু'দিন উপোসের পর এই নাশতাটা পেয়ে রোগজীর্ণ দেহে সত্যি যেন তখন নব-জীবনের স্পন্দন জেগে উঠল। অতঃপর হোটেল থেকে বেরিয়ে সামনেই বাজারের মাঝখানে দেখতে পেলাম -এক গন্ডা অপরূপ ভিখেরীকে। একটা পুরুষের সঙ্গে তিনটা নারী-তাদের মধ্যে একজন পূর্ণ যুবতী, আর দু'টি বালিকা।

একটা গাছতলায় বসে পুরুষটি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, আর নারী তিনটি তার তালে তালে সুর-মূর্চ্ছনা জাগিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছিল। তাদের গানের সে করুণ-মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে সে জায়গাটায় প্রায় শ'খানেক লোক তখন জমা হয়েছিল। এই বিরাট ভীড়ের এক পাশে দাঁড়িয়ে আমি গেলাম গান শুনতে। অতি কষ্টে একটা স্থান করে নিয়ে কোন রকমে ভেতরের দিকে মাথা গলিয়েছি মাত্র, অমনি সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দর একটি কিশোরী বালিকা। শঙ্কিত চরণে এগিয়ে এসে গানের কোরাসটা শেষ করে নিয়ে বালিকা তার হাতের পেয়ালাটা সামনে বাড়িয়ে ধরল-কিছু পয়সা পাওয়ার আশায়। কিন্তু পয়সা দেব কোত্থেকে? নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করে মনে দারুণ ব্যথাই বেজে উঠল। যে নিজের উদরান্নের ধান্ধায় অস্থির, সে গান শুনে ভিখেরীকে পয়সা দেবে কেমন করে, তাই ভেবে মাথা তুলে বালিকার মুখের পানে চাইলাম এবং তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। ফুটনোন্মুখ সুন্দর তন্বী কিশোরী তার বড় বড় চোখ দু'টোর গভীর দৃষ্টি দিয়ে একবার মাত্র আমার দিকে চেয়ে লীলায়িত দেহে একটা গতি ছন্দ তুলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল আর একটা লোকের সামনে। লক্ষ্য করে দেখলাম, তার ডান গালের মাঝখানে পারস্যের বুলবুল প্রেম-দিওয়ানা হাফিজের মানস-প্রিয়ার মতোই এমন একটা কালো তিল চক্‌চক্ করছে-যার বিনিময়ে সমরখন্দ-বোখারার সিংহাসনও বুঝি সত্যি অতি অবহেলায় বিলিয়ে দেওয়া যায়।

ভিখেরী বালিকার দেহে এত রূপ দিয়ে বিশ্বস্রষ্টা কি খেলার অভিনয় করছেন, তাই ভাবতে গিয়ে বালিকার অন্ধকারপূর্ণ ভবিষ্যতের ছবিটাই মনের কোণে ভেসে উঠল। বুঝি ক্ষণকালের জন্যে লীলাময় খোদার অবিচারের কথাও তখন মনে জেগে উঠেছিল। কিন্তু কয় বৎসর পর

www.pathagar.com

যুবতী অবস্থায় এই বালিকাকেই যখন আরো একটা পুরুষের সাথে হেসে-খেলে গান গেয়ে কোলকাতার পথে পথে ঘুরতে দেখলাম, তখনি বুঝতে পেরেছিলাম, খোদার লীলা বুঝা সত্যি মানুষের সাধ্যি নয়।

যাক, বাজারের সে গানের আড্ডা থেকে বেরিয়ে অতঃপর স্টেশনের পথ ধরলাম এবং সেখানে পৌঁছে টাটানগরের যে প্রথম ট্রেন পেলাম, তাতেই চেপে বসলাম। শাল-বনানীর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পথে গাড়ীখানা যখন একটা উন্মত্ত দৈত্যের মতোই সামনে এগিয়ে চলছিল, তখন দু'পাশে লক্ষ্য করে সারাপথে বনের যে মায়াময় শোভা দেখেছিলাম, আজো তা ভুলতে পারিনি। ছোটনাগপুরের এই বিরাট জঙ্গলটাকে প্রকৃতি যে অপরূপ শোভা সম্পদে গরীয়ান করে রেখেছে, ধানের ক্ষেতের শ্যামলিমার দেশ বাঙলার সন্তানের চোখে সত্যি তা' একান্ত অভিনব দৃশ্য। এই শোভা দেখতে দেখতেই বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় টাটানগরে গিয়ে পৌঁছলাম।

স্যার জামশেদজী টাটার অমর কীর্তি এই টাটানগর আজ লোহার কারখানার জন্যে সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ অর্জন করেছে। স্টেশনে নেমেই ভাবতে লাগলাম, কোন দিকে যাই-কল কারখানার কোলাহলপূর্ণ টাটার নতুন নগরীতে, না পুরানো "কালীমাটি" শহরে গিয়েই আশ্রয় নেব? অনেক ভাবনা চিন্তার পর অবশেষে "কালীমাটির" দিকেই রওয়ানা হলাম এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেদিন ছিল বোধ হয় হাটের দিন। তাই বাজারটার সর্বত্র বেজায় ভীড় দেখা গেল। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি নানা রকম লোক জমায়েত হয়ে হাটের সর্বত্র যে শোর-গোলের সৃষ্টি করেছিল, তা দেখে বাঙলার পাড়াগাঁর হাটের কথাই মনে পড়ে।

একস্থানে দেখতে পেলাম, একদল সাঁওতাল নারী-পুরুষ একত্র হয়ে বসে আছে, আর তাদের কাছে কতকগুলি বোতলে মধুর মত কি একটা তরল পদার্থ। ভাবলাম, জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে হয়ত এরা তা বিক্রি করার জন্যেই হাটে নিয়ে এসেছে। ঔৎসুক্য নিবারণের জন্যে এগিয়ে গিয়ে একটা সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার বোতলে কি আছে। সাঁওতাল উত্তর দিল, "দারু আছে, পিবি? দারুটা যে কি জিনিষ, তা আমার তখন জানা ছিলনা; সুতরাং কোন উত্তর না দিয়েই সামনে অগ্রসর হলাম।

হাটের মাঝে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এবং মগরেবের নামাজের পর একজন লোকের দয়ার দান স্বরূপ কিছু খাবার খেয়ে সে রাতের মতো পেটের জ্বালা থেকে মুক্তি পেলাম। অতঃপর মসিজদে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা যখন বোধ হয় এগারোটা হবে, তখন স্টেশনে গিয়ে নাগপুর গামী ট্রেন ধরে চক্রধরপুরের পথে পাড়ি জমালাম।

www.pathagar.com

গাড়ী টাটানগর থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই পথিপার্শ্বস্থ একটা স্টেশন থেকে ওড়াও জাতীয় একপাল অর্ধ-নগ্ন অসভ্য লোক এসে গাড়ীতে চাপল। দেখলাম, এদের পুরুষগুলির শরীরে সামান্য একখন্ড ন্যাকড়ার ন্যাংটি ছাড়া কাপড়-চোপড়ের আর কোন বালাই-ই নেই এবং নারীগুলিও প্রায় দিগ্বসনা। কোমর থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত স্থানটুকু মাত্র একখন্ড অর্ধহাত চওড়া গামছা দিয়ে কোনো রকমে ঢেকে এই অসভ্য নারীগুলি বেশ নিঃসঙ্কোচ ভাবেই গাড়ীভর্তি শত শত লোকের মাঝে এসে উপবেশন করল। লক্ষ্য করে দেখলাম, সভ্য জগতের আব-হাওয়া থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই জংলী লোকগুলির দেহ কত স্বাস্থ্য-সম্পন্ন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদের প্রত্যেকেরই নগ্ন দেহের প্রতি অঙ্গে সুস্থ-সবল মাংস পেশীর যে সুন্দর বাঁধন সেদিন দেখেছিলাম, শহুরে সুসভ্য নাগরিকদের মধ্যে কোথাও এ রকম দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

আমি যে জায়গাটায় স্থান নিয়েছিলাম, তার ঠিক সামনের বেঞ্চিখানায় এসেই অসভ্য লোকগুলি বসেছিল। সুতরাং তাদের সাথে আলাপ করার আমার বেশ সুযোগই হয়েছিল। প্রথমে এদেরই একজন আমায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব আমি? সুদূর বোম্বাইর যাত্রী আমি একথা শুনে লোকটি কেমন যেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে আবার কোথায়; চক্রধরপুর থেকে কয় 'কোশ' দূরে?" বাড়ির পাশের ক্ষুদ্র শহর চক্রধরপুরের চাইতে দূরবর্তী কোনও স্থানের জ্ঞান যে এই সব সরল-প্রাণ জংলী লোক গুলির আদৌ থাকতে পারে না, তার এ প্রশ্নে তারি পরিচয় পেয়ে আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, বোম্বাই জায়গাটা অনেক দূরে-চক্রধরপুর থেকে বহু শত 'কোশের' পথ হবে। শুনে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে চুপ করল।

কথায় কথায় লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের দেশের সব্বাই কি একই রকম পোশাক পরে? কিন্তু লোকটি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই তার পার্শ্ববর্তী যুবতী সঙ্গিনী মুখে একটা অস্ফুট হাসির আভাষ জাগিয়ে উত্তর দিল, "আমরা সব্বাই একই রকম পোশাক পরি-কিন্তু এক 'পাঠানী' আছে সে তোমাদের মতো পোশাক পরে।" সরল ওঁড়াও যুবতীর এই কথায় বুঝতে পারলাম, অসভ্য জংলীদের দেশেও যেখানে ইসলামের আলোক গিয়ে পৌছেছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সভ্যতারও আলোক-সম্পাৎ হয়েছে। তাই অর্ধনগ্ন ওঁড়াও বস্তির পাঠান মহিলার গায়েও সভ্য-জনোচিত পোশাকেই দেখা যায়। সারা পথে এই সব অসভ্য লোকের সাথে আলাপ করে করে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় চক্রধরপুরে গিয়ে পৌছলাম এবং গাড়ী থেকে নেমে শহরের মাঝখানে একটা পাকা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

সেদিন খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল। স্টেশন থেকে মসজিদ পর্যন্ত যেতে যেতেই আমার কাপড়-চোপড়গুলি ভিজে সব একাকার হয়ে গেলো। সুতরাং মসজিদে পৌছেই সর্বপ্রথমে আমার

www.pathagar.com

ভিজে কাপড়গুলি শুকোবার ব্যবস্থা করতে হলো। অতঃপর মগরেবের নামাজ পড়ে বাদলদিনের ঠান্ডা হাওয়ায় মসজিদের এক কোণে বসে বসে "রেজ্‌কের" মালিক খোদার নাম জপতে লাগলাম। এশার নামাজের পর এক দয়ালু ভদ্রলোক অতি সমাদরে আমায় তাঁর নিজের ছাতার নিচে আশ্রয় দিয়ে সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বেশ তৃপ্তির সাথে আহার করিয়ে আবার সঙ্গে করে মসজিদে রেখে গেলেন।

পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পরই শহর দেখতে বেরুলাম। ছোট্ট শহর; দেখবার মতো বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। সুতরাং বেলা প্রায় বারোটা পর্যন্ত বিনা-কাজে এদিক সেদিক ঘুরে অতঃপর এক বাড়িতে গিয়ে মুসাফির হয়ে খাবার ব্যবস্থা করলাম। খাওয়ার পর আবার মসজিদে ফিরে গেলাম এবং জোহর ও আসরের নামাজ সেখানেই পড়ে বিকেলের ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনের পথ ধরলাম।

চক্রধরপুর থেকে দুই-তিনটা স্টেশন পেরুলেই "সারান্দার" বিখ্যাত সুড়ঙ্গ পথ। "সাত শো পাহাড়ের দেশ" সেই সুন্দর ভুখণ্ডের অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়ের মধ্যে একটা পাহাড়ের বুক চিরে রেল কোম্পানী "সারান্দার" এই সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করেছেন। গাড়ী যখন সেই সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে পৌছল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আসন্ন সন্ধ্যার আবছা আঁধারে পাহাড়ের গায়ে অপরূপ স্বপ্ন কুহেলী দেখে তখন মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, কবির ভাষায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে সত্যি বলতে হয় ঃ

"মেঘলা সাঁঝের কুহেলী কাজল
নয়নেতে মাখি' মাখি'।
পাহাড়-উদাসী বেদনার জল
রাখিয়াছে যেন ঢাকি।"

কিন্তু বেশিক্ষণ এই স্বপ্ন-মায়া উপভোগ করা আর সম্ভবপর হলোনা। অকস্মাৎ সিটি বাজিয়ে গাড়ীখানা একটা বিরাট কেঁচোর মতোই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মাঝে প্রবেশ করে সামান্য কিছুক্ষণ পরই আবার পাতালপুরীর আঁধার গুহা থেকে আলোকের রাজ্যে ফিরে এলো। মুহূর্তের মধ্যে আলো-আঁধারের এই যে বিচিত্র খেলার অভিনয় হয়ে গেলো, তা যে কতটা উপভোগ্য, বাস্তবিকই তা লিখে বুঝাবার নয়- শুধু উপভোগেরই জিনিষ তা।

চারপাশে অন্ধকারময় পার্বত্য পথ পেরিয়ে সারা রাত গাড়ীখানা চলল অবিরত। রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত জেগেই ছিলাম। অতঃপর উপরের দোদুল্যমান একটা বেঞ্চিতে উঠে দিব্যি নবাবী হালে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং পরদিন সকালে "ঝারসুগোদা" জংশনে গিয়ে গাড়ী পৌছলে পর কুলীদের হাঁকডাকে জেগে উঠে তথায় নেমে পড়লাম।

"ঝারসুগোদা" বেশ বড় একটি রেলওয়ে জংশন। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে সম্বলপুর পর্যন্ত একটা ব্রাঞ্চ-লাইন খুলে রেল কোম্পানী উড়িষ্যার কটক-অঞ্চলের সহিত মধ্য প্রদেশের

www.pathagar.com

সরাসরি সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করেছেন।

গাড়ী থেকে স্টেশনে নেমেই সর্ব প্রথমে বাজারে গিয়ে একটা চা-খানায় কিঞ্চিৎ নাশতার ব্যবস্থা করলাম এবং অতঃপর বাজারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একটা পাকা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। দেখলাম, স্টেশনটা বেশ বড় হলেও, শহরটা আদৌ বড় নয়- সামান্য একটা ক্ষুদ্র বাজারেরই মতো। সুতরাং এখানে নেমে অনর্থক সময়ের অপব্যবহার করা হলো বলেই মনে হতে লাগলো। কিন্তু যখন গাড়ী থেকে নেমে পড়েছি, তখন একটা দিন অন্ততঃ এখানে কাটাতেই হবে-একথা ভেবে আপাততঃ মসজিদের হাওজেই গোসল করে জোহরের নামাজের আয়োজন করলাম।

জোহরের নামাজের পর গুজরাটি এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমায় তাঁর গদিতে নিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গে বেশ তৃপ্তির সাথে আহার করালেন। অতঃপর মসজিদে ফিরে এসে সারাটা দিন শুয়ে কাটালাম। বিকেলের দিকে সামান্য কিছুক্ষনের জন্য মসজিদ থেকে বেরিয়ে বাজার ও ষ্টেশনে গিয়ে চারদিক ঘুরে স্থানটা ভালো করে দেখে নিলাম। মগরেবের নামাজের সময় মসজিদে ফিরে এশার নামাজের পর ইমাম সাহেবের দয়ার দান সামান্য কয়খন্ড রুটি আর কিছু গোশত দ্বারা উদর পূর্তি করে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরলাম।

"ঝারসুগোদা" ছাড়িয়ে সামান্য কয়েকটা স্টেশন গেলেই মধ্য-প্রদেশের সীমানা শুরু হয়। এখান থেকে রাস্তার দু'পাশেই ঝড়-জঙ্গলের গভীরতা এত বেশি নজরে পড়ে যে, নতুন দেশের ভেতর দিয়ে যে চলেছি তা সহজেই বুঝা যায়। পথিপার্শ্বস্থ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মাঝে কোনো কোনো স্থানে গভীর জলাভূমি ও এক-আধটা নজরে পড়ে। সেই সব জলাভূমির পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির বেঁধে বাস করে-জঙ্গলের দুলাল দুলালী স্বল্পবাস পরিহিত অসভ্য "কোল" নর-নারী দল। গাড়ী চলাচলের সময় ঔৎসুক্য বশে এই সব অসভ্য নর-নারীর যখন দল বেধে এসে পথি-পার্শ্বে দাঁড়ায় তখন তাদের যৌবন-বলিষ্ঠ কালো কুচকুচে দেহের শোভা বাস্তবিকই অতি মনোহর দেখায়। শাপদ-সঙ্কুল ভীতিপ্রদ জঙ্গলের দেশে বাস করতে হলে যেরূপ সুস্থ-সবল দেহ সৌষ্ঠবের প্রয়োজন, সৃষ্টিকর্তা খোদা যে এই সব অসভ্য নর-নারীকে তা-ই পূর্ণ মাত্রায় দান করেছেন, তা দেখে খোদার সৃজন-মহিমার কথা চিন্তা করে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। সারা পথে গভীর জঙ্গলের এই সব মায়াময় দৃশ্য দেখে দেখেই বেলা প্রায় একটার সময় "রায়গড়" নামক বেশ বড় একটি স্টেশনে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম।

"রায়গড়" এক হিন্দু সামন্ত-রাজার রাজধানী। শহরটা বেশ বড় না হলেও একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। স্টেশন থেকে আধ-মাইল খানেক পথ মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পাকা রাস্তা ধরে গেলে পর শহরে পৌছা যায়। গাড়ী থেকে নেমেই দেখতে পেলাম, শহরে

www.pathagar.com

যাওয়ার পথে লোকের বেজায় ভীড়। এরূপ অস্বাভাবিক ভীড়ের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, প্রতি বৎসরই গণপতি উৎসবের সময় নাকি শহরে একটা মেলা বসে এবং এই উৎসবের আর মাত্র দু'দিন বাকী আছে বলেই যাত্রীদের এত ভীড় হয়েছে। শুনে বেশ আনন্দিতই হলাম এবং যাত্রীদের ভীড়ে মিশে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মেলার স্থানে গিয়ে পৌছালাম।

একটা বিরাট মাঠের মাঝে অস্থায়ী কতকগুলি কুড়ে নির্মাণ করে নানা দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীরা তাদের সওদা বিক্রির ব্যবস্থা করেছে দেখা গেল। অসংখ্য যাত্রীও এই মেলার বাজারে উপস্থিত হয়ে এই সব জিনিষপত্র ক্রয় করছিল। এক স্থানে মুসলমানী পোষাক পরিহিত একটা লোককে মুচির কাজ করতে দেখে আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং দুই এক কথায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সাথে ভাব করে নিলাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম, লোকটি সত্যি মুসলমান এবং দেশ-পর্যটনই তাঁর কাজ। তিনি কারো কাছে কোনো সময় এক পয়সাও সাহায্য গ্রহণ করেন না; বরং নতুন কোন স্থানে গিয়েই স্থানীয় বাজারের মধ্যে মুচির অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কোথাও বসে পড়েন এবং এরূপেই স্বাবলম্বীভাবে তাঁর মুসাফির জীবনের সকল খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়। শুনে আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত হলাম। মানুষ ইচ্ছা করলেই যে কারো কাছে হাত না পেতেও অতি অনায়াসে সাবলম্বী হয়ে চলতে পারে, মুচির কার্যে নিরত এই আদর্শস্থানীয় লোকটির কাছ থেকে এই মহাশিক্ষা লাভ করে, অতঃপর সেখান থেকে গাত্রোত্থান করলাম এবং ঘুরতে ঘুরতে শহরের মধ্যবর্তী এক মসজিদে গিয়ে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাজারের মাঝে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখতে পেলাম যে, কয়েকটা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকানও সেখানে রয়েছে। এই সব দোকানদারের অধিকাংশই গুজরাটি মুসলমান। রাজ-প্রাসাদের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত পায়চারী করে চারদিকে লোকজনের ব্যস্ততা দেখে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, পরদিন সকালে হাতি-মুখো "গণ-দেবতার" যে বিরাট শোভাযাত্রা বেরুবে, প্রাসাদে নাকি তারি আয়োজন চলছে। প্রাসাদের সম্মুখস্থ এক মন্দিরে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট মোটা ভূড়িওয়ালা "গণেশ-ঠাকুরের" কিম্ভুতকিমাকার মূর্তিটা দেখে শোভাযাত্রা দেখার উৎসাহ আর রইলনা। কাজেই অনর্থক আর এ শহরে অপেক্ষা না করে, তখন-তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সোজা স্টেশনে গিয়ে দুপুরের গাড়ীতেই বিলাসপুরের পথে পাড়ি জমালাম।

www.pathagar.com

চতুর্দশ মঞ্জিল

"রায়গড়" থেকে গাড়ীতে চেপে সরাসরি একেবারে "বিলাসপুরে" গিয়ে নামলাম। এই "বিলাসপুর" মধ্য প্রদেশের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে সেন্টার। এখান থেকে উত্তর দিকে একটা লাইন "কাটনী" পর্যন্ত গিয়ে জি-আই-পি রেলের সাথে মিশেছে। দেখলাম, স্টেশনটা যেমন বড় শহরটাও তেমনি সুন্দর। লাল কাঁকরে বাঁধানো বৃক্ষাচ্ছাদিত শহরের রাস্তা দিয়ে চলবার সময় মনে হয়, এমন সুন্দর "এভেনিও" বুঝি খুব কম জায়গায়ই আছে।

বাজারের মধ্যস্থ একটা মসজিদে গিয়ে যখন পৌছলাম, তখন প্রায় আসরের নামাজের সময় হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ওজু করে নামাজটা সেরে নিলাম এবং অতঃপর মসজিদের সম্মুখস্থ পাকা প্রাঙ্গনটায় বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলাম। সুন্দর ছাত্র-জীবনকে বহু পশ্চাতে ফেলে এসে আজ যে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথ বেয়ে চলেছি, তার শেষ কোথায়, তা ভাবতে গিয়ে বাস্তবিকই দিশাহারা হয়ে পড়লাম। ক্ষণিক উত্তেজনায় শান্তিনীড় গৃহের সব আনন্দ-সুখ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে দুঃখের যে টীকা কপালে এঁটে আজ পথে ভেসে চলেছি, কোনো দিন তা সত্যিই জয়টীকার মতোই কপালের মাঝখানে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠবে কিনা, এ বিষয়ে মনে ভীষম সন্দেহই জেগে উঠল। এক এক বার মনে হচ্ছিল, বুঝি বিরাট ভুল করেছি-সত্যি বুঝি ব্যর্থতার পথেই জীবনকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি। ইরানের পাগল কবি খৈয়ামের মতোই দারুণ ব্যর্থতার কাঁদন কেঁদে তখন আমার সত্যি বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল ঃ

"তিমির-পথের যাত্রী মোরা -
দীপ্ত উষার রশ্মি কই?
মর্ত্যে হয়ে লক্ষ্যহারা -
স্বর্গপানে তাকিয়ে রই।"

কিন্তু স্বর্গপানে তাকিয়েও যেন দীপ্ত উষার রশ্মির কোন নিশানাই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, John Bunyan-এর Pilgrim-এর মতোই যেন অকূল পঙ্কের দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মরছি। এরূপভাবে চারদিকে নানা চিন্তার জাল বুনে নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ করে যখন আমি একান্তই অসহায়ের মতো মনে মনে কঁকিয়ে মরছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একটি বাইশ তেইশ বৎসর বয়স্ক যুবক এসে মসজিদে ঢুকে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

মসজিদে প্রবেশ করে যুবক প্রথমে নামাজটা সেরে নিলেন এবং অতঃপর আমার নিকটে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বিদেশী ভ্রাম্যমান মুসাফির এবং সুদূরের বঙ্গ-

www.pathagar.com

জননীর সন্তান, এ-কথা শুনেই যুবক আনন্দাতিশয্যে প্রায় লাফিয়ে উঠে আমার হাত ধরে তাঁদের বাড়িতে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম, যুবক স্থানীয় একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র, কলেজে বিএ পড়েন। বাড়ি তাদের মধ্য-প্রদেশের এলাকায় হলেও নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত "ডাঃ ট্যাগোরের" লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য যুবক বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন করছিলেন। তাই, হতভাগ্য এ বাঙালী মুসাফিরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে "ট্যাগোরের" সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে তিনি অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। যুবকের মুখে তাঁর এই বিস্ময়কর সাহিত্য-প্রীতির কথা শুনে আমি অতি মাত্রায় আনন্দিত হলাম এবং কোনোরূপ দ্বিরুক্তি না করেই সোজা তাঁদের বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম।

স্টেশনের নিকটেই বড় রাস্তাটির পাশে সাহেবী ফ্যাশানের সুন্দর একটি বাংলো। যুবক আমায় সঙ্গে করে এই বাংলোতে গিয়েই উপস্থিত হলেন। ছিন্ন-মলিন বসন ভিখেরী সদৃশ এই হতভাগ্যকে দেখে বাড়ির অপরাপর লোক হয়ত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিতই করেছিলেন, কিন্তু যুবক অতি সমাদরে আমায় তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং একটা চাকরকে দিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে চা এনে নাশতা করালেন। চা খেতে খেতেই যুবক রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা শুরু করে দিলেন। এক রাশ কেতাবের মাঝখান থেকে খুঁজে "গীতাঞ্জলী", "বলাকা", "কথা ও কাহিনী" এবং "চয়নিকা"- রবীন্দ্রনাথের এই চারখানা বই বের করে এনে যুবক তাঁর হিন্দুস্থানী সুরে কবির কোনো কোনো কবিতার স্থান বিশেষ আবৃত্তি করতে লাগলেন। দুই একটা কঠিন শব্দের মানেও তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। তাঁর কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিনি একজন মস্তবড় ভক্ত এবং শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যেই যে বাংলা-সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যিক দরবারে সম্মানের আসন পেয়েছে-এ বিষয়েও তাঁর দৃঢ় ধারণা বিদ্যমান।

চা-খাওয়া হয়ে গেলে পর দু'জনায় মিলে কিছুক্ষণ সম্মুখস্থ রাস্তায় পায়চারী করে কাটালাম এবং অতঃপর মসজিদে গিয়ে মগরেব ও এশার নামাজ পড়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে দু'জনায় এক সঙ্গেই আহার করলাম। আহারের পর আবার শুরু হলো সাহিত্য চর্চা। কেমন করে বাংলার বাইরে থেকেও বাংলা ভাষায় Master হওয়া যায়, যুবক আমার কাছে তাই জানতে চাইলেন। কোনোও শিক্ষিত বাঙালী যদি নিকটে কোথাও থেকে থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে নিয়মিত ভাবে পড়ার জন্যে আমি তাঁকে উপদেশ দিলাম। যুবক জানালেন, স্টেশনে একজন বাঙালী বাবু আগে ছিলেন এবং তাঁরি কাছে বাংলা-ভাষায় তাঁর হাতেখড়ি; কিন্তু সে বাবুটি নাকি বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। শুনে বেজায় দুঃখ হলো। এমন উৎসাহী যুবক উপযুক্ত উস্তাদের অভাবে বাংলা-ভাষার চর্চা করতে পারবেন না, মনে করে তাঁকে আপাতত একখানা বাংলা অভিধান কিনে নিজে নিজে পড়বারই পরামর্শই দিলাম

www.pathagar.com

এবং রাত প্রায় এগারোটার সময় যুবকের পড়বার কামরায়ই বহুদিন পর কোমল পরিস্কৃত বিছানায় শুয়ে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সারাদিন যুবকের সাথে ডেপুটি সাহেবের বাড়ীতেই কাটালাম। বিকেলের দিকে শহর দেখতে বেরিয়ে অনেকগুলি বড় বড় মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকান দেখে স্থানীয় মুসলমানদের উন্নতিশীল অবস্থারই পরিচয় পেলাম। রাত্তিরে এশার নামজ পড়তে গিয়ে মসজিদে মফঃস্বল অঞ্চলের এক জমিদারের সাথে পরিচয় হলো। তিনি আমায় দাওয়াত করলেন, পরদিন সকালে তাঁর সাথে তাঁর গাঁয়ে যাওয়ার জন্যে। শহর থেকে গ্রামখানা মাত্র পাঁচ মাইল দূরে জানতে পেরে, মধ্য-প্রদেশের পল্লী–শোভা দেখবার ইচ্ছা নিয়ে একটু ভেবে জমিদার সাহেবের দাওয়াত গ্রহণ করলাম এবং অতঃপর ডেপুটি সাহেবের বাড়িতে ফিরে গিয়ে আহারাদির পর শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই খুব প্রত্যুষে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়লাম। নামাজের পর পূর্ব দিনের পরিচিত জমিদার সাহেবের সাথে দেখা হলো। আমি তাঁর সাথে তাঁর পল্লী-ভবনে যেতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি শুনে তিনি আমায় সঙ্গে করে বাজারস্থ এক দোকানে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে নাশতা করে অতঃপর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রেল-রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটুখানি গেঁয়ো পথের রেখা। শহর ছাড়িয়েই আমরা এই রাস্তায় পা দিলাম এবং নানারূপ আলাপ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলাম। দেখলাম, মধ্য-প্রদেশের এই অঞ্চলটার দৃশ্য অনেকাংশে পশ্চিম বাংলার নদীয়া এবং ২৪-পরগণা জেলার রেলপথের পার্শ্ববর্তী দৃশ্যেরই মতো। পাহাড় পর্বত নিকটে কোথায়ও নেই বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু জংলা জংলা ভাব দুপাশেই নজরে পড়ে। রেল-পথের ধারেই দু'পাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে এক পাল কালো-বরণী নারীকে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়ে ধানের চারা রোপণ করতে দেখা গেল। ক্ষেতের কাজে নিয়োজিত এই সব কিষাণ রমণী কোন জাতের-জমিদার সাহেবকে তা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এরা নাকি পাহাড়িয়া "কোল" জাতের মেয়ে। পুরুষ কিষাণকে কাজে না লাগিয়ে এই সব মেয়ের দ্বারা কেন কাজ করান হচ্ছে, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে জমিদার সাহেব হেসে বল্লেন, -"আপকা পাস এ বহুৎ তাজ্জব মালুম হোতা হোগা; মগর হামারা-মুল্লুককা রেওয়াজ এহি হ্যায়।"

কথায় কথায় জমিদার সাহেবের গাঁয়ের কাছে এসে পৌছলাম। রেল-রাস্তার ডান দিকে একটা গাঁয়ে একখানা টীনের ঘরওয়ালা বাড়ির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে জমিদার সাহেব জানালেন, ওই দেখা যায় তার গাঁ এবং তারি মাঝে এক পাশে যে করোগেট টীনের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, সেটাই তাঁর "গরীবখানা"।

এবার পা থেকে জুতা খুলে আভিজাত্যের এ নিশানাটাকে আপাততঃ বগলদাবা করতে হলো। কারণ, রেল রাস্তা থেকে জমিদার সাহেবের বাড়িতে যেতে হলে জমির আইল বেয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই এবং এই আইল-পথে প্রায় সব জায়গায়ই হাঁটু সমান কাদা। কাদা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, জমিদার সাহেব তখন ডানে বাঁয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখাচ্ছিলেন, তাঁর খামারের জমি কোন কোনটা। আমিও মধ্যে মধ্যে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞেস করে করে মাটির মায়ায় মুগ্ধ জমিদার সাহেবকে উৎসাহ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ধানের ক্ষেতের স্বপ্ন মায়াটা যে কত মধুর, মধ্য-প্রদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীর এই সাধাসিধা জমিদারের প্রতি কথায় তার পরিচয় পেয়ে বাস্তবিকই আমি তখন মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

যখন জমিদার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা হবে। বাড়িতে পৌছেই বুঝতে পারলাম, আমাদের দেশের "জমিদার" আর মধ্য প্রদেশের "জমিদারে" কত পার্থক্য। যাদের জমির সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, এখানে তারাই "জমিদার"; কিন্তু মধ্য-প্রদেশের কৃষকরাই "জমিদার" পদবীর অধিকারী। জমির মালিক যে, সেই জমিদার-এই যদি জমিদার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, তবে মধ্য-প্রদেশের এলাকায়ই যে এই শব্দটার সুসঙ্গত ব্যবহার হচ্ছে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এদেশে সবই উল্টো-জমির প্রকৃত মালিক হয়েও এখনকার হতভাগ্য কৃষক "চাষা-মজুর," আর জমির সাথে যার চৌদ্দ পুরুষেরও কোনো সম্পর্ক নেই, সেই শহরবাসী মোটর-বিহারী বাবুরাই হচ্ছে এদেশে "জমিদার" এর চেয়ে শব্দের অপব্যবহার আর কি হতে পারে, তা সত্যিই ভাষাতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়।

জমিদার সাহেবের বাড়িতে পৌছেই সর্ব প্রথমে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরটায় একখানা চৌকির উপর উপবেশন করলাম। কিছুক্ষণ পর জমিদার সাহেব নিজেই বাড়ির ভেতর থেকে একটা রেকাবীতে করে দু'খানা চাপাতি রুটি ও সামান্য কিছু শিমের ভাজী এনে আমায় আপাততঃ কিছু নাশতা করে নিবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি জানালেন, ভাত রান্না হতে ঢের দেরী আছে, কাজেই কিছু নাশতা করে নেওয়া উচিত। সুতরাং কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করেই চাপাতি দু'খানার সদ্ব্যবহার করে নিলাম।

সেদিন ছিল শুক্রবার। কিছুক্ষণ পরই জমিদার সাহেবের সঙ্গে করোগেটের তৈরি গেঁয়ো জোমা মসজিদটায় নামাজ পড়তে যেতে হলো। নামাজ শেষ হয়ে গেলে পর জমিদার সাহেব মসজিদের মুসল্লীদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি বাঙালী, একথা জেনেই মুসল্লীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কাছ ঘেষে এসে বসলেন এবং জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বাঙালীরা সত্যি মস্তবড় যাদুগীর কিনা এবং মানুষকে তারা ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারে কিনা? বাঙালী জাতি সম্বন্ধে মধ্য-প্রদেশের এই সব সরল-প্রাণ পল্লী-কৃষকের অদ্ভুত আইডিয়াটা বুঝতে পেরে আমার বেজায় হাসি পেল। আমি হাসতে হাসতে তাদের বুঝিয়ে বল্লাম, বাঙালী যাদু-ফাদু কিছু জানে না, তারা অন্যান্য মানুষের মতোই সাধারণ মানুষ।

www.pathagar.com

জোমার নামাজের পর মসজিদ থেকে জমিদার সাহেবের বাড়িতে ফিরে বেশ তৃপ্তির সাথে আহার সম্পন্ন করলাম এবং অতঃপর শুয়ে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে পাড়া-বেড়াতে বেরুলাম। দেখলাম, গাঁয়ের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, বাঙলারই সাধারণ একটা অজ-পাড়াগাঁয়ের মতোই এ গাঁটা। পল্লীর অধিবাসীরাও সব্বাই অতি সাধাসিধা। পল্লী-বধূরা তাদের গৃহের বন্ধ দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিদেশী এ কিশোরকে দেখে বাঙলার পল্লী-বালার মতোই "বৈদেশী বধূকে" মনে করেছিল কিনা, জানিনা; কিন্তু তারা যে আমায় দেখে সত্যি আনন্দ পেয়েছিল, তাদের সঙ্কোচ সুষমামণ্ডিত মুখে-চোখে তারি আভাষ ফুটে উঠেছিল।

বকরীদের আর মাত্র দুই দিন বাকী ছিল এবং রায়পুরে গিয়ে ঈদ করব-তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম। সুতরাং পর দিন সকালেই জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে বিলাসপুরে ফিরে গেলাম এবং সেদিনই গাড়ীতে চেপে "রায়পুরের" উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বিলাসপুর থেকে রায়পুর যাওয়ার পথে গাড়ীতে ঘটল এক অতি করুণ ব্যাপার। আমি যে জায়গায় বসেছিলাম, তার চেয়ে প্রায় বিশ হাত দূরে গাড়ীর অপর কোণে এক মুণ্ডিত মস্তক প্রৌঢ় ছিন্ন-মলিন বসনে দেহ আবৃত করে বসেছিল। গাড়ীতে আরোহনের কিছুক্ষণ পর থেকেই লক্ষ্য করছিলাম লোকটি নেহায়েত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বারে বারে আমার মুখের পানে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সে উঠে এসে আমার পাশে বসল এবং কয়েক বার বিশেষ করে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নিয়ে শেষে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি?" আমি আমার নাম বল্লে পর প্রৌঢ় তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে পুনরায় আমার জাতীয়তা ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। আমি মুসলমান এবং বাঙালী-এই উত্তর দিয়ে হাসিমুখে প্রৌঢ়ের মুখের পানে চাইলাম। দেখলাম, উত্তর শুনে তার মুখখানা বিষাদভরে মলিন হয়েই উঠেছে এবং চোখে-মুখে কেমন যেন একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে সে আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।

প্রৌঢ়কে কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করেই রইলাম। কিন্তু এই নীরবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। সামান্য কিছুক্ষণ পরই প্রৌঢ় আমার দিকে চেয়ে ব্যথা-কাতর কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল- "তোম ঠিকসে বোলো, তোমহারা নাম ক্যা হ্যায়, আওর তোম কৌন জাতকা?" তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। আমার নাম এবং পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহের যে কোনো কারণই থাকতে পারেনা, হাসতে হাসতে এ কথা জ্ঞাপন করে আমি সন্দিগ্ধ প্রৌঢ়কে তার সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম।

আমার এ প্রশ্নে লোকটি একটা বুকফাটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। দেখলাম, তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। শতছিন্ন ধুতিখানার খোঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিল, বারো বছর আগের কথা, এক খুনের মামলায় পড়ে তার জেল হয়েছিল। জেলে যাওয়ার সময় পাঁচ বছরের পুত্র "লছমন" এবং

www.pathagar.com

তার অসহায়া মাতাকে বাড়িতে রেখে গিয়ে এই বারো বছরের মধ্যে তাদের আর কোনো খবরই সে পায়নি। তাই, জেল-খালাসীর পর আজ বাড়ী যাওয়ার পথে গাড়ীতে আমায় দেখে তার পাঁচ বছরের শিশু পুত্র "লছমনের" স্মৃতিই মনে জেগে উঠেছে। শিশু "লছমনের" চেহারা যে দেখতে অবিকল আমারি মতো ছিল এবং গত বারো বছরে সে যে হয়ত আমারি মতো বড় হয়ে উঠেছে, তা প্রকাশ করে রোরুদ্যমান প্রৌঢ় শেষে আমার হাত ধরে করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "বাপ, তোম ঠিকসে বোলো, মেরা লছমন ত তোম নেহি হো?"

স্নেহাতুর হতভাগ্য পিতার এই বিহ্বল ভাব দেখে বাড়ির স্মৃতি মনে করে বুক আমার ব্যথিয়ে উঠল। না জানিয়ে গৃহত্যাগ করে আমি আমার মা-বাপের মনে কী দারুণ ব্যথার আগুনই না জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি, তাই ভাবতে ভাবতে ধরা গলায় প্রৌঢ়কে প্রবোধ দিয়ে জানালাম, তার পুত্র "লছমন" আমি নই- সে বাড়িতে গিয়ে "লছমন" এবং তার মাকে অবশ্যই ভালো অবস্থায় দেখতে পাবে। আমার এ প্রবোধ-বচনে প্রৌঢ় যেন কতকটা আশ্বস্ত হলো; কাপড়ের খোঁটে চোখ মুছে নিয়ে আবার সে গাড়ীর জানালায় মুখ গলাল।

ব্যথিত হতভাগ্য পিতার বিহ্বলতার মাঝে এতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীর অন্যান্য লোকদের পানে চাইবারই ফুরসৎ হয়নি। এক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলাম, হতভাগ্য লোকটির এই কাতর অবস্থা দেখে গাড়ীর অধিকাংশ লোকই যেন কতকটা আমোদই উপভোগ করছিল। কারাগারের লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে দীর্ঘ বারোটি বছর পর্যন্ত কয়েদী জীবন কাটিয়ে যে হতভাগ্য আজ দুনিয়ার মুক্ত বাতাসে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছে এবং বারো বছর পর যে পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গের মতোই নীড়ের পথে ফিরে চলেছে, তার কাছে স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতিটা যে কত মোহময় হতে পারে, গাড়ীভর্তি সুখী মানুষগুলি যে তা বুঝতে না পেরে প্রকারান্তরে এই বিরহকাতর পিতার অন্তরাত্মাকে অপমানই করছিল, তাই ভেবে মনটা বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠল। সুতরাং প্রাণহীন এই ইতর লোকগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যথিত লোকটির সাথে দৃষ্টি মিলিয়ে বাইরের দিকেই অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে রইলাম।

রায়পুরে গিয়ে গাড়ী পৌঁছবার পূর্বেই একটা ছোট স্টেশনে লোকটি নেমে পড়ল। বিদায় বেলায় আবার তাকে তার বহুদিনের হারানো স্ত্রী-পুত্র-সম্বন্ধে আশ্বস্ত করে বিদায় দিলাম। লোকটি শেষবারের মতো স্নেহ নিষিক্ত দৃষ্টি দিয়ে আমায় দেখে নিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নেমে পড়ল। তারপর গাড়ীর এক কোণে বসে আনমনে কত কথাই না ভাবছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন গাড়ী গিয়ে রায়পুর স্টেশনের প্লাটফর্মে ধীরে ধীরে থামল, তখন "পানি-পাড়ে" "মিঠাইওয়ালা" ও কুলিদের হাঁক ডাকে আত্মস্থ হয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম।

স্টেশনের অদূরে অবস্থিত "ধর্মশালাটায়" আশ্রয় নিলাম এবং বহু যাত্রীর সাথে সেখানে শুয়ে কোন রকমে রাত কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খাবার কী ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করব বসে বসে তা-ই ভাবছি, এমন সময় এক চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স্কা যুবতী এসে আমার সামনে বসে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচভাবেই প্রশ্ন করল, খাবার কি ব্যবস্থা আমি করেছি? অপরিচিতার এই অদ্ভুত প্রশ্নে অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকার মতো হয়েই আমি বিস্মিতভাবে তার মুখের পানে চাইলাম। সে আমার এই নেহায়েত ছেলে মানুষী ভাব দেখে বুঝি একটু বিস্মিত এবং নিরাশই হলো। অদূরবর্তী একটা জ্বলন্ত উনুনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে অতঃপর হাসতে হাসতে সে জানাল, যদি দোকান থেকে আটা এনে দিতে পারি, তবে সে অতি আনন্দের সঙ্গে আমায় রুটি বানিয়ে দেবে। লক্ষ্য করে দেখলাম, কথাগুলি বলবার সময় তার চোখে মুখে সেবাপরায়ণা নারীর মোহনীয় পবিত্র ভাবটাই যেন ফুটে উঠেছে। সুতরাং আর কোন কিছু না ভেবেই উঠে পড়লাম এবং পার্শ্ববর্তী মুদীর দোকানটায় গিয়ে সেখান থেকে কিছু আটা কিনে এনে প্রতীক্ষমান যুবতীর হাতে দিলাম।

ধর্মশালার কলটায় গোসল করে এসে নিজের বিছানায় বসলে পর যুবতী একটা থালায় করে দু'খানা রুটি এনে আমার সামনে হাজির করে জিজ্ঞাসা করল, তরকারীর কোনো ব্যবস্থা যে আমি করিনি, এর দ্বারা কি এই বুঝতে হবে যে, বেদেনীর হাতের পাক করা তরকারী খেতে আমার কোনো আপত্তিই নেই? নারী যে হিন্দু এবং বেদে, তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালাম-আমার রুটী যার হাতের তৈরি, সে যে জাতেরই হোক না কেন, তার রান্না তরকারী খেতে আমার কোন আপত্তিই থাকতে পারেনা। হাসতে হাসতে একটা পেয়ালায় করে কতকটা শাক এনে নারী আমার সামনে রাখল।

রায়পুরে মোট তিন দিন ছিলাম। যাযাবর এই বেদেনীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও ধর্মশালাটা ত্যাগ করে আর কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিতে পারিনি। বেদেনীর সঙ্গে তার স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদী প্রভৃতি সব কেউ ছিল; কিন্তু সে যেন আমায়ও তাদের মধ্যেই এক জন করে নিয়েছিল। তিন দিন দু'বেলাই ধর্মশালার এই বেদের আস্তানায়ই খেয়েছি, রাত্তিরে তাদেরই পাশে অদূরে বিছানা পেতে একা-একা শুয়ে পড়েছি। ঈদের দিন নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যাওয়া যে দরকার, বেদেনী হাসতে হাসতে আমায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে অদূরবর্তী মসজিদটাও দেখিয়ে দিয়েছিল। নামাজ শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে শহরটা দেখে বিকেলের দিকে যখন ধর্মশালায় ফিরে এসেছিলাম, বেদেনী তখন যেন একটু ধমকানীর সুরেই আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল- সারাটা দিন আমার কাটল কোথায়?

তার এ-কথার কোন উত্তরই দেইনি তখন। কিন্তু পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নিদ্রিতা বেদেনীকে কোনো কথা না জানিয়েই চুপি চুপি ধর্মশালা ত্যাগ করলাম। স্টেশনে এসে যখন গাড়ীতে চাপলাম, তখন পূব আকাশে সূর্য ঝিলিক মেরে উঠেছে। গাড়ীতে বসে ভাবছিলাম, ঘুম থেকে উঠে যখন বেদেনী দেখবে, "পোষ-না-মানা জংলা পাখী" শিকলী কেটে পালিয়ে গেছে, তখন তার মুখখানা কেমন হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ মঞ্জিল

পথে দ্রুগ, রাজনান্দগাঁও এবং ডোঙারঘর এই কয়টা বিশিষ্ট স্টেশন পেরিয়ে মধ্য-প্রদেশের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে সেন্টার "গোণ্ডিয়ায়" গিয়ে পৌছলাম প্রায় সন্ধ্যের সময়। এই "গোণ্ডিয়া" থেকে Narrow gauge একটা লাইন উত্তর দিকে জব্বলপুর পর্যন্ত গিয়েছে এবং আর একটা লাইন দক্ষিণ দিকে "নাগভীর" নামক স্থানে গিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সাথে মধ্য-প্রদেশের মিলন ঘটিয়েছে। কাজেই স্টেশনটা খুবই বড় একটা জংশন-স্টেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ী থেকে স্টেশনে নেমেই তাড়াতাড়ি বাজারের মধ্যস্থ একটা পাকা মসজিদে গিয়ে আস্তানা জমালাম এবং মগরেবের নামাজের পর এক বেচারা গরীব দোকানদারের সাথে গিয়ে তার দোকান থেকে দয়ার দান স্বরূপ কিছু খাবার খেয়ে ক্ষুধিত উদরকে কতকটা শান্ত করলাম। রাতটা কাটলো বেশ শান্তিতে। সেদিন মসজিদে আমারি মতো আর এক হতভাগা ভ্যাগাবন্ড এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এশার নামাজের পর দুই পথিক বন্ধু পথের প্রেমের কথা আলাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেলা এগারোটার সময় খাবার সন্ধানে বেরুতে হলো। বাজারের মধ্যস্থ এক মস্ত বড় বিড়িওয়ালা সুন্নী মুসলমানের আড়তে গিয়ে ক্ষুধিত মুসাফির দু'টো খাবার ভিক্ষা করলে পর, মোটা ভুড়িওয়ালা দোকানদার সাহেব মাথা হেলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- "নওকরী করোগে?" মনে মনে বল্লাম,- বহুৎ আচ্ছা, নওকরী করতে এ বান্দা আদৌ পেছপা নয়। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম "ক্যায়া নওকরী?" দোকানদার সাহেব তেমনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন- "খানা পাকানে সাকোগে?" বাপদাদা চৌদ্দপুরুষেও কেউ কোন দিন খানা-পাকানোর তালিম না পেলেও তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলাম, "খানা-পাকানা আচ্ছাতরো মালুম নেহি হ্যায়, মগর দেখনেসে দু'এক রোজ মে শিখলেয়গা।" দোকানদার সাহেব হেসে বল্লেন, "বহুৎ আচ্ছা, রহ যাও।" বিড়িওয়ালা মহাজনের দোকানে খানা-পাকানেওয়ালা বাবুর্চির কাজে ভর্তি হয়ে গেলাম।

রাত্তিরে খিচুঁড়ি পাকাবার ফরমায়েশ হলো। দোকানদারের এক ভাই-পো চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে আমায় সব দেখিয়ে দিলেন এবং আমিও বেশ ফুর্তির সঙ্গেই খিচুড়ি ও গোশত পাকিয়ে তৈরি করলাম। খেতে বসে দোকানদার সাহেব নতুন বাবুর্চির হাত-যশের তারিফ না করে পারলেন না এবং দু'একদিন দেখিয়ে দিলে যে আমি খুব ভালো বাবুর্চিতেই পরিণত হব তাও প্রকাশ করতে ভুললেন না।

www.pathagar.com

খাওয়া হয়ে গেলে পর আলবোলায় তামাক সেজে দোকানদার সাহেবের সামনে হাজীর করলাম এবং বিরাট একটা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে তিনি অর্ধ নিমিলিত নেত্রে ধুমপান করতে লাগলেন। পাশে তাঁর বছর দশেক বয়সের ছোট ছেলেটি ইংরাজি বইয়ের পড়া মুখস্ত করছিল; আর চৌকির এক পাশে মাটিতে বসে বাবুর্চির মতোই আমি মুনিবের দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করছিলাম।

অকস্মাৎ ছেলেটি চেঁচিয়ে পড়ে উঠল, Moon মানে আফতাব সুরষ; Moon আফতাব-সুরষ।" বাবুর্চি হলেও আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। Moon মানে যে "আফতাব-সুরষ" নয়, বরং "মাহতাব-চাঁদ" হওয়াই উচিত, তা ঘোষণা করার জন্যে জিহ্বা আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অজ্ঞাতসারেই ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলে ফেল্লাম, "নেহি, Moon কা মৎলব আফতাব নেহি, বোলকে মাহতাব-চাঁদ হ্যায়।"

আমার এই কথায় ধুমপান-রত দোকানদার সাহেব চাবুকাহত ঘোড়ার মতোই লাফিয়ে উঠে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যা তুমকো ইংরাজি ভি মালুম হ্যায়?" হাসতে হাসতে মাথা নিচু করে উত্তর দিলাম, "জি হাঁ, থুরা-থুরা কুচ মালুম হ্যায়।" দোকানদার তখন পার্শ্ববর্তী একটা ফাইল থেকে একখানা টাইপ করা চিঠি বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "পড়কে মুঝে সমঝা দেও।" চিঠিখানা ছিল নাগপুরের এক দোকানদারের, তিন লাখ বিড়ির অর্ডার দিয়ে তিনি তা অতি সত্বর ভি-পিতে পাঠিয়ে দিতে লিখেছিলেন। পড়ে আমি দোকানদারকে তা বুঝিয়ে দিলাম। সামনের কলমদান থেকে কলমটা তুলে আমার হাতে দিয়ে দোকানদার সাহেব অতঃপর আদেশ করলেন, আমার নামটা লিখতে। Hand-writing আমার ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালো ছিল; সুতরাং মুক্তোর মতো হরফেই একখণ্ড কাগজের উপর নিজের নামটা স্বাক্ষর করে ফেললাম।

এবার পরীক্ষা শেষ হলো। দোকানদার সাহেব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বল্লেন, "কালসে তুমকো আওর খানা-পাকানো নেহি হোগা; মুন্‌শী কা কাম করোগে, মাহিনামে খানা বেগর আওর পন্দরো রুপেয়া তনখা মিলেগা।" সুতরাং এক দিনেই বাবুর্চিগিরী থেকে পনর তঙ্কা বেতনের মুনশীগিরী অর্থাৎ কেরানীতে উন্নীত হলাম; ডিউটি হলো কারখানায় গিয়ে সকল কারিগরের দৈনিক কাজের হিসাব লওয়া এবং রোজ সন্ধ্যের সময় কারিগরদের মজুরী হিসাব করে চুকিয়ে দেওয়া।

এক মাস কাল বিড়িওয়ালা মহাজনের আড়তে কাজ করলাম। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাশতা করে কারখানায় যেতাম এবং সারা দিন সেখানে থেকে প্রায় শ'তিনেক কারিগরের কাজের তদারক করে সন্ধ্যের সময় তাঁদের মজুরী হিসাব করে বুঝিয়ে দিয়ে তবে দোকানে ফিরতাম। দুপুর বেলা একবার ঘন্টাখানেকের জন্যে দোকানে এসে খেয়ে আবার কারখানায় যেতাম।

www.pathagar.com

কারখানাটা দোকান থেকে সামান্য একটু দূরে শহরের প্রান্তসীমায় একটা মস্তবড় গুদামে অবস্থিত ছিল। কারিগরদের প্রায় সব্বাই ছিল স্থানীয় নিম্নজাতীয় হিন্দুদের ঘরের মেয়ে। দশ বছরের ছুকরী থেকে শুরু করে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের প্রৌঢ়া পর্যন্ত সকল বয়সের প্রায় শ'তিনেক মেয়ের মাঝে এক পাশে একখানা টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে "মুনশীর" কাজ করা যে একটা রক্ত-মাংসের পুরুষ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার, তা না বল্লেই চলে। কিন্তু দীর্ঘ একমাস কাল রোজ আমায় এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হয়েছিল।

কাজ করতে করতে মেয়েরা সময় সময় নিজেদের মধ্যে এমন সব অশ্লীল কথার আলোচনা করত যে, তাদের ভাষা বুঝতে না পারলেও, তাদের বেহায়ামী পূর্ণ ভাবভঙ্গি দেখে অনেক সময় আমায় মাথা নিচু করেই থাকতে হতো। একটা মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে সবচে বেহায়া। দেখতাম, সঙ্গিনীদের সাথে কথা বলতে বলতে হেসে সে তাদের গায়ে ঢলে পড়ছে এবং ইচ্ছা করেই যেন অসংবৃতা সাজবার প্রয়াস পাচ্ছে। অনেক সময় তার এই বেহায়ামী দেখে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভবপর হয়নি-চোখ রাঙিয়ে ধমকী দিয়েই আমায় তাকে শান্ত করতে হয়েছে।

আর একটা মেয়ে ছিল এই বেহায়া যুবতীর সম্পূর্ণ উল্টো। সে তার নয়নম্র সলজ্জভাবের মাধুরী দিয়ে নিজেকে যেন তার বাকী তিনশো সঙ্গিনী থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করেই রেখেছিল। একটা কালো-পেড়ে পরিষ্কার ধুতি পরে ছাতা হাতে চতুর্দশী এই কিশোরী যখন মাথা নিচু করে এসে কারখানায় ঢুকত, তখন মনে হতো বিজয়িনীর গর্বই যেন লাজনম্রা এই বালিকার চোখে-মুখে খেলা করছে। নত মস্তকে একটা সলজ্জ নীরব নমস্কার জানিয়ে বালিকা সেই যে এক কোণে গিয়ে কাজে মশগুল হয়ে পড়ত, তারপর সারাদিন তাকে আর কারো সাথে কথা বলতে দেখিনি কোনো দিন।ং সন্ধ্যের সময় একটা ডালায় করে নিজের সারা দিনের কাজ সাজিয়ে এনে আমার সামনে রেখে বালিকা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করত "যমুনা, দেড় হাজার।" খাতা খুলে "যমুনার" নামটা বের করে আমি সেখানে তার উচ্চারিত সংখ্যাটি লিখে নিয়ে হিসাব করে পয়সাগুলি তার হাতে তুলে দিতে গিয়ে একবার হয়ত মুখের পানে চাইতাম। কিন্তু মাথানিচু করে নীরবে পয়সাগুলি হাতে নিয়ে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার জানিয়েই "যমুনা" যেমন করে এসেছিল, তেমন করেই চারদিকে গর্বের একটা স্পন্দন জাগিয়ে বেরিয়ে যেতো। তিনশ' নারীর মাঝে এই বালিকাটিই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু "যমুনা দেড় হাজার-অথবা দু'হাজার" এই তিন শব্দের একটি কথা ছাড়া দীর্ঘ এক মাসের চাকরী জীবনে আর কোন কথাই তার সাথে আমার হয়নি।

একমাস কাজ করার পর বুঝতে পারলাম, বিড়িওয়ালা মহাজনের কারবারে পনর তঙ্কা বেতনের মুনশীগিরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা আমার মত ছন্নছাড়া পথ-পাগল লোকের কিছুতেই

www.pathagar.com

চলতে পারে না। সুতরাং একদিন সকালে দোকানদার সাহেবের নিকট গিয়ে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। দোকানদার সাহেব ব্যথিত চিত্তেই আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং এক মাসের বেতন পনরটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বিদায় দিলেন।

পথিক আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে সোজা নাগপুরের পার্শ্ববর্তী "এতোয়ারী" জংশনে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। নাগপুর শহরটা যে বেশ বড় একটা জায়গা, "এতোয়ারীর" দৃশ্য দেখেই তা বুঝতে বাকী রইল না। বড় বড় ময়দান শোভিত "এতোয়ারীর" স্বাভাবিক শোভা এত মনোরম যে বাস্তবিকই সে সৌন্দর্য আজো ভুলতে পারিনি।

একটা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে প্রথম দিনটা "এতোয়ারীতেই" কাটালাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর চলতে চলতে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই খাস নাগপুর শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেশনের অদূরেই একটা বাজারে কমলা-লেবুর ক্রয়-বিক্রয় খুব হচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, নাগপুর অঞ্চলে নাকি সিলেটের মতোই প্রচুর কমলা-লেবু জন্মে। স্থানীয় লোকেরা কমলালেবুর নাম দিয়েছে "নারঙ্গী"। পকেট থেকে পয়সা বের করে দু'পয়সায় দু'টো খুব ভালো "নারঙ্গী" কিনে এই নাগপুরী মেওয়ার মজাটা চেকে নিলাম এবং তারপর বাজার থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে আবার পথ চলা শুরু করলাম।

চলতে চলতে উপস্থিত হলাম গিয়ে বিরাট এক দিঘীর পাড়ে। "এম্প্রেস কটন মিলের" পার্শ্বেই এই প্রকাণ্ড দিঘীটা প্রায় পোয়া মাইল খানেক জায়গা নিয়ে বিরাজ করছে। এতবড় দিঘী সারা ভারতে একমাত্র বরোদায়ই ইতিপূর্বে একটা দেখেছিলাম; তাছাড়া আর কোথাও এরকম বড় জলাশয় দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দিঘীর পাড় দিয়ে চলে যাওয়া পথে দক্ষিণ দিকে আর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একস্থানে একটা মসজিদ দেখে সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিলাম এবং দুপুরটা কাটালাম এই খোদার ঘরেই শুয়ে। সে সময়ে সেখানে আর এক ভ্যাগাবণ্ড মুসাফিরও ছিল। কথায় কথায় লোকটি প্রসিদ্ধ দরবেশ তাজউদ্দীন বাবার কথা উল্লেখ করল। সরকার দু'বার দরবেশ সাহেবকে ধরে পাগলা-গারদের লৌহ-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ করলেও বাবা তাজউদ্দীন তার বিস্ময়কর কারামত প্রভাবে কেমন করে দু'বারই সকল শাস্ত্রী সেপাইর চোখে ধুলো দিয়ে মাত্র এক রাতের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই কাহিনী বর্ণনা করে মুসাফির বন্ধু প্রস্তাব করলেন- শহরের অদূরবর্তী "রাজাবাগ" নামক স্থানে গিয়ে বাবার কদমবুছি করে আসার জন্যে।

তাজউদ্দীন বাবার নাম এর আগেও নানান লোকের কাছে কয়েক বার শুনেছিলাম। সুতরাং নাগপুরে এসেও তাঁকে না দেখে চলে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত মনে করলাম না। কিন্তু তখন

www.pathagar.com

প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল বলে সেদিন আর তথায় না গিয়ে পরদিন সকালে যাব বলেই স্থির করলাম এবং রাতটা সে মসজিদেই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে। ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর কিঞ্চিত নাশতা করে নিয়ে দুই পথিক বন্ধু "রাজাবাগের" পথে যাত্রা করলাম। শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় মাইল চারেক দূরে ভোঁশলা রাজাদের বাগান-বাটী এই "রাজাবাগ"। শুনলাম, বর্তমান রাজা সাহেব নাকি তাজউদ্দীন বাবার বিশেষ ভক্ত এবং এই ভক্তির নিদর্শন স্বরূপই নিজের সুন্দর বাগান-বাড়িটা তিনি বাবার বাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

"রাজাবাগে" যেতে হলে শহরের দক্ষিণ প্রান্তসীমা থেকেই জংলা পথে পা বাড়াতে হয়। রাস্তাটা পাকা বটে; কিন্তু পথের দু'পাশেই ঝাড়-জঙ্গল ও ছোটখাট টিলার প্রাচুর্য নজরে পড়ে। দেখলাম পথের পাশে পাহাড়ের গায় যত পাথর রয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই সিঁদুরের রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা যে কতটা বোৎপোরস্ত ও কুসংস্কারাপন্ন, রঞ্জিত পাথরগুলি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

পথে এক স্থানে এক খেজুর গাছ-তলায় পাথরের তৈরি এক বীভৎস দেবীমূর্তি নজরে পড়ল। বাঙলার কালীমূর্তির মতোই নাগপুরী এই দেবীর শরীরেও কাপড়-পোষাকের কোনো বালাই ছিল না এবং বাহ্য সৌষ্ঠবের দিক দিয়েও কালীঘাটের দেবীর চাইতে একে বীভৎসতর বলেই মনে হলো। মাত্র পূর্বদিনও যে কোনো ভক্ত দেবীর পূজো দিয়ে গেছে, মুর্তির গলায় দোদুল্যমান বাসি ফুলের একটা মালা এবং পাদদেশে ইতস্ততঃ বক্ষিপ্ত কয়টা মাটির ভাঁড়ই তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবীর এই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ সঙ্গী বন্ধুটির নজর পড়ল গাছের মাথায় এক থোবা লাল টকটকে খেজুরের উপর। বন্ধুবর আনন্দিতশয্যে প্রায় লাফিয়ে উঠে জানালেন, পথি-পার্শ্বস্থ লা-ওয়ারিস গাছের ফলে প্রত্যেক পথিকেরই ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে এবং পাকা খেজুরগুলি গাছ থেকে পেড়ে তিনি এই অধিকারই প্রতিপন্ন করতে চান। তাঁর এই অদ্ভুত ইচ্ছার বিকাশটা যদি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কোনও ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে গাছতলায় যে কুরুক্ষেত্রকাণ্ডের অনুষ্ঠান হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে, হাসতে হাসতে বন্ধুবরকে একথাটাই বুঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কান না দিয়ে মুহূর্ত মধ্যে লাফ দিয়ে গাছের নিকটস্থ হলেন এবং দেবীমুর্তির কাঁধে ভর দিয়ে অবলীলা ক্রমে গাছে উঠে খেজুরের থোবাটি ছিঁড়ে দু'মিনিটের মধ্যেই আবার পথে ফিরে এলেন। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলে "দেবীর দান" পাকা খেজুরগুলি খেতে খেতে "রাজাবাগের" পথে অগ্রসর হলাম।

যখনা "রাজাবাগে" গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১টা হবে। চারদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানটি অর্ধমাইল খানেক জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে। বাগানের মাঝে দু'তিনটা লাল রঙের পাকা এমারত আছে এবং এখানে সেখানে কতিপয় পিঞ্জরে কয়েকটা

www.pathagar.com

বাঘ-ভালুক ও অন্যান্য নানা রকম জানোয়ারকে বন্দী রেখে বাগানটাকে একটা ছোট রকমের চিড়িয়াখানায় পরিণত করা হয়েছে দেখা গেল।

প্রকাণ্ড গেট পেরিয়ে বাগানের মাঝে ঢুকে একটা গৃহে অনেকগুলি লোককে দেখে আমরাও সেখানে গেলাম এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, বেলা তিনটার আগে বাবার দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই; কারণ তিনি নাকি কিছুক্ষণ আগেই অকস্মাৎ জঙ্গলের মাঝে কোথায় চলে গিয়েছেন। সুতরাং অন্যান্য বহু যাত্রীর সাথে আমরাও বাবার প্রত্যাগমনের আশায় সেখানে বসেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেলা যখন প্রায় আড়াইটা হবে, তখন অকস্মাৎ লোকজন সব্বাই ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং সামনে লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রায় ৬ ফুট লম্বা কৃষ্ণকায় বিশীর্ণ দেহ এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। পার্শ্ববর্তী বন্ধু আমার কানে কানে জানালেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান বিরাট পুরুষটিই আমাদের বাঞ্ছিত বাবা তাজউদ্দীন। মাথা তুলে বাবার মুখের পানে চাইলাম। দেখলাম, আবক্ষ বিলম্বিত তাঁর শ্বেত শশ্রু ও কোটরগত চোখ থেকে প্রকৃতই যেন একটা বিস্ময়কর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হলো, গভীর দৃষ্টি দিয়ে যেন বাবা ক্ষণকালের মধ্যেই সমাগত প্রায় শ'খানেক নর-নারীর প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশটুকু পর্যন্ত দেখে নিলেন। আমার দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "ওঃ তুমি এসেছ। বেশ, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে।" তাঁর এ কথার কোন অর্থ তখন বুঝতে পারিনি এবং আজো তা আমার কাছে হেঁয়ালীর মতোই রয়ে গেছে।

এক নারী-যাত্রী তাঁর রুগ্ন শিশু সন্তানকে কোলে করে নিয়ে বাবার সামনে গিয়ে বসলে বাবা অকস্মাৎ মার কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে নিকটস্থ একটা বাঘের খাঁচায় গিয়ে প্রবেশ করলেন নারী চিৎকার করে উঠল এবং যাত্রীদেরও সব্বাই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে খাঁচার চারপাশ ঘিরে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে বাবা খাঁচার এক পাশে গিয়ে বসে শিশুটিকে কোলে নিয়ে দিব্যি আরামে ছোলাভাজা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিশুর মুখেও এক-আধটা ছোলা তুলে দিচ্ছিলেন। বাবার অনুচরেরা শিশুহারা জননী এবং সকল যাত্রীকে আশ্বস্ত করে জানালেন, ভয়ের কোনও কারণই নেই, যতক্ষণ শিশু বাবার কোলে আছে ততক্ষণ বাঘ তার কোন অনিষ্টই করতে পারবেনা। বস্তুতঃ দেখলামও তাই। প্রায় ১৫ মিনিট কাল বাবা শিশুকে কোলে নিয়ে বাঘের খাঁচায় কাটালেও ব্যাঘ্র পুঙ্গব যেন তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্যই করলনা, বরং অদূরে লম্বা হয়ে শুয়ে সে তখন দিবা-নিদ্রা উপভোগেরই আয়োজন করছিল। প্রায় পনর মিনিট পরে বাঘের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে কোনো কথা না বলেই বাবা শিশুকে আবার জননীর কোলে সমর্পণ করলেন এবং তখন তখনই দৌড়ে জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করলেন।

সুতরাং বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তেই আমরা "রাজাবাগ" ত্যাগ করলাম এবং শহরে ফিরে এসে

www.pathagar.com

একটা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের সামনে দেখা পূর্বদিনের জীবন্ত ওলির বিস্ময়কর কারামতের কথা ভাবতে ভাবতেই স্টেশনে গিয়ে ওয়ার্দার পথে পাড়ি জমালাম।

জীবন পথে কতকটা সাফল্য লাভের পর কয়েক বছর আগে একবার মনে করেছিলাম, আবার নাগপুরে গিয়ে পাগলা দরবেশ তাজউদ্দীন বাবাকে দর্শন করে আসব। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, এ দুনিয়ায় তিনি আর নেই- অনেক দিন আগেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

www.pathagar.com

ষোড়শ মঞ্জিল

নাগপুর থেকে রওয়ানা হয়ে "ওয়ার্দ্ধায়" গিয়ে নেমে এক রাত্রি সেখানেই অবস্থান করলাম। মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিয়ে মনে করেছিলাম, বেশ শান্তিতেই বুঝি রাতটা কেটে যাবে; কিন্তু টিকটিকি পুলিশের জ্বালায় স্থির হয়ে বসতেও পারলাম না। রাত যখন প্রায় আটটা হবে, তখন এক পুলিশ প্রহরী এসে নবাগত আরো প্রায় অর্ধ ডজন মুসাফিরের সাথে আমাকেও থানায় নিয়ে চল্ল। থানায় উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রত্যেককেই একে একে দারোগা পুঙ্গবের সামনে গিয়ে নিজেদের কুর্সীনামা পুরোপুরি বয়ান করে পরদিন সকালে আবার থানায় হাজিরা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে মুক্তি পেতে হলো।

এই পুলিশী জুলুম থেকে মুক্তিলাভের পর মুসাফিরখানায় ফিরে বাকি রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সর্ব প্রথমে প্রতিশ্রুতি মত থানায় গিয়ে আবার দারোগা পুঙ্গবের 'চেহারা-মোবারক' জেয়ারৎ করে নিয়ে অতঃপর শহর দেখতে বেরুলাম। ওয়ার্দা শহরটা একটা জেলার সদর, তার উপর স্টেশনটা বেশ বড় একটা জংশন। সুতরাং স্কুল আদালত এবং নানারূপ সরকারী অফিসের বিল্ডিং প্রভৃতিতে শোভিত হয়ে এই ক্ষুদ্র শহরটা বেশ সুন্দর হয়েই গড়ে উঠেছে, দেখা গেল। শহর দেখার পর স্টেশনের নিকটবর্তী একটা হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেলের দিকে গাড়ী ধরলাম।

"ওয়ার্ধা" থেকে সোজা "বাদনেরা" জংশন এবং সেখান থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে "অমরাবতী"তে গিয়ে এক রাত সেখানেই এক মসজিদে আশ্রয় নিয়ে কাটালাম। এই "অমরাবতীতেই" ইসলাম-কেশরী আলী ভ্রাতৃযুগল তাঁদের মহীয়সী জননীর সাথে অনেক দিন পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন। সুতরাং অমরাবতী জায়গাটার আর কোনো গুরুত্ব না থাকলেও আলী-ভাইদের অন্তরীণের জায়গা এটা, এই হিসেবেই জায়গাটা দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। কিন্তু স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, কয়েক মাস পূর্বেই নাকি সরকার আলী-ভাইদের মুক্তি দিয়েছেন।

কাজেই অনেকটা ব্যর্থ-মনোরথ হয়েই পরদিন সকালে অমরাবতী ত্যাগ করলাম এবং "বাদনেরায়" ফিরে সেখান থেকে গাড়ীতে চেপে সোজা "আকোলায়" গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম।

"আকোলা" বেরারের এলাকাধীন একটা বিখ্যাত শহর। দেখলাম, একদল বেশ সঙ্গতিপন্ন চর্ম ব্যবসায়ী মুসলমান সেখানে রয়েছেন। যেখানে চামড়ার আড়ৎগুলি অবস্থিত, তারি

www.pathagar.com

অদূরে একটা পাকা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। এশার নামাজের পর মসজিদের বারান্দায় শোবার আয়োজন করছি, এমন সময় মাথায় সাদা পাগড়ী বাঁধা বছর ত্রিশেক বয়সের আর এক মুসাফির এসে মসজিদে ঢুকলেন এবং আমার নিকটে এসে আলাপ করতে বসলেন।

কিন্তু দুই ভ্যাগাবণ্ড বন্ধুতে আলাপ আর সহজে জমে উঠলনা। নবাগত লোকটি না জানে উরদু-না জানে ইংরাজি। প্রথমতঃ সে আরবী ভাষায়ই আমার সাথে কথা বলবার প্রয়াস পেল। আমি অনেকটা হাবা-গঙ্গারামের মতোই বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দুর্বোধ্য কথাগুলি শুনছি দেখে লোকটি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল যে, আরবীতে কথা বলার স্থান এ নয়। তাই অবশেষে অতি কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উরদুতে সে আমায় তার পরিচয় দিল। তার এই কথাগুলি দ্বারা বুঝতে পারলাম, মোপলা জাতীয় মুসলমান সে এবং আরবী ও মাতৃভাষা "মালয়লম" ছাড়া আর কোনো ভাষাই তার জানা নেই।

কথায় কথায় লোকটির সাথে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গেলো এবং এক সঙ্গে দু'জনায় বোম্বাই পর্যন্ত যাব বলে স্থির হলো। অতঃপর মসজিদের বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা করেই উভয়ে এক গাড়ীতে চেপে "ভূসাওয়ালের" পথে যাত্রা করলাম।

"ভূসাওয়ালে" গিয়ে যখন পৌঁছল্যাম তখন বেলা প্রায় একটা হবে। স্টেশনটা এত বড় যে দেখেই সেখানে নামবার ইচ্ছে হলো; কিন্তু সঙ্গী মোপলা বন্ধুটি দ্বিমত করায় শেষে মনের সেই ইচ্ছাটাকে মনের মাঝেই চাপা দিয়ে রাখতে হলো। আধ ঘন্টাখানেক এখানে Wait করার পর আমাদের বুকে করে গাড়ী আবার অগ্রপথে রওয়ানা হলো এবং সন্ধ্যার সামান্য কিছুক্ষণ আগেই "চল্লিশগাঁও" নামক বেশ বড় একটা স্টেশনে গিয়ে থামল।

এক্ষণে কি করা যায়, তাই স্থির করার জন্যে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করতে বসলাম এবং আপাততঃ চল্লিশগাঁওয়ে নেমে রাতটা সেখানেই থেকে যাওয়ার মনস্থ করলাম। কিন্তু স্টেশনের বাইরে এসে পথে পা দিয়েই আক্কেল-গুড়ুম হয়ে গেলো। দেখলাম, স্টেশনটা বেশ বড় হলেও "চল্লিশগাঁও" জায়গাটা আদৌ বড় নয়-সামান্য একটা ছোট্ট টাউনের মতো। স্থানটার নাম "চল্লিশগাঁও" হলেও আকারে এবং গৌরবে তা "এক-গাঁয়ের" চাইতে কোনো অংশেই যে শ্রেষ্ঠতর হতে পারে না, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তা বুঝতে পেরে আপাততঃ কোন একটা আশ্রয় খুঁজে নিতেই তৎপর হলাম।

বাজারের মাঝে এদিক-সেদিক অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুরেও দুভার্গ্য বশতঃ কোথাও খাবার ব্যবস্থা করতে না পেরে অবশেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে একটা খোলার তৈরি মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং মসজিদের প্রাঙ্গনে একটা চুল্লী তৈরি রয়েছে দেখে খাবার জন্যে ভাত পাকিয়ে নেব বলেই স্থির করলাম। মসজিদের প্রাঙ্গনেই একটা মাচায় কয়টা কচি

www.pathagar.com

চালকুমড়ো ঝুলছে দেখে ভাত-পাকিয়ে খাওয়ার ইচ্ছেটা যেন আরো প্রবল হয়ে উঠল। সুতরাং কোনরূপ দ্বিধা না করেই গাঠরী-বোচকা সব মসজিদে রেখে বাজারে বেরিয়ে পড়লাম এবং সেখান থেকে একটা হাঁড়ি, কিছু চাল আর সামান্য পরিমাণ লঙ্কা ও নেমক কিনে নিয়ে মসজিদে ফিরে এসে রাঁধতে বসলাম।

"পরের জিনিষ না বলে নিলেই চুরি করা হয়" এই নীতি বাক্যটা পাঠশালায় পড়া থাকলেও, খোদার ঘর মসজিদের প্রাঙ্গনে অবস্থিত মাচা থেকে জালি চাল-কুমড়ো পেড়ে উদরজ্বালা নিবারণের ব্যবস্থা করলে তাও চুরি হবে কিনা, এ মসলাটা জানা ছিল না। সুতরাং বিনা-দ্বিধায় দু'টো কচি কুমড়ো পেড়ে আনলাম এবং মসজিদের প্রাঙ্গনে কুড়িয়ে পাওয়া একখানা লোহার পাত পরিষ্কার করে তাই দিয়ে কুমড়ো দু'টো কুচি কুচি করে কাটলাম। অতঃপর চুল্লীতে ভাত চাপিয়ে কুমড়োগুলিও নুনলঙ্কা মিশিয়ে ভাতের হাঁড়িতেই ঢেলে দিলাম। অর্থাৎ অসভ্য জংলীদের মতো কুমড়ো খিচুড়ী পাকাবারই ব্যবস্থা করলাম।

আধ-ঘন্টার মধ্যেই আমাদের এই অদ্ভুত খিচুড়ী- খানা তৈরি হয়ে গেলো। অতঃপর এশার নামাজের পর দুই বন্ধুতে খেতে বসলাম। মুসল্লীদের ওজু করার দু'টো মেটে ভাঁড় এনে তা দিয়েই আপাততঃ বাসনের কাজ চালাবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু প্রথম লোকমা মুখে দিয়েই "ওয়াক"। দেখলাম, কচি কুমড়োগুলির রস ভাতের সঙ্গে মিশে সবটা খাবারই একদম জহরের মতো তেতো হয়ে উঠেছে।

খাবার থেকে হাত তুলে দুই বন্ধু অতঃপর নেহায়েত বোকার মতোই পরস্পরের মুখ-চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। কোন উপায় যে তেতো ভাতগুলিকে মুখ দিয়ে ঠেলে পেটের ভেতর ঠেসে দেওয়া যায়, তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি যোগালো। উঠে মসজিদের কুয়ো থেকে গিয়ে এক বালতী পানি তুলে আনলাম এবং মোপলা-বন্ধুর মতামতের কোন পরওয়া না করেই সবটা পানি ভাতের হাঁড়িতে ঢেলে দিলাম। অতঃপর দু'হাতে কচলিয়ে ভাতগুলি খুব ভালো করে ধুয়ে নিলাম এবং কুমড়ার সবগুলি টুকরো বেছে ফেলে দিয়ে ভাত-ধোয়া পানিটাও নিঙড়িয়ে ফেলে দিলাম। এক লোকমা ধোয়া-ভাত মুখে দিয়ে আস্বাদ নিয়ে দেখতে পেলাম, বাঙলার পান্তার মতোই তা সুমধুর হয়ে উঠেছে- তেতো-ফেতো আর কিছু নেই। সুতরাং দুই বন্ধুতে মিলে নেমক দিয়ে রাক্ষুসেগ্রাসের সাথেই সেই অপূর্ব পান্তাগুলির সৎকার করতে লেগে গেলাম। খেতে খেতে মনে হলো, কুমড়ো-চুরির জন্যিই বুঝি আমাদের এ দুর্ভোগ।

যাক, খাওয়া-দাওয়ার পর দিব্যি আরামে শুয়ে সেই মসজিদেই রাতটা কাটিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই "চল্লিশ গাঁওয়ের" পায়ে নমস্কার করে স্টেশনে গিয়ে পুণার গাড়ীতে চেপে বসলাম।

"চল্লিশগাঁও" থেকে রওয়ানা হয়ে "মনমদ" জংশনে গিয়ে গাড়ী বদল করলাম। "মনমদ"

www.pathagar.com

থেকে তিনটা লাইন তিন দিকে চলে গিয়েছে-একটা সোজা বোম্বাইর পথে, দ্বিতীয়টা পুনার দিকে এবং আর একটা নিজাম সরকারের মিটারগেজ লাইনে আওরঙ্গাবাদের দিকে। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে পুণার গাড়ীতে গিয়েই চেপে বসলাম।

"মনমদ" থেকে পূণা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের মাঝে "আহমদনগর" ও "ধোন্দ" জংশন ছাড়া উল্লেখযোগ্য রেল-স্টেশন আর নেই বল্লেই চলে। যখন আহ্‌মদনগরে গিয়ে গাড়ী পৌছিল, তখন মুসলিম বীরঙ্গনা চাঁদ সোলতানার কীর্তি-বিমণ্ডিত এই পূণ্য স্থানটি একবার দেখে যাব বলেই মনে করেছিলাম; কিন্তু গাড়ীতে টি-টি-সি কিম্বা অন্য কোন রকম আপদ-বালাই এর উপদ্রব আদৌ নেই দেখে এরূপ নিরাপদ ভ্রমণটা মাঝ-পথে ক্ষান্ত দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত মনে করলাম না। সুতরাং গাড়ীতে বসেই মনে-মনে চাঁদ-বিবির স্মৃতির প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে নিরস্ত হলাম।

"ধোন্দ" হয়ে যখন পুনায় গিয়ে পৌছলাম, তখন বেলা প্রায় ১০টা হবে। স্টেশনে গাড়ী থেকে নেমেই চারদিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম যে জায়গাটা অনেকাংশে ক্যান্টনমেন্ট টাউনেরই মতো। চারদিকের রাস্তাঘাট সবই এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর যে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। যে স্থলে স্টেশনটি অবস্থিত, তার আশে-পাশে লোকজনের বাসস্থান বা দোকান পাট কোথাও নেই। সুতরাং আমাদিগকে স্টেশন থেকে অনেকটা পথ হেটেই শহরের মধ্যস্থলে একটা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো।

তখন ছিল মহরমের মউসুম এবং পুণায় মুসলমান দোকানদারদের অধিকাংশই শিয়া মুসলমান। সুতরাং শহরের সর্বত্রই উৎসবের আনন্দধারা প্রত্যক্ষ করে অন্ততঃ দুতিন দিন সেখান থেকে যাওয়ার মনস্থ করলাম।

মোট তিন দিন পূণায় ছিলাম। পুণার সেই মহরমের স্মৃতি আজো ভুলতে পারিনি। ধনাঢ্য শিয়া দোকানদারগণ এই উপলক্ষে এক-এক জন বহু সহস্র টাকা ব্যয় করে থাকেন। মোহরমের নবম দিন রাত্রে এশার নামাজের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে চারদিকে আলোক-সজ্জার যে চোখ-ঝলসানো শোভা দেখেছিলাম, তার তুলনা পাক-ভারতের আর কোথাও খুঁজে পাইনি। দশম দিন সকাল থেকেই শুরু হয়- তাজিয়া শোভাযাত্রা। এ-শোভাযাত্রাও এক বিচিত্র ব্যাপার। স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি মাণিক্য খচিত এক-একটি তাজিয়া নির্মাণ করতে যে কত হাজার হাজার টাকা খরচ হতে পারে, বিস্ময় বিমুগ্ধ অন্তরে তা-ই চিন্তা করতে করতে অনেক দুর পর্যন্ত এই শোভাযাত্রার অনুগমন করেছিলাম। অতঃপর বিকেলের দিকে একটা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে রাতটা সেখানেই কাটালাম এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য গরীয়সী পূণানগরী ত্যাগ করে বোম্বাইর গাড়ী ধরলাম।

চারদিকে পাহাড়-ঘেরা "কল্যাণ" জংশনে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে একটা দিন সেখানেই কাটালাম। মোপলা-বন্ধুটি এখান থেকে বিদায় নিলেন। ভ্যাগাবন্ড জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল এবং ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরবার জন্যেই উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। বন্ধুবরকে বিদায় দিতে গিয়ে বাড়ির স্মৃতি মনে করে ক্ষণকালের জন্যে আমারও বুকে তুমুল একটা ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে মায়ের ছেলে আবার মায়ের কোলের দিকেই পা বাড়াই। কিন্তু দুর্দম অভিমান যেন মনের কান-মুচড়িয়েই স্মরণ করিয়ে দিল যে, ব্যর্থতার কলঙ্ক বয়ে ঘরে ফিরার চেয়ে পথে মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেয়। সুতরাং সামান্য কয় দিনের পরিচিত মোপলা-বন্ধুকে বিদায় দিয়ে একা-একাই বোম্বাইর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

মাঝ-পথে "থানা" শহরে এক রাত থেকে একদিন ঠিক সন্ধ্যের সময় বোম্বাই ভিক্টোরিয়া-টার্মিনাস স্টেশনে গিয়ে নামলাম এবং শাহজাহান প্যালেস হোটেল আঞ্জুমান ইসলামীয়া স্কুল প্রভৃতির পাশ দিয়ে চলতে চলতে আবদুর রহমান স্ট্রীটের একটা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলাম।

www.pathagar.com

সপ্তদশ মঞ্জিল

কয়দিন পর্যন্ত বোম্বাইর পথে-পথে ঘুরে বেড়ালাম-হ্যাংলা কুকুরের মতোই। পকেটে পয়সা নেই-সুতরাং পেটেও দুর্ভিক্ষ-দেবী প্রায় চিরস্থায়ী আসন বিস্তার করে বসেছিলেন। কোনোদিন হয়ত বা কারো অনুগ্রহে এক বেলা আধবেলা সামান্য কিছু খাবার জুটত; আবার অনেক দিন কেবল মাত্র কলের পানি খেয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে হতো।

এরূপ অবস্থায় প্রায় সপ্তাহ খানেক কাটাবার পর একদিন সারাদিন উপোস দিয়ে সন্ধ্যার পর কোনো রকমে ভাঙ্গা দেহখানাকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম-"মসজিদ" স্টেশনের পার্শ্ববর্তী মসজিদটাতে। এশার নামাজ তখনও হয়নি। ভাবলাম, নামাজের পর কোনোও দয়ালু মুসুল্লীর কাছ থেকে খাবার পয়সাটা ভিক্ষে চেয়ে নেবখন। কিন্তু নামাজ হয়ে গেলে উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েও লজ্জায় কারো কাছে হাত পাততে পারলাম না। সামনা দিয়ে একে একে প্রায় সব মুসুল্লীই বেরিয়ে গেলো, বলি-বলি করেও কারো কাছে বুভুক্ষার জ্বালাটা নিবেদন করা হলো না। সুতরাং নেহায়েত হতাশ হয়েই অবশেষে মাথায় হাত দিয়ে দরজার পাশে বসে পড়লাম। ক্ষণিক উত্তেজনায় গৃহত্যাগ করে পথে বেরিয়ে এসে পথের মাঝে কুড়িয়ে-পাওয়া বুভুক্ষার যে দান মাথায় নিয়ে অনির্দ্দেশের পানে পাড়ি দিয়ে চলেছি, তার শেষ কোথায়, বসে বসে মনে মনে তারি হিসাব করতে লাগলাম। কিন্তু এ হিসাবের আগা-গোড়া মাথা-মুণ্ডু কিছুই যেন পাওয়া যাচ্ছিল না।

প্রায় আধঘন্টাখানেক এরূপভাবে বসে কাটাবার পর শেষ চেষ্টা স্বরূপ আবার সারাটা মসজিদ খুঁজে দেখবার মনস্থ করলাম। মসজিদে যদি এখনও কোনো লোক থেকে থাকে, তবে তার কাছে নিরিবিলিতে নিজের দুর্দশার কাহিনীটা খুলে বলা খুব সহজ হবে ভেবে মনে মনে একটু আশান্বিত হলাম। ঘুরে ঘুরে দেখতে পেলাম মসজিদের এক কোনে বেশ সম্ভ্রান্ত পোষাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোক নীরব সাধনায় নিমগ্ন। তাঁকে দেখে নিয়ে আবার চুপি চুপি এসে দরজার পাশে বসলাম এবং এক-দুই-তিন করে সেকেণ্ড মিনিট গুনে কোনো রকমে সময়টা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেলাম। এরূপভাবে আরো প্রায় একঘন্টা কেটে যাওয়ার পর রাত যখন প্রায় এগারোটা হবে তখন সাধক ভদ্রলোকটি উঠে ধীরে ধীরে আমার কাছে এলেন এবং আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই পকেটে হাত দিয়ে এক মুষ্ঠি আনি-দুয়ানি-সিকি আমার হাতে প্রদান করে বিদ্যুত বেগে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভম্বের মতোই দূরে থেকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাঁর পথ-রেখার পানে চেয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

বিস্ময় কেটে গেলে পর হতস্থিত মুদ্রাগুলি গুনে দেখতে পেলাম যে সবশুদ্ধ তিন টাকা'ন আনা হচ্ছে। আনন্দে হৃদয়খানা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। রেজর্কের মালিক খোদা কেমন অপূর্ব কৌশলে তাঁর সৃষ্টি জীবগুলির আহার জোগাচ্ছেন, তাই ভেবে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে এল- নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সেজদায় ঝুকে বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এবং অতঃপর উঠে বাইরে একটা হোটেলে গিয়ে সারা দিনের উপোসের পর বেশ তৃপ্তির সাথে কিছু খেয়ে আবার মসজিদে ফিরে শোবার ব্যবস্থা করলাম।

আর এক দিনের কথা। শহরতলীর ধারাভীতে যেখানে সব চামড়ার আড়ৎ রয়েছে, তারি নিকটে একটি মসজিদে সকাল বেলা বসেছিলাম। সাদা ধবধবে পোষাক পরা এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক এসে মসজিদে ঢুকলেন। আমাকে সামনে দেখেই ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে সদ্য ধোবার ধোওয়া একখানা ছোট্ট রুমাল বের করে আমার হাতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি টাকাও দিয়ে আদেশ করলেন সাবান কিনে এনে রুমালখানা ধোবার জন্যে। বলেই ভদ্রলোক নামাজ পড়তে মসজিদের ভেতর চলে গেলেন। আমি ভেবে ঠিক করতে পারলামনা-ধোবার দ্বারা সদ্য-ধৌত রুমালখানা আবার ধোওয়ার কি প্রয়োজন হলো। যাক ভদ্রলোকের কথা মতোই শেষে কাজ করলাম-দু'পয়সার সাবান কিনে এনে। নামাজ শেষে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলে রুমালখানা তাঁর হাতে দিয়ে বাকী সাড়ে পনর আনা পয়সাও তাঁকে দিতে গেলাম। পয়সা না নিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, "না, ও পয়সা তোমার।" কৃতজ্ঞ চিত্তে পয়সাগুলি পকেটে রাখতে রাখতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম - "হুজুর, সদ্য ধোওয়া রুমালখানা আবার ধৌত করার কি প্রয়োজন ছিল বুঝলাম না।" হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বল্লেন- "তোমাকে ভিক্ষা দিয়ে আমি অপমান করতে চাইনি'-তাই কাজ করিয়ে মজুরী দিলাম।" মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি মহান মানুষটির মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে চলতে একদিন বিকেলের দিকে "মহীম" দরগার মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং একটা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে অসংখ্য ভিখেরীর মাঝে এক স্থানে শুয়ে সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পর মসজিদের বারান্দায় একস্থানে বসে আছি, এমন সময় একটা লোক নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল ইংরাজি লিখতে জানি কিনা? তার প্রশ্নে "জানি" বলে উত্তর দিলে পর সে দোয়াত-কলম এবং এক টুকরা কাগজ এনে তাকে একটা চিঠি লিখে দিবার অনুরোধ করল। চিঠিখানা ছিল ইলেকট্রিক কোম্পানীর নামে এক দরখাস্ত, লেখকের নতুন দোকানে ইলেকট্রিক কানেকশন পাবার জন্যে। ফরমায়েশ মতো চিঠি লেখা শেষ হলে পর লোকটি প্রশ্ন করল- আমার বাড়ী কোথায় এবং কোন উদ্দেশ্যেই বা বোম্বাইয়ে উপস্থিত হয়েছি। বাড়ি কোলকাতায় এবং চাকুরীর সন্ধানেই আমার বোম্বাই গমন, এ-কথা তাকে বুঝিয়ে বল্লে পর লোকটি পরামর্শ দিল- "ধারাভীতে" গিয়ে শেঠ

www.pathagar.com

মেহের বখশ সাহেবের গুদামে চাকুরীর চেষ্টা করতে। শেঠ সাহেব যে খুব ভালো লোক এবং তাঁর ওখানে গেলে যে চাকুরী হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে, তাও লোকটি বেশ জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করল। সুতরাং তার পরামর্শ মত "ধারাভীতে" গিয়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা করাই স্থির করলাম এবং তারি দোয়াত কলম দিয়ে ব-কায়দা একখানা দরখাস্তও লিখে নিয়ে প্রস্তুত হলাম।

বেলা সাড়ে দশটার সময় "ধারাভীতে" গিয়ে দেখতে পেলাম-মাঠের মাঝে প্রায় সিকি মাইল পরিমিত স্থান নিয়ে শেঠ সাহেবের বিরাট চামড়ার গুদাম অবস্থিত। গুদামের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দারওয়ান সাহেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে অবশেষে লিখিত দরখাস্তখানা তার হাতে দিয়ে তা শেঠ সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলাম। আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে বুঝি দারোয়ান ভায়ার মনে একটু দয়ার উন্মেষ হলো। সে মাথা নেড়ে আমার হাত থেকে দরখাস্তখানা গ্রহণ করল এবং ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আমায় তার সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল।

প্রকাণ্ড অফিসটার মধ্যে একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের আড়ালে শেঠ সাহেব বসে ছিলেন। দারোয়ান কর্তৃক পরিচালিত হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, -"তোম নওকরী করোগে?" নির্ভীকভাবেই উত্তর দিলাম- "জী হ্যাঁ। আমার লিখিত দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে অতঃপর শেঠ সাহেব প্রশ্ন করলেন, "এ দরখাস্ত তোমহারা আপনা হাত কা লিখখা হ্যায়?" আবার বল্লাম, "জি, হ্যাঁ।" মুখে একটু সন্তোষের ভাব ফুটিয়ে শেঠ সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, "কেৎনা তনখা মাংতা?" উত্তর দিলাম, "জো আপকা মর্জি হো।" বাড়িতে আমার কে কে আছে, তা জিজ্ঞাসা করে অতঃপর শেঠ সাহেব জানালেন- "তোমকো আভি পঁচিশ রূপেয়া তনখা, পন্দরো রূপেয়া খোরাকী, আওর তিন রূপেয়া নাপিত-ধোবা কি লিয়ে"-ইয়ানে মোট তেতাল্লিশ রূপেয়া মিলেগা। রাজী হো?"

আনন্দে আমার হৃদয়খানা তখন লাফিয়ে উঠেছিল। এক ভ্যাগাবন্ড ভিখেরীর পক্ষে তেতাল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী যে এক রাজকন্যা আর আধা রাজ্যি পাওয়ার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়, মনে মনে তা-ই ভেবে সানন্দে জানালাম, "জি, হাঁ-রাজী হ্যায়।" সুতরাং ৪৩ টাকা বেতনে শেঠ মেহের বখশের আড়তে চাকুরীতে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং অফিসের একখানা বেঞ্চি অধিকার করে নিয়ে তখন থেকেই পথিক-জীবনের মাঝে কিছুদিনের জন্যে স্থায়ী একটা মঞ্জিল গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করলাম।

চাকুরীর প্রথম দু'দিন আমায় বিশেষ কোনো কাজই করতে হয়নি। অফিসের দরজার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিটায় অস্পৃশ্য-পারিয়ার মতোই একান্তে বসে ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়েই এ

www.pathagar.com

দু'দিন মশগুল ছিলাম। দীর্ঘ দিন ভ্রাম্যমান জীবনের দুঃখ কষ্টের ফলে দেহের ছিরি আমার যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং পোষাকের দিক দিয়েও যেরূপ ভিখেরীর দশা প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এরূপ অবস্থায় অফিসের মধ্যে অন্যান্য অফিসারদের কাছ-ঘেসারও সাহস প্রকৃতই হচ্ছিল না। সুতরাং শেঠ সাহেবের সামান্য দু'একটা ফরমায়েশ পালন করেই আমায় এ দু'দিন চাকুরীর কর্তব্য সমাপন করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন অফিসের কাজ শেষে শেঠ সাহেব তাঁহার আবাসে প্রস্থান করলে পর অফিসের ম্যানেজার আলীগড়ের নিকটস্থ "ডিবাই" নামক ক্ষুদ্র শহরের বাসিন্দা হাফিজ সিদ্দিক হাসান সাহেব আমায় তাঁর নিকটে আহুবান করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার সব ইতিহাস জেনে নিলেন। প্রায় বারো বছর পূর্বে এক দিন তিনি নিজেও যে আমারি মতো ভ্যাগাবন্ড অবস্থায় বোম্বাইয়ে এসে শেঠ সাহেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সাধনাবলে ক্রমোন্নতি করে আজ যে সাড়ে তিন শ'টাকা বেতনে ম্যানেজারের কাজ করছেন, তা জানিয়ে হাফিজ সাহেব আমায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করলেন। অতঃপর অতি স্নেহাপ্লুত স্বরে তিনি আমায় জানালেন- শামসুল হাসান নামে তাঁর একটি ছোট ভাই ছিল এবং আমাকে দেখে নাকি তারি মতো মনে হয়। আমি বিনীতভাবে জানালাম, বিদেশ-বিভুইয়ে অসহায় অবস্থায় তাঁর মতো একজন হিতৈষী বান্ধবকে যদি আমি বড় ভাইয়ের মতোই পেতে পারি, তবে বাস্তবিকই নিজেকে ধন্য মনে করব।

এ-সব কথাবার্তার পর হাফিজ সাহেব সেদিনকার মতো অফিস ত্যাগ করলেন এবং পরদিন থেকেই প্রতি কাজের ভেতর দিয়ে বড়-ভাইয়ের মতোই তাঁর স্নেহের পরিচয় পেতে লাগলাম। সেদিন অফিসে এসেই তিনি শেঠ সাহেবকে বলে কাপড়-পোষাকাদি কেনবার জন্যে আমায় ২০টি টাকা মঞ্জুর করলেন এবং বিকেলে অফিস ছুটির পর নিজেই আমার সঙ্গে টাউনে গিয়ে কাপড়াদি কিনে ভদ্রলোক সাজবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন থেকে ভদ্র-পোষাকে সজ্জিত হয়ে অফিসের অন্যান্য কেরানীর মতোই আমি হাফিজ সাহেবের সামনে একখানা চেয়ারে স্থান গ্রহণ করলাম এবং তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে লাগলাম।

একমাস কাজ করার পরই শেঠ সাহেবের দৃষ্টি আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো এবং ১০ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়ে আমায় তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর কার্যে গ্রহণ করলেন। এতদিন পর্যন্ত "ধারাভীর" গুদামেই সকল কর্মচারীর সাথে আমায় থাকতে হতো। অতঃপর শেঠ সাহেবের মহীমস্থ আবাস "মেহের মঞ্জিলে" আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এরূপভাবে দীর্ঘ প্রায় এগারো মাস কাল শেঠ সাহেবের ওখানে কাজ করলাম। পেশোয়ার-আফগানিস্তান হয়ে তুরস্কে যাওয়ার যে পাগলামী কল্পনা নিয়ে একদিন কোলকাতা ত্যাগ করেছিলাম, বোম্বাইয়ের এই পথ মঞ্জিলে এসে সেই কল্পনা যে কোথায় তলিয়ে গেলো,

www.pathagar.com

অনেক ভেবেও তা ঠিক করতে পারলাম না। শেঠ সাহেব ও হাফিজ সাহেবের স্নেহ এবং কতিপয় সহকর্মী বন্ধুর ভালবাসা-সর্বপরি কর্ম প্রেরণা সে সময়ে আমার হৃদয়ে এমন গভীর একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল যে, পথে-পথে ঘুরে জীবনটাকে স্রোতের শেওলার মত অনিশ্চিতের মাঝে ভাসিয়ে দেওয়ার আগ্রহ আর ছিল না। বিশেষতঃ চাকুরীতে ভর্তি হয়েই বাড়িতে চিঠি দিয়েছিলাম এবং তদবধি নিয়মিতভাবেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছিলাম। ফলে ঘরের মায়াও আমায় পথের আকর্ষণ থেকে অবিরতই টেনে রাখছিল। সুতরাং বোম্বাইর এই পথ মঞ্জিলে এসেই আমায় ভ্রাম্যমান ভ্যাগাবন্ড জীবনের অবসান করতে হলো।

বোম্বাইয়ে আমার কর্ম-জীবনের এই এগারো মাস কালের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুইটি হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ না করে পারছিনা। প্রথম ঘটনাটি শেঠ সাহেবের ওখানে আমার চাকুরী নেওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হয়। যে মেসে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তার বাকী সকল মেম্বর ছিলেন পাঞ্জাবী। তাঁরা সবাই একদিন খাবার সময় জোট বেঁধে বলে উঠলেন - "আমরা কেও বাঙ্গালীর সঙ্গে বসে খাব না।" বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম রুটি খাবার সময় আমি হাতের পাঁচটি আঙ্গুলই ব্যবহার করে থাকি বলে নাকি প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আমি একটা অসভ্য-বর্বর শ্রেণীর লোক এবং এ-হেন বর্বরের সঙ্গে এক সাথে বসে আহার করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। শুনে হাসি পেলো। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলাম- রুটি খাওয়ার ভদ্রতাসম্মত প্রক্রিয়াটি কি? বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে উত্তর দিলেন- রুটি খেতে হয় তিন আঙ্গুল দিয়ে-পাঁচ আঙ্গুলে নয়। আবার হাসতে হাসতে বন্ধুদের জানালাম - "সত্যি বেজায় ভুল হয়ে গেছে এবং এ রকম ভুল ভবিষ্যতে আর হবে না।" এরূপভাবে ত্রুটি স্বীকার করার পর বন্ধুরা শান্ত হলেন। এর পর থেকে খাবার সময় অঙ্গুলী ব্যবহার করতে গিয়ে বারবারই আমাকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নারীঘটিত এবং এই জন্যেই বেশ রসালোও বটে। তখন মহীম মেহের-মঞ্জিলে আমাদের অফিসের কাজ হচ্ছিল। অফিসের সামনেই রাস্তার অপর পার্শ্বে ছিল একখানা ছোট্ট দ্বিতল বাড়ি। এক মধ্যবয়সী মারাঠী ব্রাহ্মন সপরিবারে সে বাড়িতে থাকতেন। তাঁর ছিল দুইটি অবিবাহিতা কন্যা- গঙ্গাবাই আর যমুনাবাই। গঙ্গার বয়স সম্ভবত ষোল-সতেরো, আর যমুনার চৌদ্দ-পনেরো। দু'বোন সারা দিন দ্বিতলের জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে নানারূপ ইঙ্গিতাদি করে আমাদের জ্বালাতন করে তুলেছিল। বড় বোন গঙ্গা অধিকতর সুন্দরী হলেও অনেকাংশে লাজুক-প্রকৃতির মেয়ে ছিল, কিন্তু যমুনা ছিল ফ্লার্ট করার ব্যাপারে একান্তই অগ্রগামিনী। একদিন দুপুর বেলা সে অঘটন ঘটিয়ে বসল। একখানা আয়নায় সুর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে তার প্রতিবিম্ব ফেল্ল সে সোজা আমাদের অফিসের দিকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার টেবিলের উপরই আলোকধারা হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠল এবং শেঠ সাহেবের

www.pathagar.com

দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হলো। শেঠ সাহেব টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং তখনই দারোয়ানকে আদেশ করলেন ব্রাক্ষ্মন ভদ্রলোককে ডেকে আনতে। শীঘ্রই ভদ্রলোক এসে হাজীর হলেন। শেঠ সাহেব সব ব্যাপার বর্ণনা করে অতি কঠোরভাবে তাঁকে শাসিয়ে দিয়ে বল্লেন "আমার এখানে সব ছেলে-ছোকরা কাজ করে, আপনার বেহায়া মেয়েগুলি এদের মাথা খাবে- এ আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারবো না। আপনার মেয়েদের আপনি শায়েস্তা করুন।" ভদ্রলোক উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

তারপর থেকে ও বাড়ীর দ্বিতলের জানালা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো। এই ঘটনার পর আরো প্রায় দু'মাস সেখানে ছিলাম, কোনদিন কাকেও সে জানালা খুলতে দেখিনি।

বোম্বাইর চাকুরী জীবনে যে কয়টি সহকর্মী বন্ধুর সাথে ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল, তার মধ্যে রাওলপিণ্ডির আবদুল হামিদ, হোসিয়ারপুরের গোলাম মোহাম্মদ এবং ঝং জেলার চিনিওট নিবাসী মোহাম্মদ সঈদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোজাফ্ফর উদ্দীন ও বশীর আহমদের স্মৃতি আমার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান অধিকার করে রেখেছে। এ সব বন্ধুরা আজ কোথায় আছেন এবং তাদের জীবনই বা কোন পথ বেয়ে সাফল্যের পানে কতটা এগিয়ে গেছে, দুঃখের বিষয় আজ তার কোনো খবরই আমার জানা নেই।

বোম্বাই থেকে প্রায় পনেরো শ'মাইল দূরে বসে আজ যখন এই অতীতের কাহিনী লিখছি, তখন মনটা বারে বারেই যেন বোম্বাইর সেই মালাবার হিল, চৌপাটির বালুবেলা ও এলিফ্যান্টা দ্বীপের গুহায় গুহায় পালিয়ে ফিরছে। মনে পড়ছে আজ সেই দিনটার কথা, যেদিন গোলাম মোহাম্মদ আর বশীরের সাথে এলিফ্যান্টার পর্বতগুহায় গিয়ে পাথর খোদা নানারকম প্রাচীন মুর্তি দেখে মুগ্ধ বিস্মিত অন্তরে শহরে ফিরে এসেছিলাম। চৌ পাটীর বালু-বেলায় দাঁড়িয়ে প্রথম মহা-সমরের Victory Celebrations উপলক্ষে হাউই বাজার যে মোহনীয় শোভা এক রাতে উপভোগ করেছিলাম? তারো স্মৃতি আজ একটা সুন্দর স্বপ্নের মতোই মনের কোণে দোল দিয়ে উঠছে। বিশেষ করে আজ মনে পড়ছে-মহীম কেল্লার পার্শ্ববর্তী সাগর সৈকতের জল-বালাদের স্মৃতি। গোলাম মোহাম্মদের সাথে সেখানে বেড়াতে গিয়ে কত সাঁঝে নানা জাতীয় তরুনীদের জলকেলী দেখতে দেখতে বালুর উপর আঙ্গুল দিয়ে কবিতা রচনা করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি, সেসব কথা ভাবতে গিয়ে আজ মনে-হয় বুঝি তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বোম্বাইর এই প্রায় এক বছরের প্রবাস-জীবনে দুইজন খ্যাতনামা লোকের সামানা-সামনি সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এরা হচ্ছেন-আমীরে মিল্লাত মাওলানা মোহাম্মদ আলী আর তার ভাই মাওলানা শওকত আলী। একদিন দুপুর বেলা অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় খেলাফত ফান্ডের জন্য চাঁদা আদায় করার মতলবে তাঁরা এসে আমাদের

www.pathagar.com

অফিসে হাজির হলেন। আলী-ভাইদের দেখা আমার জীবনে এই প্রথম। শেঠ সাহেব দশ হাজার টাকার একখানা চেক লিখে দিয়েই নেতৃদ্বয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ছিলেন। মারাঠা-নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের দর্শন লাভের সুযোগও আমার হয়েছিল বোম্বাইয়ে; কিন্তু এ দর্শন তাঁর মৃত্যুর পর- জীবন্ত অবস্থায় নয়। ১৯২০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করা হয় এবং তিলকেরও মৃত্যু হয় এই দিনের বোম্বাইয়ের শাহজাহান প্যালেস হোটেলে। তাঁর শবদেহ নিয়ে যে বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল, তাতে আলী ভাইরা এবং মিসেস নাইডু প্রমুখ নেতৃবর্গ যোগদান করেছিলেন। সে শবযাত্রায় সহস্র সহস্র লোকের সাথে আমিও যোগদান করেছিলাম এবং তখনই মৃত্যুর কোলে শায়িত বিরাট মানুষটির মুখচ্ছবি দেখার সুযোগ আমার ঘটে।

www.pathagar.com

উপসংহার মঞ্জিল

প্রায় এগারোটা মাস শেঠ মেহের বখ্‌শের চামড়ার আড়তে কাজ করার পর এক শুভ প্রাতে নীড়হারা পাখীর কানে গিয়ে পৌছল-নীড়ের আহ্বান। আব্বার এক টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পারলাম- মা মৃত্যু শয্যায় থেকে তাঁর হারানিধি পুত্রকে শেষ দেখা দেখবার আশায় পথ-পানে চেয়ে আছেন। সুতরাং শেঠ সাহেবের কাছে ছুটির দরখাস্ত পেশ করে গৃহ প্রত্যাবর্তনের আয়োজনে রত হলাম।

ছুটি পেলাম। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করে নগদ আড়াই শ'টাকা বোনাস আর পঞ্চাশটি টাকা গাড়ী ভাড়া দিয়ে শেঠ সাহেব আমায় বিদায় দিলেন।

সফরের আয়োজন পূর্ব থেকেই সব ঠিক ছিল। সুতরাং এক দিন প্রাতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল স্টেশনে গিয়ে নাগপুর-মেলে চেপে কোলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বন্ধুবর গোলাম মোহাম্মদ আর বশীর আমায় বিদায় দিতে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় এক বছরের সাহচর্যের ফলে তাদের সাথে আমার অন্তরের এমনি একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁদের ছাড়তে মনটা সত্যি বড্ড ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। গাড়ী ছাড়ার শেষ ঘন্টা বাজলে পর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বন্ধু-যুগলের করমর্দন করলাম। বেচারা বশীর আমার চেয়েও বেশী পরিমাণে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল; শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগ দমন করতে না পেরে সেই সহস্র লোকের চোখের সামনে প্লাটফর্মের উপরই সে নেহায়েত ছেলে-মানুষের মতো ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দিবার সময় আর ছিল না-গাড়ী ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ীর জানালা দিয়ে রুমাল আন্দোলিত করেই আমি প্রবাসের সাথী দরদী বন্ধুদের হৃদয়ের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

গাড়ী চলছিল একটা উন্মত্ত দৈত্যের মতোই, আর তার ভেতর এক কোণে আনমনে বসে আমি ভাবছিলাম-মানব হৃদয়ের অনুভূতির বিচিত্র লীলার কথা। নীড়হারা পাখী যখন নীড়ের পথে ফিরে চলেছে, তখনও পথে পাওয়া ভালবাসার আকর্ষণ কেমন করে তাকে পিছুটান টানতে পারে, বশীর আর গোলাম মোহাম্মদের কথা যতবার মনে পড়ছিল, ততবার শুধু এই চিন্তাটাই হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলছিল। একদিকে শান্তি-নীড় গৃহের আকর্ষণ- মা বাপ ভাই-বোনের রক্তের টান; আর অপর দিকে মুসাফির জীবনে পথ মঞ্জিলে কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুদের ভালবাসার টান এই দোটানায় পড়ে সত্যি তখন আমি অনেকটা খেইহারা হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, দেশে ফিরে গিয়ে মা-বাপ ভাই-বোন প্রভৃতি চিরচেনা আপনার জনকে ত আবার বুকের কাছে খুঁজে পাব, কিন্তু পথ-মঞ্জিলের যে সব বন্ধুকে

www.pathagar.com

আজ পিছে ফেলে চলেছি, জীবনে তাঁদের সাথে দেখা আর হবে কি কোনো দিন? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর সেদিন মনের মাঝে খুজে পাইনি; কিন্তু আজ বুঝতে পারছি পথের মানুষ পথেই মিলিয়ে যায়- পথ ছেড়ে পথিক যখন নীড়ে ফিরে আসে, তখন পথের স্মৃতিটাই শুধু তার সঙ্গী হয়। পথের বন্ধু গোলাম মোহাম্মদ আর বশীর প্রভৃতিও আজ তাই আমার কাছে পথের বেদনা-সুন্দর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেই পুরানো পথ। থানা, কল্যাণ, চল্লিশগাঁও, ভূসাওয়াল, ওয়ার্দ্ধা, নাগপুর, রায়পুর, বিলাসপুর, টাটানগর প্রভৃতি পূর্ব-পরিচিত স্টেশনগুলি পেরিয়ে ১৯২১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটার সময় হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ী থামল। বোম্বাই থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই টেলিগ্রাম করে বন্ধুবর আবদুল করিমকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানিয়েছিলাম। চাঁদপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি তখন কারমাইকেল হোস্টেলে থেকে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ছিলেন। গাড়ী থেকে প্লাটফর্মে নেমেই দেখতে পেলাম-বন্ধুবর দুরে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ভীড়ের মাঝে তাঁর চেনা একখানা মুখের সন্ধান করছেন। দৌড়ে নিকটে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলাম। তিনিও অনেক দিনের হারানো এই ছন্নছাড়া বন্ধুটিকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠেই নীরব অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

কোলকাতায় মোট চারদিন ছিলাম। কারমাইকেল হোস্টেলের দশ নম্বর কামরায় আব্দুল করিমের সেটেই ছিল আমার এই চারদিনের আড্ডা। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেবও সে সময়ে সেই হোস্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথম দিনেই তাঁর সাথে পরিচয় হয়ে গেলো। মহাকবি কায়কোবাদের "মহাশ্মশান কাব্য" নিয়ে তিনি সে সময়ে সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবের সঙ্গে দস্তুরমতো মসিযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। ভাবীকালে নিজে একজন বিরাট রকমের সাহিত্যিক হবো- এ কল্পনা ছোটবেলা থেকেই আমার মনে বাসা বেধেছিল। সুতরাং সাহিত্য-সাধক শামসুদ্দীন সাহেবের সহিত পরিচয়ে আমি যে সেদিন কতটা আনন্দিত হয়েছিলাম, বাস্তবিকই তা বলে শেষ করা যায় না। আজ জীবনের যে ক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে অগ্রপথের সন্ধান করে চলেছি-এ সময়ে অতীত বাল্য-জীবনের সেসব মধুর স্বপ্নের কথা যখন মনে হয়, তখন হৃদয়খানা আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

চারদিন কোলকাতায় কাটিয়ে একদিন প্রাতে চিটাগং মেলে চেপে ঘরফেরা মুসাফির গৃহের পথে পাড়ি জমালাম। পুরানো স্মৃতির দেশ চাঁদপুরে গিয়ে যখন স্টীমার থেকে নামলাম তখন রাত প্রায় আটটা হবে। রেল-রাস্তার উভয় পার্শ্বে দিগন্তব্যাপী গভীর আঁধারের মাঝেই আগেকার শত স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলির সন্ধান করতে করতে চাঁদপুর ত্যাগ করলাম এবং প্রায় চারটার সময় আখাউড়া জংশনে গাড়ী থেকে নামলাম। অতঃপর নদীর ঘাটে গিয়ে একখানা নৌকা ভাড়া করে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

www.pathagar.com

পাটের অফিসের সেই বড় বড় সাদা ধবধবে টীনের গুদামগুলি, সেই তিতাসের পুল, সেই খড়মপুর কল্লা শহীদের দরগাহ, সেই মঠ-খোলার পুরানো হিজল গাছ, সেই সিমনার বাজার, সেই পোনা-বিলের পদ্মবন-শৈশব থেকে শতবার দেখা সেই স্থানগুলি নৌকার পাশ দিয়ে যখন একে একে পিছিয়ে গেলো, তখন দূরে থেকে আমাদের পুকুর-পাড়টা নজরে পড়ল। বুক আমার দুরদুর করে কেঁপে উঠল। একদিন এই পুকুর পাড় থেকেই যখন বিদায় নিয়েছিলাম, তখন বাঁশ-ঝাড়ের যে হেলেপড়া বাঁশটা ধরে মা-আমার তার এ হতভাগ্য সন্তানের প্রতি করুন নয়নে তাকিয়েছিলেন, দেখলাম সেই বাঁশটা আজো তেমনিভাবে ঘাটের পাশে পথের উপর নুয়ে আছে। সাড়ে তিন বছর আগেকার সেই বিদায়ের দিন, আর আজিকার আগমনীর এই সুন্দর প্রভাত এ দু'য়ে কত পার্থক্য, মনে মনে তারি বিচার করতে করতে পুকুরঘাটে গিয়ে নৌকা থেকে নামলাম।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল-ছোট্ট ভাইটি (হায়। আজ সে আর বেঁচে নেই এ কাহিনী পড়ার জন্যে)। আমায় দেখেই সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল "ভাই এসেছে রে।" বলেই এ শুভ সংবাদটি ঘোষণা করার জন্যে বাড়ির দিকে দৌড়াল সে উর্দ্ধশ্বাসে। তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এগিয়ে শুনতে পেলাম মৃত্যু শয্যায় শায়িতা রুগ্ন মাকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে সে বলছে- "মা মাগো। ওমা। তোর ছেলে ফিরে এসেছে গো।"

হারানো মানিক সাড়ে তিন বছর পর আবার ফিরে এসেছে এ সংবাদ মরণোন্মুখ মায়ের মনে যেন বিদ্যুতের মতোই কাজ করল। সংবাদটি শুনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও চলশক্তি-বিহীন অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকলেও, এ সংবাদের মায়াকাঠি স্পর্শে তাঁর দেহে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হলো। অকস্মাৎ লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে তিনি উঠানের মাঝখানে এসে "বাপ-আমার" বলে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পর মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে সেই উঠানের মাঝখানেই লুটিয়ে পড়লেন।

মায়ের সে সংজ্ঞাহারা বিশীর্ণ দেহখানা কোলে তুলে নিয়ে ছন্নছাড়া নীড়হারা মুসাফির অশ্রুধারায় বুক ভাসাতে ভাসাতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর আবার নীড়ের আশ্রয়ে প্রবেশ করলাম।

- সমাপ্ত -

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com